চতুর্থ ভাগ।

[নর্ম্যাল-বিদ্যালয় ও কৃষি-বিদ্যালয়ের উপযোগী অতিরিক্ত পাঠ।]

Part IV.—(Extra lessons for Normal Schools and Agricultural Schools).

উপক্রমণিকা

ইং ১৯০১ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখের ১নং মন্তব্য দ্বারা গবর্ণমেণ্ট্ এই বৎসর হইতে বঙ্গদেশের প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য বিষয়ে নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের একটী উদ্দেশ্য, পল্লিগ্রামস্থ বিদ্যালয়সমূহে কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা সংস্থাপন। পল্লিগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে পাঠ্য গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট কৃষি-সম্বন্ধীয় পাঠগুলির প্রধান অভিপ্রায় পল্লিগ্রামস্থ-বিদ্যালয়-সমূহের সহ-যোগে কৃষিকার্য্যের কয়েকটী উন্নতির প্রতি সমস্ত ছাত্রদিগের চিত্তাকর্ষণ করা। যে সকল কথা কৃষক-বালকেরা সকলেই জানে বিদ্যালয়ে তাহার শিক্ষা হওয়া বৃথা। অথচ, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক মৌলিক বিষয় শিক্ষা দিয়া এমন আশা করা, যে ছাত্রগণ, ঐ সকল শিক্ষা কার্য্যস্থলে প্রয়োগ করিয়া লইয়া, ক্রমশঃ নূতন নূতন প্রথা আবিষ্কার ও অবলম্বন করিতে থাকিবে, সেও বৃথা। উন্নতির দুই চারিটী মাত্র চাক্ষুষ উদাহরণও যদি বিদ্যালয়-গুলির সহযোগে কৃষক-বালকদিগের হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহারা এবং উহাদিগের অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া বিদ্যাশিক্ষার সহিত পৈত্রিক ব্যবসায় অনুসরণের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে শিক্ষা করিবে। অর্থাৎ, কৃষি-পাঠ-গুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকের সহিত সন্নিবেশিত হওয়াতে কৃষকবালকগণ অতঃপর লেখা-পড়া শিখিয়া চাষের কার্য্য হীন বলিয়া অবজ্ঞা না করিয়া, বরং কৃষিবিষয়ে নূতন নানা কথা শিক্ষা

করিয়া নব উৎসাহেব সহিত পৈত্রিক ব্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিবে।

উপরি উক্ত উদ্দেশ্যটী স্মরণ রাখিয়া শিক্ষক-মহাশয়দিগের কৃষি-পাঠ-গুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে যে ভাবে-প্রশ্নোত্তর সহযোগে শিক্ষা দিবার প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ক্ষুদ্র বালক-বালিকাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট সকল পাঠগুলি সম্বন্ধেই এইরূপ প্রথা অবলম্বনীয়। যতদূর সম্ভব, ক্ষেত্রে যাইয়া, এবং পাঠোল্লিখিত সামগ্রী গুলির ক্রমশঃ ছাত্রদেরই দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া লইয়া, কৃষি-সম্বন্ধীয় পাঠগুলি যেন শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দেন। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অনাবৃষ্টিসহ ধান্য, সিমুল-আলু, চুবড়িআলু, চীনার বাদাম, রিয়ানা-ঘাস, গিনি-ঘাস, ইত্যাদি পাঁচ-ছয় প্রকার নূতন গাছ লাগাইয়া, সযত্নে উহাদের রক্ষা করিয়া, প্রতি বৎসরে শিক্ষকমহাশয় যেন উহাদের বীজ, মূল বা কলম পুরস্কার স্বরূপ কৃষি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-বালক-বালিকা-দিগকে দান করেন। এমন কি, নূতন নূতন সামগ্রী জন্মাইয়া, রন্ধন এবং আহার করাইয়া, ছাত্রদের হৃদয়ে উহাদিগের উপকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। পাঠগুলির আবৃত্তি মাত্র দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা হইতে পরে না। কার্য্যকরী ভাবে কৃষিশিক্ষা দান করিতে হইলে, সামগ্রী সকল সংগ্রহ করাইয়া, জন্মাইয়া, আহার বা আস্বাদ করাইয়া, শিক্ষাদান করা আবশ্যক। এরূপ শিক্ষা চির কালের জন্য হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায়; এরূপ শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে ছাত্রদের হৃদয়ে স্বতঃই বাসনা জন্মে; এরূপ শিক্ষার পরিণাম দেশব্যাপী উন্নতি।

পরীক্ষা দ্বারাও কয়েকটী বিষয়ের শিক্ষা ছাত্রদের হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। জন্তুদিগের মূত্র গাছের গোড়ায় সাররূপে

ব্যবহার করিলে গাছ মরিয়া যায়, কিন্তু প্রচুর জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে গাছ সতেজে বাড়িতে থাকে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারিলে কৃষকগণ মূত্রের অপচয় না করিয়া সাররূপে উহা ব্যবহার করিতে শিখিবে।

কয়েকটী নিরূপিত গাছ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে জন্মাইতে, কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা সম্পাদন করিতে, কয়েকটী সামগ্রী ছাত্রদের দ্বারা ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের কোন তাকের বা ভিতের উপর সাজাইয়া রাখিতে, শিক্ষক মহাশয়দিগের সামান্যই পরিশ্রম হইবে, এবং বিদ্যালয় গুলিরও সামান্য ব্যয় পড়িবে। কিন্তু সামান্য যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয় দ্বারা যদি দেশের কৃষককুলের অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের এবং গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শকগণের এ সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এ সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ের পরিদর্শন-পুস্তকে মধ্যে মধ্যে মন্তব্য সন্নিবেশিত হওয়াও বিশেষ আবশ্যক।

নিম্ন-প্রাথমিক কৃষি-পাঠ গুলির বিশেষত্ব ও গুরুত্ব শিক্ষক মহাশয় দিগের উপলব্ধি করা অতীব প্রয়োজন। অধিকাংশ কৃষকবালক নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষায় পাঠ সমাপ্ত করিয়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া পৈত্রিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল বালক দুইতিন বৎসর কাল মাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যেন কৃষিসম্বন্ধে কিছু নূতন জ্যোতিঃ পাইয়া, অপেক্ষাকৃত অধিক উৎসাহের সহিত পৈত্রিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, কিছু উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়দিগের সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্যের উন্নতির যে নানা উপায় আছে, নিম্ন-প্রাথমিক ছাত্রগণ অন্ততঃ যেন এই ধারণাটী লইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। নিরূপিত পাঠে যে সকল বিষয়ে উল্লেখ

মাত্র আছে, শিক্ষক মহাশয়ের কর্ত্তব্য ঐ সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ও দেখাইয়া দেওয়া। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে যে প্রশ্ন-মালা ও পুস্তকের শেষে যে পত্র-নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে, উহার সাহায্যে প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়গুলির আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইতে পারে। নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষার উপযোগী পুস্তকের প্রথম ভাগে যে চারিখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য কয়েকটী শিক্ষা যেন সকল কৃষক-বালকই প্রাপ্ত হয়। শিক্ষাগুলিন এইঃ—(১) পৌষমাসে, অর্থাৎ, ধানকাটা শেষ হইলেই, জমিতে লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করিয়া, যদি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মাসে একবার করিয়া জমিতে লাঙ্গল-মৈ দেওয়া যায় তাহা হইলে ফসলে পোকা-লাগার ভয় কমিয়া যায় এবং জমিও উর্ব্বর হইয়া থাকে। (২) সিমুল-আলু বা কাসাভা প্রত্যেক গ্রামেই কিছু কিছু জন্মান উচিত। (৩) চীনাবাদাম প্রভৃতি বহুমূল-গণ্ড-যুক্ত ফসল জন্মান দ্বারা জমি সহজে ও বিনা-ব্যয়ে উর্ব্বর করিয়া লওয়া যায়।

নর্ম্ম্যাল-বিদ্যালয় অথবা বিশেষ বিশেষ কৃষি-বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ কৃষি-বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিতগণের হস্তে কৃষি-শিক্ষার বিশেষ ভার এবং এই শিক্ষার আনুষঙ্গিক পরীক্ষা ক্ষেত্রেরও ভার থাকা আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে কৃষি-পাঠ গুলি সম্বন্ধে সম্যক্ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই ক্ষেত্র হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বিশেষ বিশেষ গুল্ম ও ওষধির বীজ, মূল, কলম ইত্যাদি লইয়া গিয়া গ্রাম্য কৃষি-উন্নতির ভিত্তি-স্থাপন করিতে পারে। কৃষি-কার্য্যের উন্নতির প্রধান উপায় কৃষি-শিক্ষা। এই শিক্ষার কেন্দ্র কয়েকটী নর্ম্যাল-বিদ্যালয় ও কয়েকটী কৃষি-বিদ্যালয়। বঙ্গদেশে কয়েকটী এণ্ট্রেন্স-স্কুল সংশ্রবে কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হইয়াছে; রামপুর-বোয়ালিয়া প্রমুখ কয়েকটী স্থানে

বিশেষ কৃষি-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয় গুলিতে যাহাতে কৃষি-শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা হয়, কর্ত্তৃপক্ষদিগের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠগুলি এবং নর্ম্যাল-বিদ্যালয় ও কৃষি-বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য্য অতিরিক্ত আরও কয়েকটী পাঠ একত্র করিয়া একই পুস্তকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথমতঃ, কৃষক-বালকদিগের অভিভাবকগণ আর আর পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন, কিন্তু কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-সাধন বিষয়ে নানা শিক্ষা আনুপূর্ব্বিক যে পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে সে পুস্তক-খানি সম্বন্ধে কখনই উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, প্রাণি-তত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ের সহিত জড়িত দুই তিনটী কৃষি-পাঠ সম্বন্ধে পুস্তক পাঠে উহাঁদের চিত্তাকর্ষণ হওয়া সম্ভব নহে। স্বতন্ত্র এক খানি কৃষি-পাঠ দ্বারা তাঁহাদের কৃষি-কার্য্যের উন্নতির উপায় গুলির দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব এবং এরূপ একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক তাঁহাদের গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদ্বারা ব্যবহৃত হইলে তাঁহাদেরও নজর ক্রমশঃ ঐ পুস্তক খানির দিকে পড়া সম্ভব। পণ্ডিত মহাশয় দিগের সাহায্যে গ্রামের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এই পুস্তক প্রচলিত হইয়া কৃষি-বিষয়ে নানা উন্নতি দেশময় স্থাপিত হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে কৃষি-বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য নর্ম্যাল-বিদ্যালয় অথবা বিশেষ কৃষি-বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র, শিক্ষকত্ব পদে নিযুক্ত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। তাঁহারই উপর বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের বা উদ্যানের এবং কৃষি-বিষয়ে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত তৈজস-পত্রের

ভার থাকা উচিত। এরূপ বিশেষ শিক্ষকগণের ব্যবহার্য্য একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। শিক্ষা-বিভাগ নির্দ্দিষ্ট পাঠগুলির পত্র সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকাতে পাঠ গুলির দ্বারা বিষয় গুলির সম্যক্ জ্ঞান জন্মান অসম্ভব। অথচ, শিক্ষকগণের কোন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে বিষয় গুলির অধ্যাপনার পক্ষে তাঁহাদিগের নিতান্ত অসুবিধা জন্মে। ছাত্রগণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হয়েন। শিক্ষকদিগের কোন বিষয়ে জ্ঞান অধিক না থাকিলে উহারা ঐ বিষয়ের শিশু-পাঠ্য অতি সামান্য পুস্তকেরও অধ্যাপনা কার্য্যে অপারক হইয়া থাকেন।

সরল কৃষি-বিজ্ঞান, কৃষি-শিক্ষকদিগের ও নর্ম্যাল-বিদ্যালয়ের এবং বিশেষ কৃষি-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য, এবং সাধারণ কৃষকদিগের ব্যবহারের জন্য, প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা ও অধ্যাপনার যদি কিছুমাত্র সুবিধা হয়, এবং ইহা দ্বারা যদি সাধারণ কৃষি-জীবী কিছুমাত্রও উপকার লাভ করে, তাহা হইলে গ্রন্থকার আপনার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিবেন। ইতি।

কলিকাতা
ইং সন ১৯০৪ ২রা নবেম্বর। } শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

সরল কৃষি-বিজ্ঞান।

প্রথম ভাগ।

[নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষার উপযোগী]।

প্রথম অধ্যায়।

নানা শস্যোৎপাদনের উপকারিতা।

(কৃষি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর-মালা)।

পণ্ডিত মহাশয়। তোমরা বলিতে পার, এ গ্রামে গত বৎসর ধান কেন ভালরূপ জন্মে নাই ?

কৈলাস। হাঁ মহাশয়, বলিতে পারি। গত বৎসর কোন কোন গ্রামে বন্যায় অনেক ধান নষ্ট হয়।

প, ম,। ভাল, আর কখন আমাদের দেশে ধান মারা গিয়াছে, শুনিয়াছ ?

গোপাল। হাঁ, মহাশয়, শুনিয়াছি, কয়েক বৎসর হইল, ভালরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে আমাদের গ্রামের অনেক ধান মারা গিয়াছিল।

ঐ বৎসরে অনেক দরিদ্র ব্যক্তি ডুমুর, ফুটি, কাঁকুড়, পটল, সাদা ও রাঙ্গা আলু, কলাই ইত্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল।*

প, ম,। আর কোন কারণে ধান মারা যায়, কেহ বলিতে পার?

মতি। হাঁ, মহাশয়, আমাদের গ্রামে এক রকম ফড়িং † লাগিয়া এক বৎসর অনেক ধান নষ্ট হইয়াছিল।
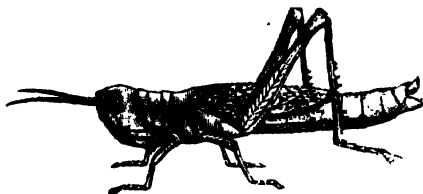
১ম চিত্র। ধানের ফড়িং।

রাম। আমাদের গ্রামে গাঁদি-পোকা † লাগিয়া ধানের অনেক ক্ষতি হইয়াথাকে।
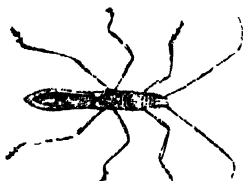
২য় চিত্র। গাঁদি-পোকা।

প, ম,। রাম, তুমি এখন বল দেখি, ধান মারা যাইবার প্রধান কারণ কি কি?

---

* ছাত্রদের দুই এক দিবস মাঠে লইয়া গিয়া, পণ্ডিত-মহাশয় উহাদের ডুমুরাদি গাছ দেখাইয়া দিয়া, ফুটি কাঁচা খাইতে হয়, এবং অবশিষ্ট কয়েকটী সামগ্রী রন্ধন করিয়া খাইতে হয়, ইহা যেন বুঝাইয়া দেন।

† যে ফড়িং ধান-গাছ নষ্ট করে, এবং কয়েকটী গাঁদি-পোকা, সংগ্রহ করিয়া একটী শিশিতে সর্ষপ তৈলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া, প্রতি বৎসর এই পাঠ বুঝাইয়া দিবার সময় যেন পণ্ডিত মহাশয় এই পোকা দুইটী ছাত্রদের দেখাইয়া দেন।

রাম। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও কীটের উৎপাত।

প, ম,। কৈলাস, তোমাদের গ্রামে গতবৎসর অতিবৃষ্টি দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় নাই কেন, বলিতে পার ?

কৈলাস। আমাদের গ্রামে অনেক সাঁওতালের বাস ; উহারা চৈত্রমাসেই ভুট্টা বুনিয়া দিয়া, আষাঢ় মাসের বন্যার পূর্ব্বেই ফসল কাটিয়া লইয়াছিল ; একারণ উহাদের ফসলে কোন ক্ষতি হয় নাই।

প, ম,। গোপাল, তোমাদের গ্রামে গত বৎসব অতিবৃষ্টি দ্বারা ক্ষতি হয় নাই কেন ?

গোপাল। আমাদের গ্রামের মাঠ কিছু উচ্চ। এই মাঠে আশু ধান্য ও রবি শস্য হইয়া থাকে। আশু ধান্য উঠিয়া যাইবার পরে এবং রবি শস্য লাগাইবার পূর্ব্বে, বন্য। আসাতে আমাদের গ্রামের কোন ক্ষতি হয় নাই।

প, ম,। মতি, তোমাদের গ্রামে ত আশু ধান্য লাগান হইয়াছিল, তোমাদের গ্রামের ধান্য তবে মারা গেল কেন ?

মতি। গোপালদের গ্রামের চাষিরা ষাটী-ধান্য লাগায় বলিয়া, ঐ ধান্য মারা যায় নাই। বন্যা আসিবার সময় আমাদের গ্রামের আশু-ধান্য পাকে নাই। বন্যা আসিবার সময় যে যাহা কাটিয়া লইতে পারিয়াছিল তাহা হইতে গরুর আহার ভিন্ন আর কিছুই পাওযা যায় নাই।

প, ম,। গোপাল, যে বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, সে বৎসর তোমাদের গ্রামে কিরূপ ফসল * হইয়াছিল ?

* বাঙ্গালা ভাষায় অনেক বিদেশীয় শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের ইহা বুঝাইয়া দিতে পারেন। "ফসল" পার্শী-ভাষা হইতে, "গেলাস", "টেবিল", "টুল", "বেঞ্চি" প্রভৃতি ইংরাজী-ভাষা হইতে, "কেদারা" পোর্ত্তগীজ ভাষা

গোপাল। সে বৎসরেও আমাদের দেশে ষাটী-ধান্য ভালই জন্মিয়াছিল; কিন্তু অড়হর ভিন্ন সমস্ত রবি-শস্য মারা গিয়াছিল।

প, ম,। কৈলাস, সে বৎসর তোমাদের গ্রামে কেমন শস্য হইয়াছিল, শুনিয়াছ?

কৈলাস। শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামের সাঁওতালেরা সে বৎসরেও উত্তম ভুট্টা পাইয়াছিল। ভুট্টা উঠাইবার পরে উহারা জুয়ার বা দে-ধান † লাগাইয়াছিল। এই ফসলটীও ঐ বৎসরে উত্তম জন্মিয়াছিল।

প, ম,। ভাল, তোমরা কি মনে কর সকল কৃষকের কর্ত্তব্য, কেবল ষাটী-আউশ, ভুট্টা, অড়হর ও দেব-ধান্য লাগান?

রাম। না, মহাশয়, কেবল এই সকল দ্রব্য আহার করিয়া পরিপাক করিতে পারে, এরূপ লোক বঙ্গদেশে অধিক নাই।

মতি। সকল বৎসর ত আমন-ধান্য, মুগ, কলাই, এ সকল বাঙ্গালার নিত্য-ব্যবহার্য্য শস্য নষ্ট হয় না; তবে এ সকল কথনই পরিহার্য্য নহে।

গোপাল। মহাশয়, আমাদের গ্রামে বাঁকুড়া জেলা নিবাসী এক ঘর প্রজা আসিয়াছে, উহারা সিমুল-আলু বলিয়া এক জাতীয় মূল কাঁচাই আহার করিয়া থাকে। উহা অনাবৃষ্টিতেও সুন্দর জন্মিয়া থাকে, এবং উহা পরিপাক করাও কঠিন নহে। আমি খাইয়া

হইতে, "সাবান" ফরাসী-ভাষা হইতে উদ্ভূত। যেমন বিদেশীয় শব্দ এদেশের ভাষার সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ, ভুট্টা, আলু, ওলন্দা কলাইসুঁটি, কপি ইত্যাদি বিদেশীয় ফসলও এদেশে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

† "দে-ধান" শব্দ "দেব-ধান্য" শব্দের অপভ্রংশ। "ধান" "মাটি," "বুনিয়া," "আউশ-ধান" ইত্যাদি শব্দ, ক্রমান্বয়ে "ধান্য," "মৃত্তিকা," "বপন করা," "আশু-ধান্য," ইত্যাদি শব্দের অপভ্রংশ।

দেখিয়াছি, ইহা বেশ খাইতে। আমি বলি, এ ফসল সাধারণতঃ জন্মাইলে ত ভাল হয়।

প, ম,। কৈলাস, তুমি কি বল ?

কৈলাস। পণ্ডিত মহাশয়, আমি বলি, আমন-ধান, কলাই, মুগ, ছোলা, এ সকলও লাগান ভাল, আবার ভুট্টা, দে-ধান, আউশ-ধান, আড়হর, আর গোপাল এই মাত্র যে ফসলের কথা বলিল, এ সকলও কিছু কিছু লাগান ভাল।

রাম। পণ্ডিত মহাশয়, ত্রিপুরা জেলা হইতে একটী ভদ্রলোক আসিয়া গাছ-আলু নামে এক প্রকার গাছ আমাদের বাড়িতে লাগাইয়া গিয়াছিলেন ; ঐ গাছের পাতা দেখিতে কতকটা সিমুল গাছের পাতার মত ; উহার মূল ও খাইতে পারা যায়। উহাই কি সিমুল-আলুর গাছ ?

প, ম,। হঁা, সিমুল-আলু ও গাছ-আলু একই গাছের নাম।
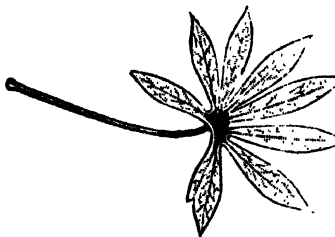
৩য় চিত্র। সিমুল-আলুর পাতা।

দেখ, কৃষকেরা যদি দুই একটী মাত্র ফসলের উপর নির্ভর না করিয়া সাত আটটী বা তাহারও অধিক প্রকার ফসল জন্মাইয়া, উহাদের ব্যবহারে আনিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে কি অতিবৃষ্টি, কি শিলা-বৃষ্টি, কি অনাবৃষ্টি, কি কীটের উৎপাত, এসমস্ত কারণ দ্বারা উহাদের কখনই অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

মতি। পণ্ডিত মহাশয়, সকল ফসল কি ফড়িং বা গাঁদি-পোকায় নষ্ট করে না ?

প, ম,। না, প্রায় এক এক জাতীয় দুরন্ত কীট দুই এক জাতীয় ফসল মাত্র নষ্ট করে। যে ফড়িং ধান্য নষ্ট করে উহা পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রের পাট স্পর্শও করে না। গাঁদি-পোকা ধান নষ্ট করে কিন্তু ইক্ষু স্পর্শও করে না। একারণ যত প্রকার শস্য জন্মাইতে পারা যায়, ততই কীটের উৎপাত কম হয়।

কৈলাস। পণ্ডিত মহাশয়, আমার মামার বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়। সেখানে দেখিয়াছি পালে পালে বিগ্‌ড়ি হাঁস উড়িয়া আসিয়া ধানের ক্ষেতে বসিয়া শত শত বিঘা ধান খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে।

প, ম,। হাঁ, বিগ্‌ড়ি হাঁস. বাঁদর, হনুমান, বন্যশূকর, খরগোস, মূষিক, ইত্যাদি জন্তুতে ও অনেক ফসল নষ্ট করে। এই সকল জন্তুকে শীকার করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে মারিয়া ফেলাই ভাল।

রাম। পণ্ডিত মহাশয়, বৃষ্টি না হইলে কি সকল ফসল নষ্ট হইয়া যায় না ? জল না পাইলে ত কোন গাছই জীবিত থাকিতে পারে না।

প, ম,। বর্ষাকালে বা সম্বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি হইল না, এরূপ কি বঙ্গদেশে কখন হয় ? কোন স্থানে কোন বৎসর অধিক বৃষ্টি হয়, কোন স্থানে বা অল্প বৃষ্টি হয়। যে স্থানে অধিক বৃষ্টি হয়, সে স্থানে যদি এককালীন জলে ভাসিয়া না যায়, অর্থাৎ বন্যা যদি না হয়, তাহা হইলে উত্তম ধান, পাট ইত্যাদি ফসল জন্মে। যে স্থানে বৃষ্টি কম হয়, অথবা যে বৎসর বৃষ্টি কম হয়, সে স্থানে বা সে বৎসরে, ভুট্টা, অড়হর, কার্পাস ইত্যাদি ফসল উত্তম জন্মে। এককালীন জলের অভাবে কোন ফসলই হইতে পারে না সত্য, কিন্তু আশু-ধান্য, দেবধান্য, ভুট্টা, শিমুল-আলু. কার্পাস প্রভৃতি ফসল অল্প বৃষ্টিতে ভাল জন্মিয়া থাকে।

নানা প্রকার ফসল জন্মাইতে পারিলে কয়েকটী বন্যা আসিবার পূর্ব্বে উঠিয়া যাইতে পারে, কয়েকটী বন্যার জল নামিয়া গেলে লাগান যাইতে পারে, কয়েকটী বৃষ্টির অভাবে অথবা শুষ্ক স্থানে উত্তম জন্মিবে, এবং দুই একটী ফসল যদি কীটের উৎপাত দ্বারা কিছু নষ্ট হয়, সকলগুলি কখনই কীটের দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না।

গোপাল। পণ্ডিত মহাশয়, আমরা ত কেবল ধান ও কলাই লাগাইয়া থাকি। বিশ-পঁচিশ রকম ফসল জন্মাইবার নিয়ম আমরা কেমন করিয়া শিক্ষা করিব ?

প, ম,। কেন, কৃষি-বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা করিয়া, আপনাদের পৈত্রিক ব্যবসায়ের উন্নতি করিবে।

কৈলাস। পণ্ডিত মহাশয়, আমরা ডাল, ভাত ও দুই একটা তরকারি আহার করিয়া জীবন ধারণ করি, আমরা বিশ-পঁচিশ রকম ফসল লইয়া কি করিব ?

প, ম;। আহার করিতে বা ব্যবহারে আনিতে শিখিবে ও শিখাইবে। শিক্ষা বা উন্নতি কিছু এক দিনে হয় না; ক্রমশঃই হইয়া থাকে। তুমি যদি সিমুল-আলুর গাছ লাগাও এবং উহার মূল নানা প্রকারে ব্যবহার করিতে শিক্ষা কর, তোমার দেখা দেখি আর পাঁচ জনও তাহাই করিবে। তুমি যদি যত্ন করিয়া দুই পাঁচটী সিমুল-আলুর গাছ তোমার অঙ্গনে লাগাইয়া রাখ, ক্রমশঃ তোমার গ্রামের সকলের অঙ্গনে বিশ পঁচিশটী সিমুল-আলুর গাছ দেখা যাইবে।

মতি। পণ্ডিত মহাশয়, আমিত কখন সিমুল-আলুর বা দেবধান্যের গাছ দেখি নাই। এই দুইটী গাছের বীজ কোথা হইতে পাইব ?

প, ম,। সিমুল-আলুর গাছ বীজ হইতে জন্মে না, কলম হইতে ইহা জন্মান হইয়া থাকে। এই পাঠশালার বাহিরে আমি সম্প্রতি

দুইটী সিমুল-আলুর কলম লাগাইয়াছি। উহা হইতে গাছ বাহির হইল আমি দুই এক খানি পাকা ডাল তোমাকে দিব। তুমি কলম কাটিয়া উহা আপনার জমিতে আগামী ফাল্গুন চৈত্র মাসে লাগাইয়া দিও। অযত্নেও এ গাছ বাহির হইবে। কেবল একটী কথা মনে রাখিও, গাছ অতি দীর্ঘ হইতে দিও না। দুই হাতের অধিক উচ্চ হইলেই উপরের পত্রাঙ্কুরগুলি ভাঙ্গিয়া দিও। দেব-ধান্তের বীজও তোমাকে আমি আনাইয়া দিতে পারি।

এখন তোমরা সকলে বুঝিয়াছ, নানা প্রকার ফসল লাগাইলে ও ব্যবহার করিতে শিখিলে কিরূপে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? একই কারণে সকল ফসল কখন নষ্ট হইতে পারে না। এখন বল দেখি, ফসল কত প্রকারের হইয়া থাকে।

রাম। ভাত, রুটী ও ছাতু আমাদের দেশের লোকের প্রধান খাদ্য। একারণ, (১) ধান্য, (২) গোধূম, (৩) যব, (৪) যই, (৫) দেব-ধান্য, (৬) চীনা, (৭) বাজরা, (৮) ভুট্টা ও (৯) মাড়ুয়া, এই কয়েকটী তৃণ জাতীয় ফসল সর্ব্ব প্রধান।

প, ম.। ভাত বা রুটীর সহিত যে আমরা ডাল খাইয়া থাকি, উহা কোন্ শস্য হইতে উৎপন্ন?

কৈলাস। (১০) কলাই, (১১) মুগ, (১২) খেঁসারি, (১৩) মসুরি, (১৪) ছোলা, (১৫) মটর, (১৬) অড়হর, (১৭) কুলত্থ কলাই, (১৮) রম্ভা কলাই প্রভৃতি ফসল হইতে ডাল উৎপন্ন হয়।

প, ম,। এই গুলিও কি তৃণ জাতীয় ফসল?

মতি। না মহাশয়, এগুলি ঘাসের ন্যায় দেখিতে নহে; ইহাদের পাতা, ফুল ও ফল দেখিতে স্বতন্ত্র প্রকার। ইহাদের কলাই জাতীয় ফসল বলা যাইতে পারে।

প, ম,। ডাল বা তরকারি রন্ধন করিবার সময় যে তৈল ব্যবহার হয়, উহা কোন্ ফসল হইতে উৎপন্ন ?

গোপাল। উহা (১৯) সর্ষপ হইতে উৎপন্ন। সর্ষপ নানা জাতীয় হইয়া থাকে। এদেশে সাধারণতঃ অন্য কোন তৈল রন্ধনের জন্য ব্যবহার হয় না।

প, ম,। রাম, সর্ষপ-তৈল ভিন্ন আর কোন্ কোন্ তৈল তুমি দেখিয়াছ ?

রাম। (২০) তিলের তৈল, (২১) তিসি বা মসিনার তৈল, (২২) সোর-গোঁজার তৈল, (২৩) রেড়ির তৈল, (২৪) নারিকেল তৈল, (২৫) মহুয়ার তৈল, (২৬) টার্পিণ তৈল, ও (২৭) বাদামের তৈল।

প, ম,। সমস্ত তৈলই কি কোন না কোন গাছ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ?

মতি। হাঁ মহাশয়, যে কয়েকটি তৈলের নাম করা গেল ঐ গুলি সমস্তই গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। শুনিয়াছি, কেরোসিন তৈল গাছের বীজ অথবা টার্পিণ তৈলের ন্যায় গাছের গুঁড়ি হইতে উৎপন্ন হয় না, মাটির মধ্য হইতে বাহির হয়।

প, ম,। কৈলাস, তুমি কত রকম তরকারি দেখিয়াছ ?

কৈলাস। অনেক রকম দেখিয়াছি।

প, ম,। প্রধান তরকারি গুলির নাম করিয়া যাও দেখি।

কৈলাস। (২৮) আলু, (২৯) পটল, (৩০) বেগুণ, (৩১) ঝিঙ্গা, (৩২) কুমড়া, (৩৩) লাউ, (৩৪) উচ্ছিয়া, (৩৫) করলা, (৩৬) কাঁকরোল, (৩৭) চিচিঙ্গা, (৩৮) কাঁচ কলা, (৩৯) মোচা, (৪০) থোড়, (৪১) এঁচোড়, (৪২) সজনার খাড়া, (৪৩) কাঁকুড়, (৪৪) শশা, (৪৫) ডুম্বুর, (৪৬) সাদা-আলু, (৪৭) রাঙ্গা-আলু,

(৪৮) ওল, (৪৯) কচু, (৫০) শুড়-বেগুণ, (৫১) মূলা, (৫২) শালগাম, (৫৩) গাজর, (৫৪) ওল্-কপি, (৫৫) ফুল-কপি, (৫৬) বাঁধা-কপি, (৫৭) বিট্-পালম্, (৫৮) চুব্ড়ি আলু, (৫৯) সিমুল-আলু, (৬০) পালম-শাক ও আর আর শাক।

প, ম,। তৃণ জাতীয়, কলাই জাতীয়, তৈল জাতীয় ও তরকারি জাতীয় ফসল ভিন্ন আর কোন জাতীয় ফসল আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি ?

রাম! মসলা জাতীয় ফসল।

প, ম,। গোপাল, তুমি প্রধান প্রধান মসলা গুলির নাম কর দেখি।

গোপাল। (৬১) হরিদ্রা, (৬২) আদ্রক, (৬৩) আম্-আদা, (৬৪) তেঁতুল, (৬৫), তেজ-পাতা, (৬৬) লঙ্কা, (৬৭) গোল-মরিচ, (৬৮) ধনিয়া, (৬৯) জিরা, (৭০) মথি, (৭১) মৌরী, (৭২) এলাচি, (৭৩) লবঙ্গ, (৭৪) দারুচিনি, (৭৫) জাফ্রাণ, (৭৬) ও পেঁয়াজ।

প, ম,। এই সকল মসলা কি গাছ হইতে জন্মে ?

মতি। হাঁ মহাশয়, কিন্তু এ সমস্ত মস্লার গাছগুলি আমি দেখি নাই, কতকগুলি মাত্র দেখিয়াছি।

প, ম,। আর কোন্ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য গাছ হইতে জন্মে ?

রাম। চিনি ও গুড় (৭৭) ইক্ষু, (৭৮) খর্জুর, প্রভৃতি গাছ হইতে উৎপন্ন হয়।

প, ম,। আর কোন নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থ তোমাদের মনে পড়ে ?

মতি। দড়ি, সূতা, এবং সূতা হইতে উৎপন্ন কাপড় আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, এ সকলও কৃষি কার্য্যের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প, ম,। কৈলাস যে সকল গাছের আঁশ হইতে সূত্র বা রজ্জু উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই সকল গাছের নাম কর দেখি?

কৈলাস। (৭৮) পাট, (৮০) শণ, (৮১) মেস্তা-পাট, (৮২) কার্পাস, (৮৩) বন-আনারস বা কোঙ্গা, (৮৪) রিহা, (৮৫) আনারস ইত্যাদি। নারিকলের ছোবড়া হইতেও দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প, ম,। তোমাদের আর কোন ফসল মনে পড়ে?

গোপাল। হাঁ মহাশয়, (৮৪) পান, (৮৫) সুপারি, (৮৬) বাশ, (৮৭) উলুখড়, (৮৮) তুঁত, (৮৯) নীল, (৯০) তামাক, (৯১) আফিং, (৯২) চা, (৯৩) এরারুট, (৯৪) মাদুর কাঠি, (৯৫) পানিফল, (৯৬) কাফি এ সকল ও ফসল।

প, ম,। এখন শ্লেটে লিখিয়া বল দেখি তোমরা কত রকম ফসলের নাম করিলে ও কতগুলি ফসলের নাম করিলে।*

গোপাল। তৃণ-জাতীয়, কলাই-জাতীয়, তৈল-জাতীয়, তরকারী-জাতীয়, মসলা-জাতীয়, শর্করা-জাতীয়, সূত্র-জাতীয়, এবং আর আর জাতীয় এই আটটী শ্রেণী একত্র করিয়া ৯৬টী ফসলের নাম করা হইয়াছে।

প, ম,। কলা, থোড় ও মোচা, একই গাছ হইতে তিনটী তরকারি পাওয়া যায় এ কারণ এই তিনটী বন্ধনী দ্বারা নির্দ্দেশ কর।

মতি। পণ্ডিত মহাশয়, (৯৭) আম, (৯৮) কাঁঠাল, (৯৯) কলা, (১০০) আতা, (১০১) টেঁপারি, (১০২) পেয়ারা, (১০৩) বেল, (১০৪) জাম, (১০৫) লিচু, এ সকল ফলও ত ফসলের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

প, ম,। হাঁ, এ সকল ফলেরও আবাদ চলিতে পারে।

এখন দেখ, আমাদের ব্যবহার্য্য শতাধিক ফসলের মধ্যে ৭০।৮০টী ফসল আমরা বঙ্গদেশের জমিতে জন্মাইতে পারি; অতএব প্রত্যেক

কৃষক যদি দুই তিনটী মাত্র ফসলের উপর নির্ভর না করিয়া ২০।২৫টি ফসলের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহার কোন আশঙ্কা থাকে না। একটী রজ্জুর দ্বারা নৌকা না বাঁধিয়া যদি বিশটী রজ্জুর দ্বারা বাধি, তাহা হইলে ঝড়ে-বাতাসে কি নৌকা ডুবি হইবার সম্ভব থাকে? *

ছাত্রগণ। মহাশয়, এখন বেশ বুঝিলাম, কেবল ধান-কলাইয়ের উপর নির্ভর করিয়া, আমরা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, কীট ও দুরন্ত জন্তু সকলের উৎপাত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকি।

প, ম,। যে সকল দ্রব্য নিত্য ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, এ সকল ব্যতীত সাধারণতঃ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে এমন কোন বস্তুর নাম করিতে পার?

মতি। লবণ ও দুগ্ধ আমরা সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকি।

প, ম,। লবণ কি কোন গাছ হইতে উৎপন্ন হয়?

রাম। না, উহা খনি হইতে বাহির করা হয়, অথবা লোণাজল শুকাইয়া উহা সংগ্রহ করিতে হয়।

প, ম,। কৈলাস, তোমার কি বোধ হয়, দুগ্ধ একটী কৃষিজাত পদার্থ?

কৈলাস। হাঁ, পণ্ডিতমহাশয়, দুগ্ধও এক প্রকার কৃষিজাত পদার্থ। কেননা ভুট্টার গাছ, দে-ধান গাছ, কলাই, খেঁসারি, প্রভৃতি ফসল লাগাইয়া, গরুকে খাইতে দিলে, গরুর অধিক পরিমাণে দুধ হয়। গরুর খাইবার উপযুক্ত ফসল লাগাইয়া গরু পুষিলে, গরুর উন্নতি হয়

---

* এই স্থলে পণ্ডিত-মহাশয় বিদ্যালয়ের দেয়ালে বা বোর্ডের উপর, এক এক ছাত্রকে একএক জাতীয় ফসলের নাম শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিখিতে বলিবেন, এবং ছাত্রগণের দ্বারা সংগৃহীত বীজাদি লইয়া এক একটী ফসলের বিষয় কিছু কিছু উপদেশ দিবেন।

এবং গরুর উন্নতি হইলেই ক্রমশঃ লাঙ্গলের বলদের উন্নতি হইবে। কৃষিজাত ফসল গবাদি জন্তুকে খাইতে দিলে উহারা অধিক বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম হয়।

প, ম,। তবে সাধারণতঃ নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থের মধ্যে কেবল লবণই কৃষিজাত পদার্থ নহে ?

গোপাল। হাঁ মহাশয়, লবণ ব্যতীত প্রায় সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থই কৃষিকার্য্য দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প, ম,। কৃষিকার্য্য হেয় ও নিকৃষ্ট কার্য্য, তোমরা কথনও এমন মনে করিও না। "চাষা" শব্দ যে লোকে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাসূচক ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে, সে বড় অন্যায়।

প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। ধান মারা যাইবার কতগুলি কারণ জান, বল।

২। ধান মারা যাইলে কোন্ কোন্ ফসল খাইয়া মানুষ জীবন ধারণ করিয়া থাকে ?

৩। কাঁচা অবস্থায় খাইতে পারা যায় এমন কতকগুলি সামগ্রীর নাম কর।

৪। বন্যা কোন্ সময়ে ও কিরূপ জমিতে আসা সম্ভব ?

৫। বন্যা আসিবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ ফসল পাকিয়া যাইতে পারে ?

৬। ষাটী-ধান্য কাহাকে কহে ?

৭। বন্যা নামিয়া যাইবার পরে জমিতে কি কি ফসল লাগান যাইতে পারে ?

৮। স্বল্প বৃষ্টি হইলেও কোন্ কোন্ ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয় না ?

৯। বঙ্গদেশের লোকে অধিকাংশ জমিতে আমন ধান, ও কলাই লাগায় কেন?

১০। সিমুল আলু কেমন করিয়া কোন্ সময়ে লাগাইতে হয়? উহার মূল বৃদ্ধি করিবার জন্য কিরূপ ভাবে আবাদ করিবার নিয়ম আছে?

১১। নানা ফসল লাগাইয়া ফল কি? কীটের উৎপাত হইতে রক্ষা হইবার একটী উপায় যে নানা ফসল লাগান, তাহার হেতু বুঝাইয়া দেও।

১২। যে সকল জন্তু ফসল নষ্ট করে তাহাদের কি করা উচিত?

১৩। কৃষিকার্য্যের উন্নতি কিরূপে হইতে পারে উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দাও।

১৪। ফসল সমস্ত যে কয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে তাহাদের নাম দাও।

১৫। তৃণ-জাতীয় ফসলগুলির নাম কর।

১৬। কলাইজাতীয় ফসলগুলির নাম কর।

১৭। তৈলপ্রদ ফসলগুলির নাম কর।

১৮। শাক-তরকারিগুলির নাম কর।

১৯। যে যে গাছ হইতে মস্‌লা পাওয়া যায় তাহাদের নাম কর।

২০। যে সকল গাছ হইতে শর্করা উৎপন্ন হয় তাহাদের নাম কর।

২১। যে সকল ফসল হইতে আঁইশ বা সূত্র বাহির হয় উহাদের নাম কর।

২২। যত প্রকার ফল দেখিয়াছ তাহাদের নাম লিখ।

২৩। আর আর যে সকল গাছের আবাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে তাহাদের নাম কর

২৪। গো-জাতি যে সকল গাছ খাইয়া উত্তম পরিপুষ্ট হয় তাহাদের নাম যতগুলি করিতে পার কর।

২৫। লবণ কিরূপে সংগৃহীত হয়?

২৬। গো-জাতির উন্নতির প্রধান উপায় কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধান্য ও চাউল।

নূতন চাউল ও পুরাতন চাউল।—চাউল সিদ্ধ করিলে ভাত হয়, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু সকল চাউল সমান নহে। নূতন চাউল জলে অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিলেই গলিয়া যায় এবং এই চাউলের ভাতে ও ফেনে কিছু আঠা হয়। পুরাতন চাউল সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হয়, এবং ইহার ভাত বেশ ঝর্‌-ঝরে হয়। নূতন চাউল সহজে পরিপাক করা যায় না বলিয়া নূতন চাউল অপেক্ষা পুরাতন চাউল মহার্ঘ। চাউল এক বৎসরের পুরাতন হইলে ব্যবহার ও বিক্রয় করা ভাল।

ধান্য রক্ষা।—চাউল বাহির করিয়া দুই এক বৎসর সঞ্চয় করিয়া রাখা অপেক্ষা ধানই পুরাতন করিয়া রাখিয়া দেওয়া ভাল। আবশ্যকমত পুরাতন ধান ভাঙ্গিয়া চাউল করিয়া লইলেই চলে। চাউল অপেক্ষা ধান সহজে রক্ষা করা যায়, চাউলে যেমন পোকা লাগে ধানে তেমন পোকা লাগে না। ধানের কঠিন আবরণ উহার মধ্যস্থিত চাউলকে কীটাদি হইতে রক্ষা করে। চাউল ভিজিয়া

যেমন সহজে পচিয়া যায় ধান তত সহজে পচে না। গ্রামে গ্রামে যদি পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক এক বৎসরের ধান্য সঞ্চয় করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে দুর্বৎসরে ধান্য মারা গেলে একেবারে হাহাকার পড়িয়া যায় না।

আশু-ধান্য—আশু ধান্য তিন চার মাসের মধ্যে পাকিয়া যায় বলিয়া আশু-ধান্যের জমিতে অনায়াসে একই বৎসরের মধ্যে আর একটী ফসল লওয়া যাইতে পারে। বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে আশু-ধান্য লাগাইয়া ভাদ্র আশ্বিন মাসে উহা কাটিয়া লইতে পারা যায়, এবং কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ঐ একই জমিতে কোন রবি-খণ্ড জন্মাইতে পারা যায়। হিসাব করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আশু-ধান্যের জমিতে একই বৎসরের মধ্যে তিনটী ফসল লওয়া চলে। কার্ত্তিকমাসে জমিতে উত্তম করিয়া সার ও চাষ দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া লইয়া আলু লাগাইতে পারিলে, ফাল্গুন মাসে ঐ আলু উঠিয়া যাইবে। আলু উঠিয়া যাইবার পরই জমিতে মৈ দিয়া সমতল করিয়া লইয়া যে দিন ভাল করিয়া বৃষ্টি হইবে সেই দিন অথবা তাহার পরদিন ভুট্টা লাগান যাইতে পারে। চৈত্র মাসে ভুট্টা লাগাইয়া নিম্ন-বাঙ্গালায় উত্তম ফল পাওয়া যায়। চৈত্র মাসে যে ভুট্টা লাগান হইবে উহা আষাঢ় মাসে উঠিয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে, অথবা ভুট্টা কাটিয়া লইবার পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠ মাসে, জমিতে ভাল করিয়া সার দিয়া, ভুট্টা উঠিয়া যাইবার পরে চারি পাঁচ বার লাঙ্গল-মৈ দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া লইয়া, পরে আশু-ধান্যের প্রস্তুত চারা ঐ জমিতে রোপণ করিতে হয়। আশ্বিন মাসের মধ্যেই এই আশু-ধান্য পাকিয়া যাইবে। আশু-ধান্য রোপণ করিয়া লাগাইবার প্রথা বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। নিম্ন ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভুট্টার পরিবর্ত্তে পাট

লাগাইয়া, পাটের পরেও উচ্চ ভূমিতে আশু-ধান্য রোপণ করিয়া লাগান চলিতে পারে। বর্ষাকাল অল্পদিন স্থায়ী হইলে আমন-ধান মারা যাইতে পারে বটে, কিন্তু নাম্‌লা রোপিত আউশ-ধান মারা যাইতে পারে না। আশু ধান্যের ফলন আমন ধান্যের ফলন অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। ইহার মূল্যও কম। ইহার চাউল প্রায় মোটা, লালবর্ণ,ও কদর্য্য হইয়া থাকে। ইহার ভাত খাইয়া যে সে লোকে পরিপাক করিতে পারে না। কিন্তু সকল আশু-ধান্যের চাউলই যে মোটা, লালবর্ণ, কদর্য্য ও দুষ্পাচ্য এরূপ নহে। সুবিখ্যাত কয়েকজাতীয় পেশোয়ারী চাউল আশু-ধান্য জাত। এই সকল চাউল আকারে কিছু বড় হয় বটে, কিন্তু ইহারা অতি সুখাদ্য, এবং ইহাদের মধ্যে কয়েক জাতীয় চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। নাগপুর হইতে আনীত এক জাতীয় আশু-ধান্যের চাউল বিখ্যাত দাদ্‌খানী চাউল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অতএব আশু-ধান্য বলিলেই যে কদর্য্য ধান্য বুঝিতে হইবে এমত নহে। দুঃখের বিষয়, আমন-ধান্য অপেক্ষা আশু ধান্যের ফলন কম। এই সকল শ্রেষ্ঠ জাতীয় আশু-ধান্যের ফলন আরও কম। আশু-ধান্যের ফলন কম হইবার একটী বিশেষ কারণ আছে। এই ধান্যের যখন ফুল হয়, তখন বর্ষার প্রকোপ নিতান্ত অধিক। বর্ষার জলের বেগে ফুল-রেণু ধৌত হইয়া গিয়া বীজ উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে। এ কারণ আমন-ধান্য অপেক্ষা আশু-ধান্যে অধিক "আগ্‌ড়া" বা শস্য-শূন্য বীজ হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে বর্ষাকালে আধ হাতের অধিক জল দাঁড়ায় সে সকল স্থানে আশু-ধান্য জন্মাইতে পারা যায় না।

আমন ও বোরো ধান্য।—আমন-ধান্য অধিক জলে প্রায় নষ্ট হয় না। কোন কোন জলী আমন ও "রায়দা" ধান ১০।১৫

হাত জলেও জন্মিয়া থাকে। জমিতে জল যেমন বাড়িতে থাকে এই ধান্যও তেমন বাড়িয়া থাকে। আশু-ধান্য যে আমন-ধান্য অপেক্ষা অনাবৃষ্টি-সহ ইহা কৃষকেরা বিলক্ষণ অবগত আছে। যে বৎসর বর্ষার স্বল্পতা হেতু আমন-ধান্য মরিয়া যায়, সে বৎসরেও আশু-ধান্য উত্তম জন্মে। বর্ষা নিতান্ত কম হইলেও অন্ততঃ দুইমাস কাল স্থায়ী হয়। দুই মাস বর্ষা আশু-ধান্যের পক্ষে যথেষ্ট। আশু-ধান্যের এই বিশেষ গুণ সত্ত্বেও কৃষকগণ কখনই বিস্তৃতভাবে আমনের পরিবর্ত্তে আশু-ধান্যের চাষ করিবে না। মনে কর, দশ বৎসরের মধ্যে গড়ে এক বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু আমন-ধান্য মারা গেল, এবং বাকি নয় বৎসরে গড়ে বিঘা প্রতি ৭/ মন আমন-ধান ও বিঘা প্রতি ৫/ মন আউশ-ধান জন্মিল, তাহা হইলে মোটের উপর এক বিঘা জমিতে দশবৎসরে ৬৩/ মন আমন-ধান্য এবং ৫০/ মন আশু-ধান্য উৎপন্ন হইল; কাজেই, মোটের উপর আশু-ধান্য অপেক্ষা আমন-ধান্য জন্মান ভাল। বোরো-ধান জল শুকাইতে আরম্ভ হইলে নিম্ন জমিতে বিলের মধ্যে ও নদীর ধারে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে লাগান যাইতে পারে। আমন-ধান্য আপেক্ষা ইহারও ফলন কিছু কম। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বোরো-ধান কাটিতে হয়।

আশু-ধান্য সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার।—আশু-ধান্যের অনাবৃষ্টি-সহতা এবং আমন-ধান্যের প্রাচুর্য্যতা গুন একত্রিত করিবার একটি উপায় আছে। আশু-ধান্য কাটিয়া লইবার সময় প্রায় মৃত্তিকাতে বিলক্ষণ রস থাকে। যদি ধান্য কাটিয়া লইবার পরে জমিতে লাঙ্গল না দিয়া ধান্যের গোড়াগুলি জমিতে আরও দুই মাস থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, গোড়াগুলি হইতে কিছু পাতা ও শীষ পুনরায় বাহির হইতেছে। যদি প্রথম ধান কাটিবার

সময় বিঘা প্রতি ৫/মন পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় বার যে শীষগুলি বাহির হইবে ঐ গুলি যদি পক্ষীতে খাইয়া না যায় তবে উহা হইতে অর্দ্ধ মণ মাত্র ধান পাওয়া যাইবে। এই দো-কাটের ধান যদি পর বৎসর বীজরূপে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে এই বীজের গাছ হইতে ফসল অধিক হইবে, এবং অন্য আশু-ধান গাছও যদি বৃষ্টির অসদ্ভাব হেতু শুকাইয়া যায়, তবে এই গাছগুলি শুকাইবে না। দো-কাটের ধান বীজরূপে ব্যবহার করিলে ফসল পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়, অর্থাৎ আশু-ধান্য কতকটা আমনের ভাবে দাঁড়াইয়া যায়। সম্ভবতঃ আমন-ধান্য দো-কাট আশু-ধান্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। দো-কাটের আশু-ধান্য আমন-ধান্যের ন্যায় রোপণ করা উচিত, অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে ঘন করিয়া ইহার বীজ লাগাইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসেই যে দিন অধিক বৃষ্টি হইবে সেই দিন অথবা তাহার পরদিন বীজের গাছ উঠাইয়া মাঠে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। পরে যদি বর্ষা পড়িতে বিলম্ব হয়, অথবা বর্ষা যদি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়, এবং মাঠে জল যদি না জমে, তথাপিও এই রোপিত ধান্য অতিশয় তেজে বাড়িয়া যায়, এবং এই গাছ হইতে ফলও অধিক হয়। বিদ্যালয় সমূহের প্রাঙ্গনে শ্রেষ্ঠ কয়েক জাতীয় আশু-ধান্য জন্মাইয়া এবং ইহাদেরই দো-কাটের বীজ ব্যবহার করিয়া ধান চাষের উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করা যাইতে পারে। দো-কাটের ধান্য বীজরূপে ব্যবহার করিয়া যে ফসল হয় উহা অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও যে সতেজে বাড়িয়া যায় ইহার কারণ কি? ইহার কারণ দো-কাটের ধান্য যে গাছ হইতে হয় উহার শিকড় গভীরতর। আশুধান্য কাটিয়া লইবার পরেও উহার শিকড়ের বৃদ্ধি হ্রাস না হইয়া আরও সতেজে হইতে থাকে এবং পরে যে সামান্য পাতা ও শীষ বাহির হয় উহা গভীর শিকড় জাত। দো-কাটের ধান্য গভীর শিকড়জাত গাছের

ধান্য, এ কারণ উহা হইতে পর বৎসর যে গাছ জন্মে ঐ গাছের ও শিকড় গভীর হয় এবং বৃষ্টি ভালরূপে না হইলেও ঐ গাছ মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে রস শোষণ করিয়া বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে।

চাষের নিয়ম।—অনেক কৃষক বর্ষারম্ভ না হইলে জমি চাষ ও ধান্য বপন আরম্ভ করে না। ইহাতে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। ধান কাটা শেষ হইলেই জমি চষিয়া ফেলা কৰ্ত্তব্য। আমন-ধান্য কাটিবার সময় জমি প্রায় শুষ্ক, কঠিন ও চাষের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। ধান কাটিবার পরেই যদি চাষ দিবার সুবিধা না হয়, তবে "মাঘের শেষে" * অথবা প্রথমে, অথবা ফাল্গুন মাসে যে দিন প্রথমে বৃষ্টি হইয়া জমি চাষ দিবার মত হইবে সেই দিনেই চাষ দিয়া ফেলা কৰ্ত্তব্য। এই সময় হইতে বৈশাখ মাস পৰ্য্যন্ত যদি মাসে এক এক বার করিয়া জমিতে চাষ দিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে জমির অবস্থা অতি সুন্দর, অর্থাৎ উর্ব্বর এবং আগাছা ও কীট-শূন্য হইয়া থাকে। বর্ষাকালে চাষ দিয়া জমি পতিত অবস্থায় রাখিয়া দিলে সারবান পদার্থ ধৌত হইয়া গিয়া জমির উর্ব্বরতা কিছু হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৈশাখ মাস পৰ্য্যন্ত যদি জমি মধ্যে মধ্যে চাষ দিয়া আল্গা ভাবে ফেলিয়া রাখা যায় তাহা হইলে উহার উর্ব্বরতা হ্রাস না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইয়া থাক। বায়ু হইতে উর্ব্বরতা দায়ক সামগ্রী কয়েকটী আল্গা মাটির মধ্যে সহজেই প্রবেশ করিয়া ঐ মাটিকে আরও উর্ব্বর করিয়া দেয়। জমি মাসে একবার করিয়া ওলট্ পালট্ করিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়; বিশেষতঃ এরূপ করাতে আগাছা ও কীটের বাসা সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। বৈশাখে রীতিমত বৃষ্টি হইলেই

* ধন্য রাজার পুণ্য দেশ॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তুত জমিতে শ্রেষ্ঠ জাতীয় আশু-ধান্য ছিটাইয়া দেওয়া এবং বীজের জমিতে ঐ সকল আশুধান্যের দো-কাটের বীজ এবং আমন-ধান্যের বীজ ঘন করিয়া বুনিয়া দেওয়া উচিত। পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় চৈত্র মাস হইতেই প্রায় মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া থাকে, এ কারণ ঐ ভূভাগে চৈত্র মাসে আশু-ধান্য ছিটান ও আমন-ধান্যের ও দোকাট আশু-ধান্যের বীজবপন চলিতে পারে। উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে বৃষ্টি হয় না, এ কারণ এই দুই ভূভাগে বীজ-বপন বৈশাখে না করিয়া জ্যৈষ্ঠে করা উচিত। তবে সকল বৎসর সকল সময়ে এবং সকল স্থানে সমান বৃষ্টি হয় না। এ কারণ বৎসরের অবস্থা বুঝিয়া বীজবপন করা কর্ত্তব্য। বরং এক মাস বিলম্ব করিয়া আশু-ধান্য মাঠে ছিটান ভাল, অর্থাৎ চৈত্রে বীজ ছিটান রীতি থাকিলে বৈশাখে বীজ ছিটানতে প্রায় সুবিধাই হইয়া থাকে; বৈশাখে বীজ ছিটান রীতি থাকিলে জ্যৈষ্ঠে বীজ ছিটানতে ক্ষতি নাই, এবং জ্যৈষ্ঠে বীজ ছিটান রীতি থাকিলে আষাঢ়ে বীজ ছিটানতে ক্ষতি হয় না; কিন্তু শ্রাবনে আশু ধান্যের বীজ ছিটাইলে ফসল নিতান্ত কম হয়। ইহার কারণ এই, চৈত্রে বা বৈশাখে যদি সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হয় এবং বীজ ছিটান উচিত কি না এরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে আরও একমাস পর্য্যন্ত চষা জমি ফেলিয়া রাখিয়া ও আরও দুই এক চাষ দিয়া জমির উন্নতি করিয়া লইতে পারা যায়, পরে আশু-ধান্যের বীজ ছিটাইলে বৃষ্টিপাতেরও সন্দেহ থাকে না, অথচ জমির আরও উন্নতি করিয়া লওয়াতে গাছের অধিকতর তেজঃ হয়। কিন্তু বর্ষা পড়িয়া গেলে এরূপ বিলম্ব করাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। বর্ষার জলে চষা ভূমির অনেক সারবান পদার্থ ধৌত হইয়া যায়। বীজ প্রস্তুতের জমিতে বীজ অগ্রেই লাগান উচিত, কেননা বর্ষা পড়িতে বিলম্ব হইলে চারা

গাছ জল সেচনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা যায় এবং পরে বর্ষা পড়িলেই রোপণ কার্য্য চলিতে পারে। আশু-ধান্যও রোপণ করিয়া লাগাইতে পারিলে ফসল অধিক হয়, কিন্তু আশু-ধান্য রোপণ করিতে হইলে বর্ষার অপেক্ষা করিতে নাই। দো-কাট্ বীজের চারা রোপণ করিতে হইলেও বর্ষার অপেক্ষা করিতে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে যেদিন অধিক বৃষ্টি হইবে সেই দিনই রোপণ কার্য্য চলিতে পারে। পরে যদি অধিক বৃষ্টি না হয় তাহাতেও কিছু ক্ষতি হয় না। পেশোয়ার ও মধ্য-প্রদেশ হইতে আনীত কয়েক জাতীয় শ্রেষ্ঠ আশু-ধান্য হইতে এবং বিশেষতঃ উহাদিগের দো-কাট বীজ হইতে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহার বিশেষ কারণ এই, যে পেশোয়ার বা মধ্য-প্রদেশে বঙ্গদেশ অপেক্ষা বৃষ্টি স্বভাবতঃই কম হয়। এমন স্থলে অনাবৃষ্টি হেতু বঙ্গদেশের আশু-ধান্য মারা যাইলেও পেশোয়ারী ও নাগ্‌পুরী আশু-ধান্য শুকাইয়াযায় না। এই সকল জাতীয় আশু-ধান্যের দোকাট্ বীজ হইতে যে গাছ হয় উহারা নিতান্ত অল্প বৃষ্টি হইলেও বঙ্গদেশে অতি সুন্দররূপে জন্মে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই কয়েক জাতীয় ধান্যের বীজগাছ রোপণ করিলে গাছ মারা যাইবার কিছুই সম্ভব থাকে না।

জল-সেচন।—জল-সেচন করিয়া ধান্যের চাষ করা দুরূহ কার্য্য। দুই এক বিঘা জমি জল-সেচন করিয়া বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে, তাহাও যদি সুবিধামত জলাশয় থাকে তবেই সম্ভব। ধান্যের বীজ জল-সেচনের ব্যবস্থা না করিয়া কখনই বপন করা উচিত নহে। এক বিঘা বীজ হইতে ১০।১৫ বিঘা জমি রোপণ হইতে পারে। এক বিঘা বীজের জমি জল-সেচন করিয়া রক্ষা করা দুরূহ নহে। ডোঙ্গা বা সেচনী মাত্র ব্যবহার করিয়া অতি সহজে যাহাতে এক

বিঘা ধানের বীজ রক্ষা করা যাইতে পারে এমন সুবিধামত স্থানে বীজের জমির ব্যবস্থা করা ভাল। বৈশাখ মাসে বীজ রোপণ করিলে বীজের জমিতে জল-সেচন করা আবশ্যক হওয়াই সম্ভব। পাছে বর্ষা আগাম আরম্ভ হইয়া আগামই শেষ হইয়া যায় এ কারণ বীজের গাছ কিছু আগাম প্রস্তুত করিয়া রাখাই উচিত। বর্ষা আরম্ভ হইতেই আমন-ধান্যের বীজ-রোপণ আরম্ভ করিতে হয়। আশু-ধান্য ও দো-কাট্ আশু-ধান্য রোপণ করিবার জন্য বর্ষারও অপেক্ষা করা আবশ্যক করে না। বর্ষারম্ভ হইবার পরে জমি প্রস্তুত, বীজ প্রস্তুত, ও বীজ রোপণ করিতে গেলে, প্রায় একমাস পূর্ণ মাত্রার বর্ষা বৃথা চলিয়া যায়।

বীজের পরিমাণ।—আমাদের দেশের কৃষকগণ অত্যধিক বীজ ব্যবহার করিয়া থাকে। ছিটান বুনানির জন্য বিঘা প্রতি পাঁচ সের ধানের বীজ যথেষ্ট, কিন্তু সচরাচর দশ পনের সের ব্যবহার হইয়া থাকে। রোপা ধান অন্ততঃ এক ফুট অন্তর একটী করিয়া চারা লাগান উচিত। সাত আট ইঞ্চি অন্তর রোপা ধানের ৪।৫টী গাছ জন্মিয়া গাছগুলি ঘন হইয়া জন্মে এবং প্রথমে দেখিতে ভালই হয়, কিন্তু এরূপ ঘন হইয়া যে গাছ জন্মে উহা হইতে ফলন কম হয়। বিঘা প্রতি পাঁচ সের বীজ ছিটাইয়া ব্যবহার করিলে যত ফলন হয়, দশ পনের সের বীজ ব্যবহারে তত ফলন হয় না। পাট, ইক্ষু ও অন্যান্য ফসল সম্বন্ধেও এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কৃষকদিগের বিশেষ আবশ্যক। দুই সের পাটের বীজ ব্যবহার করিয়া বিঘা প্রতি যত পাট জন্মে অর্দ্ধসের বীজ ব্যবহার করিলে তদপেক্ষা অধিক জন্মে ইহা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে। ছয় ফুট অন্তর ইক্ষু শ্রেণী জন্মান দ্বারা প্রতি বিঘা যত গুড় হয় ও সেই গুড় যত সুন্দর হয়, এক, দুই বা আড়াই ফুট অন্তর

ইক্ষু শ্রেণী লাগাইয়া তত গুড় হয় না এবং সেই গুড় তত সুন্দর হয় না, ইহাও পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে। এই সম্বন্ধে বঙ্গদেশের কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব। বীজ-গাছ বা চারা লাগাইবার পূর্ব্বে শিকড় ধৌত করিয়া লইবার নিয়ম উত্তম।

ধান-কাটা।—আমন-ধান্যের গাছ যেমন এককালীন শুকাইয়া গেলে কাটা উচিত, আশু-ধান্যের গাছ সেরূপ শুকাইয়া গেলে কাটা উচিত নহে। আশু-ধান্য অধিক পাকিয়া গেলে ঝরিয়া যায়। দো-কাট্ আশু ধান্যের বীজ হইতে যে গাছ হয় উহার ধান্য ভাল করিয়া পাকিলেও ঝরিয়া যায় না, এ কারণ এই ধান্য-আমন ধান্যের ন্যায় ভাল করিয়া পাকিলে কাটা যাইতে পারে। অধিক জলে যে সকল "জলী" ধান্য জন্মে, উহাদের গাছ জল যেমন বাড়িতে থাকে তেমনই বাড়িয়া যায়। ঐ সকল ধান পাকিলে দুই হাত মাত্র খড়ের সহিত উহা কাটিয়া লওয়া উচিত, অবশিষ্ট "নাড়া" জমিতে পচিয়া জমির উন্নতি সাধন করে।

চাউল।—সরু চাউল অপেক্ষা মোটা চাউলের ফলন প্রায় দ্বিগুণ হইয়া থাকে বলিয়া চাষীরা মোটা ধানের বীজ পছন্দ করে। সকল সরু চাউলের ফলন সমান নহে। অতি সুগন্ধযুক্ত ও সূক্ষ্ম "সমুদ্র-বালি" নামক ধান্যের ফলন বিঘা প্রতি ৬।৭/ মন সহজেই পাওয়া যায়। পেশ্ওয়ারী আশু-ধান্য মোটা ধান্য। এই ধান্য চাষীরা অনায়াসেই পছন্দ করিতে পারে। এই ধান্য মোটা হইলেও, লম্বা সুখাদ্য ও সৌরভ পূর্ণ এবং দো-কাটের বীজ হইতে জন্মাইতে পারিলে ইহার ফলন বিঘা প্রতি ১০/ মন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। দশ মন মোটা ধান হইতে সাতমন সিদ্ধ চাউল উৎপন্ন হয়। সাত মন চাউলের

দাম ১৪৲ টাকাও হইতে পারে, আবার শ্রেষ্ঠ সুগন্ধযুক্ত পুরাতন পেশোয়ারী চাউল হইলে এই সাত মণের দাম ৫০৲ টাকাও হইতে পারে। কাটারিভোগ, বাদসাপসন্দ, সমুদ্রবালি, কর্পূরকাঠি, রাণীপাগল, রাঁধুনী-পাগল, কেলে-জিরা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠজাতীয় আমন-ধান বিঘাপ্রতি গড়ে ৬/ মণ মাত্র পাওয়া যায়। এই ৬/ মণ ধান হইতে ৪/ মণ সিদ্ধ চাউল, এবং ৩৷৷৹ মণ আতপ চাউল হইবে। ৪/ মণ সুঘ্রাণযুক্ত সরু চাউলের দাম ২০৷২৫৲ টাকা। সকল দিক দেখিতে গেলে, মোটা ধান লাগানতেই সুবিধা অধিক বোধ হয়। মোটা ধান হইতেও কয়েক জাতীয় যে শ্রেষ্ঠ চাউল পাওয়া যায় সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মোটা ধানের বীজে অঙ্কুরের পরিপোষণার্থ যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত থাকে, সরু ধানের বীজে তদপেক্ষা অনেক কম থাকে। সরু ধানের বীজ হইতে যে গাছ বাহির হয় তাহার পাতা সরু সরু এবং উহা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। মোটা ধানের বীজ হইতে যে গাছ হয় তাহার পাতা মোটা ও চওড়া হয় এবং উহার অধিক তেজঃ হয়। এই কারণেই সরু ধান অপেক্ষা মোটা ধানের ফলন অধিক। সাধারণ শ্রমজীবিগণ যে সে মোটা ধানের চাউলের ভাত খাইয়া পরিপাক করিতে পারে। সূক্ষ্ম চাউল ধনীব্যক্তিগণই অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারেন। যদি কয়েকটী শ্রেষ্ঠজাতীয় মোটা ধান হইতে সহজ-পাচ্য, সুখ-খাদ্য ও সুঘ্রাণযুক্ত চাউল উৎপন্ন হয়, এবং ইহাদের ফলন সাধারণ মোটা ধানের সমানই করিয়া লইতে পারা যায়; এইরূপ ধানের চাউল প্রচলিত হইয়া উহা সুলভ মূল্যেও বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কি ধনী কি নির্ধণ সকলেই তখন উহার ভাত খাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে। যত প্রকার ধান্য লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে তন্মধ্যে পেশোয়ারী "সোয়াতি" ধান্যের দো-কাট

বীজ হইতে সর্ব্বোৎসকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে এই ধান্য প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। নূতন চাউল ও পুরাতন চাউল কিরূপে প্রভেদ করিবে?

২। আশু-ধান্যের চাউল ব্যবহারে আপত্তি কি কি?

৩। আশু-ধান্য চাষে কি কি উপকার দর্শে? এই ধান্যের চাষ বৃদ্ধি করিবার উপায় কি?

৪। আমন-ধান চাষ সম্বন্ধে কি কি উন্নতি প্রচলন করা যাইতে পারে?

৫। ধানের জমিতে চাষ দেওয়া কোন্ সময়ে আরম্ভ করা উচিত এবং কেন?

৬। আশু-ধান্য রোপণ করিয়া লাগানর প্রথা কিরূপ মনে কর?

৭। আমন ও আশু ধান্যের বীজ বপন ও রোপণের উপযুক্ত সময় নির্দ্দেশ কর। স্থান বিশেষে সময়ের তারতম্য কিরূপে ঘটিতে পারে?

৮। অগ্রিম বীজবপন করিবার পরে যদি অনাবৃষ্টিবশতঃ বীজ শুকাইতে থাকে তাহার উপায় কি?

৯। "আশু-ধান্যের দো-কাটের বীজ" এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই বীজ ব্যবহারে কি উপকার দর্শে?

১০। এক বিঘা বীজের জমিতে কত ধান্যের বীজ ব্যবহার করিতে হয়। এই বীজ রোপণ করিতে হইলে কত জমি প্রস্তুত থাকা আবশ্যক? কত অন্তর কয়টী করিয়া বীজের গাছ রোপন করা উচিত?

১১। সরু চাউল ও মোটা চাউলের বিঘা প্রতি ফলনের কিরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে কয়েকটী উদাহরণ দিয়া বর্ণনা কর।

১২। সরু চাউল জন্মানতে উপকার অধিক কি মোটা চাউল জন্মানতে ?

১৩। ধান কাটা সম্বন্ধে আউশ ও আমন ধানে কিরূপ প্রভেদ করা উচিত ?

১৪। ধান্য ও চাউল পুরাতন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য ও উপায় কি ?

১৫। কিরূপ পর্য্যায়ে আশু-ধান্য জন্মানতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে ?

১৬। এক বৎসরের মধ্যে তিনটী ফসল কিরূপে লওয়া যাইতে পারে ?

১৭। আশু-ধান্যের ফলন কম হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ কর।

১৮। বোরো, রায়দা ও জলী ধান্য কাহাকে কহে ?

১৯। শ্রেষ্ঠ, সুগন্ধ-যুক্ত কয়েক জাতীয় ধান্যের নাম কর।

২০। ধান চাষ সম্বন্ধে কি কি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হওয়া সম্ভব ?

—:§:—

তৃতীয় অধ্যায়।

তৈল-প্রদ বীজ।

বীজ ও খোল।—ধান্য, গোধূম, যব, দেব-ধান্য এই সকল তৃণজ শস্য মানুষের প্রধান খাদ্য। এই সকল শস্য এদেশের অধিকাংশ ভূমি অধিকার করিয়া আছে। বঙ্গদেশের শতকরা ৬০ ভাগ ভূমিতে ধান্য জন্মে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত ও ডাল। কিন্তু যে সকল ফসল হইতে ডাল উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা যে সকল ফসল হইতে তৈল উৎপন্ন হয় ঐ সকলই এদেশে অধিক পরিমাণে জন্মান হইয়া থাকে। ইহার কারণ, তৈল ও তৈলপ্রদবীজ অধিকাংশ বিদেশে চলিয়া যায়; ডাল কলাই অধিক বিলাতে চালান হয় না। ব্যঞ্জন রাঁধিবার জন্য ও গায়ে মাখিবার জন্য এদেশে যে পরিমাণে তৈলের ব্যবহার হইয়া থাকে, তদপেক্ষা এদেশে উৎপন্ন অধিক তৈল বিলাতে সাবান প্রস্তুত, রং প্রস্তুত ও কল পরিষ্কার রাখিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে এদেশের লোকের অনেক টাকা লাভ হয়। কিন্তু তৈলপ্রদ বীজের খোলের ভাগ অতি উত্তম সার। যদি তৈলপ্রদ বীজ রপ্তানি না হইয়া কেবল তৈল রপ্তানি হইত তাহা হইলে দেশের আরও মঙ্গল হইত। তাহা হইলে খোল সস্তা হইয়া যাইত এবং এদেশের কৃষকেরা অধিক পরিমাণে খোল সাররূপে ব্যবহার করিতে পারিত।

যত প্রাকার সার সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে তন্মধ্যে রেড়ির, তিসির, সর্ষপের, সোরগোঁজার, পোস্ত-দানার, তিলের, কুসুমফুলের, নারিকেলের চীনাবাদামের ও নিমের খোল অতি উৎকৃষ্ট সার। কৃষকেরা যদি এই সকল ফসল জন্মাইয়া তৈলটা বাহির করিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া, খোল ভাগটা আপনাদের জমিতে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে শুদ্ধ জমির উন্নতি হয় এরূপ নহে গোজাতিরও সমূহ উপকার দর্শে। অবশ্য রেড়ির খোল বা নিমের খোল গরুর খাদ্য নহে, কিন্তু অবশিষ্ট খোল গরুকে খাইতে দিলে গরু যে জমিতে রাখা যায় সেই জমিও মলমূত্র দ্বারা অত্যন্ত উর্ব্বর হয়।

রপ্তানি। এদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার তৈল বিলাতে চালান যায়, ইহার অধিকাংশই রেড়ির তৈল। নারিকেল তৈল ও অনেক টাকার, অর্থাৎ প্রায় ষোল লক্ষ টাকার, প্রতি বৎসর বিলাতে রপ্তানি হয়; কিন্তু তৈলপ্রদ বীজের রপ্তানি দশ ক্রোর টাকারও অধিক। দেশের লোক সংখ্যা যেমন ক্রমশঃ বাড়িবে, তেমনই ক্রমশঃ রপ্তানির-জন্য তৈলপ্রদবীজ, পাট প্রভৃতি যে সকল ফসল এখন প্রস্তুত হইতেছে সেই সকলের পরিবর্ত্তে দেশের উপযুক্ত খাদ্য উৎপাদনের ফসল প্রস্তুত হইতে পারিবে।

জমি।—সকল প্রকার তৈলপ্রদ বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য বিশেষ উর্ব্বর ভূমির আবশ্যক করে না। তিসি উর্ব্বর ভূমি ভিন্ন ভাল জন্মে না, কিন্তু সর্ষপ, তিল, রেড়ি, সোরগোঁজা, বালুকাময় বা প্রস্তরময় জমিতে উত্তম হইয়া থাকে। ছোটনাগপুর বিভাগে যে পরিমাণে তৈলপ্রদবীজ জন্মিয়া থাকে বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থলে এ পরিমাণ জন্মে না। ছোটনাগপুর বিভাগের ভূমি নিতান্ত প্রস্তরময়।

৪র্থ চিত্র। চীনা-বাদামের গাছ ও ফল।

উৎকৃষ্ট ফসল।—চীনাবাদাম, তিল ও নারিকেলের খাপরা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ, অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ, তৈল উৎপন্ন হয়। মেদিনীপুর অঞ্চলে, কটকে, চট্টগ্রামে, এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে হিজলি-বাদামের গাছ জন্মিয়া থাকে। এই বাদাম হইতেও শতকরা ৪০ ভাগ অতি সুস্বাদু তৈল বাহির হয়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বালুকা ও প্রস্তরময় স্থানে এই গাছ জন্মান উচিত।

আহারীয় ও অনাহারীয় খোল।—হিজলি-বাদাম, চীনা-বাদাম, পোস্তদানা ও তিল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইয়া যে খোল ভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা মানুষেরও আহারের সামগ্রী। সর্ষপ, নারিকেল, তিসি, কুসুমবীজ, সোরগোঁজা ও কার্পাস এই কয়েকটী তৈলপ্রদ

বীজ হইতে যে খোল উৎপন্ন হয় উহা গরুর খাদ্য। রেড়ির, নিম্বের ও মহুয়ার খোল গরুর অখাদ্য, কিন্তু রেড়ির খোল উপরি উক্ত সকল খোল অপেক্ষা তেজস্কর সার।

তৈলের তারতম্য।—কোঁচ্ড়া বা মহুয়ার তৈল সাঁওতালের আহারার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং নিম্বের তৈল উহারা মাখে। কুসুমফুলের এবং সোরগোঁজার তৈল ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশের লোকে আহারার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। অভ্যাস না থাকিলে কুসুমফুলের বীজের তৈলে ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইলে পেটের অসুখ হয়। বঙ্গদেশের লোকে প্রায় সকলেই সর্ষপের তৈল ব্যবহার করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় তিলের তৈলও আহারার্থে ব্যবহার হয়। বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেরা নারিকেল তৈল গাত্রে মাখিয়া থাকে, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশের লোকেরা নারিকেল তৈল পাক কার্য্যেও ব্যবহার করে। কোঁচড়ার তৈল ঘৃতের মত দেখিতে বলিয়া অসৎলোকেরা ঘৃতের সহিত ইহা মিশাইয়া বিক্রয় করে।

বাতির তৈল।—পূর্ব্বে সর্ষপের, নারিকেলের এবং রেড়ির তৈল প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য প্রচুর ব্যবহৃত হইত। এখন খনিজ তৈল, অর্থাৎ কেরোসিন তৈল, প্রায় সর্ব্বত্র দীপ জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ফরিদপুর অঞ্চলে পিত্তরাজ বা রয়না নামক এক প্রকার গাছের বীজ হইতে এবং কটক অঞ্চলে কেঞ্জা বা করঞ্জা এবং পুনাক্ নামক আর দুই প্রকার বৃক্ষের বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লোকে দীপ জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। সাঁওতালেরা কোন কোন স্থানে শেয়াল-কাঁটার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া জ্বালাইবার জন্য ব্যববার করে।

তৈল বাহির করিবার উপায়।—অধিকাংশ তৈলপ্রদ

বীজকে ঘানিতে পেষণ করিয়া উহার তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। রেড়ি, রয়না ও কেঞ্জা বা করঞ্জা জলে সিদ্ধ করিয়া পরে উহাদের তৈল ছাঁকিয়া লওয়ারও নিয়ম আছে। সাঁওতালেরা মহুয়া, নিম প্রভৃতি বীজ গুঁড়া করিয়া ফুটন্ত জলের ভাপের উপর রাখিয়া পরে সাবুই ঘাস ও দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তিন চারিটি গুঁড়ার তাল চাপ-যন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া উহার উপরে তিন চারিজন লোক বসিয়া তৈল বাহির করিয়া লয়।

চাষ।—সর্ষপ বঙ্গদেশের প্রধান তৈলপ্রদ বীজ। সর্ষপ নানা জাতীয় হইয়া থাকে। তিসি, তিল ও সোরগোজার ন্যায় সর্ষপও বর্ষার পরে বপন করিতে হয়। বর্ষার পূর্ব্বেও কয়েক জাতীয় তৈলপ্রদ বীজ লাগাইতে পারা যায়। চীনের বাদাম ও রেড়ি ইহার প্রধান উদাহরণ। কার্পাসের বীজও বর্ষার পূর্ব্বে লাগাইতে হয়। এক প্রকার তিল শীতকালের শেষে বপন করা নিয়ম আছে। তৈলপ্রদ ফসল বর্ষা ও শীতকাল উভয় কালেই প্রত্যেক কৃষকের জন্মান কর্ত্তব্য। বিঘা প্রতি এক সের মাত্র বীজ ছিটাইলে দুই মণ সর্ষপ উৎপন্ন হয়। নদীর ধারের “দিয়াড়” জমিতে সর্ষপ ভাল জন্মে। সর্ষপের ভূমিতে কলাই ছিটাইয়া দিলে উভয় ফসলই প্রায় পূর্ণ পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ দুই মণ ফসলের পরিবর্ত্তে চারি মণ ফসল পাওয়া যায়। সর্ষপ পূর্ব্বেই পাকিয়া যায়, কলাই একমাস পরে, অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র মাসে, কাটিতে হয়। এক মণ সর্ষপ হইতে দশ সের হইতে চৌদ্দসের পর্য্যন্ত তৈল উৎপন্ন হয়। দেশী সর্ষপ ও শ্বেত-সর্ষপ হইতে তের-চৌদ্দ সের এবং রাই-সর্ষপ হইতে নয় দশ সের মাত্র তৈল উৎপন্ন হয়। রাই-সর্ষপের তৈলে অধিক ঝাঁজ বলিয়া এই তৈল অনেকে অধিক পছন্দ করে। সর্ষপের সহিত সোরগোঁজা মিশাইলে

তৈলের পরিমাণ কিছু অধিক হয়। একারণ, বাজারের সর্ষপ তৈল প্রায় কখনই খাঁটি হয় না।

কার্পাসের বীজ ও খোল আমাদের দেশে প্রায় গরুকে খাইতে দেয় না। কিন্তু অন্ততঃ শীতকালে গরুর পক্ষে এই দুইটী সামগ্রী উত্তম খাদ্য। বীজ হইতে তৈলভাগ বাহির করিয়া লইয়া, অধিকাংশ তৈল বিক্রয় করিয়া, খোলভাগ সমস্ত গরুর আহারের জন্য ব্যবহার করা বিশেষ কর্ত্তব্য। গ্রামে গ্রামে ঘানি চলিবে, এক ছটাক তৈলপ্রদ বীজ গ্রামের বাহিরে যাইবে না, সমস্ত খোলভাগটী গরুর আহার বা সাররূপে ব্যবহৃত হইবে, প্রত্যেক কৃষকের কর্ত্তব্য এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করা।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। এদেশে কোন্ কোন্ ফসল প্রধানতঃ রপ্তানির জন্য জন্মান হইয়া থাকে? এরূপ ফসল জন্মানতে কি উপকার হয়?

২। তৈল-প্রদ বীজ সকলের রপ্তানি সম্বন্ধে কি আপত্তি আছে? কি পরিমাণে এই সকল বীজ রপ্তানি হইয়া থাকে?

৩। কোন্ কোন্ তৈল-প্রদ বীজের খোল-ভাগ মিষ্টান্ন বা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মানুষে খাইতে পারে?

৪। কোন্ কোন্ খোল্ গরুর আহার এবং কোন্ গুলিই বা গরুর অখাদ্য?

৫। সাররূপে ব্যবহৃত করিতে হইলে কোন্ খোলের কিরূপ উপকারিতা?

৬। গরুকে খোল খাইতে দিলে কি কি উপকার পাওয়া যায়?

৭। তৈল-প্রদ বীজ প্রস্তুতের জন্য কিরূপ জমির আবশ্যক?

৮। কোন্ বীজ হইতে কি পরিমাণ তৈল বাহির হয় তাহার একটী তালিকা দেও। শ্বেতী-সর্ষপ ও রাই-সর্ষপের তৈলপ্রদ গুণের তারতম্য নির্দ্দেশ কর।

৯। সোরগোঁজার ব্যবহার কি?

১০। কোন্ সময়ে কোন্ তৈল-প্রদ বীজ বপন করিতে হয় তাহার একটী তালিকা দেও।

১১। হিজ্‌লি-বাদাম কিরূপ পদার্থ?

১২। কুসুম-ফুলের বীজ হইতে যে তৈল হয় তাহার গুণাগুণ বর্ণনা কর।

১৩। গাত্রে মাখিবার জন্য ও জ্বালাইবার জন্য যে তৈলগুলি ব্যবহার হইয়া থাকে উাহাদের নাম কর।

১৪ কোঁচড়ার তৈল কিরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে?

১৫। তৈলপ্রদ বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার উপায়গুলি নির্দ্দেশ কর।

১৬। সর্ষপের সহিত আর কোন্ ফসল একত্রে জন্মান যাইতে পারে? তাহাতে উপকার কি?

১৭। তৈলপ্রদ বীজের বিক্রয় সম্বন্ধে গ্রাম্য সমিতির কর্ত্তব্য কি?

চতুর্থ অধ্যায়।

শস্য নষ্ট হইবার কারণ।

সকল বৎসরে এবং সকল ভূমিতে সমভাবে শস্য জন্মে না। আবার কখন কখন দেখা যায় গাছ উত্তম জন্মিয়াছে, কিন্তু শস্য হইবার পূর্ব্বেই

পোকা লাগিয়া বা কোনরূপ রোগ জন্মিয়া শস্য নষ্ট হইয়া গেল। ফসল যে নানা কারণে নষ্ট হইয়া থাকে ইহা প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কারণগুলি এই :—অনাবিষ্টি, অতি-বৃষ্টি, শিলা-বৃষ্টি, কীটের উৎপাত. দুরন্ত জন্তুদিগের উৎপাত ও উদ্ভিদ্ রোগ।

অনাবৃষ্টি।—সম্বৎসর ধরিয়া এক কালীন বৃষ্টি হইল না, ভারত বর্ষে এরূপ কুত্রাপিও কথন হয় না। তবে কোথাও বৎসরে ৩০০।৪০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, কোথাও বা ১৫।২০ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি হয়। যে সকল স্থানে বৎসরে গড়ে ৭০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয়, সে সকল স্থানে অনাবৃষ্টি হেতু ফসল কথনই নষ্ট হয় না। যে স্থানে গড়ে বৎসরে ৭০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় সে স্থানে কোন বৎসরে হয় ত ৬০ বা ৬২ ইঞ্চি. কোন বৎসর বা ৮০ বা ৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের এরূপ তারতম্য ঘটিলে ফসলের কোন ক্ষতি ঘটে না। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে, এবং মালাবার উপকূলে অধিক পরিমাণ বৃষ্টি হইবার কারণ এই সকল স্থানে অনাবৃষ্টি ঘটিত দুর্ভিক্ষ কথনই হয় না। তবে এই সকল প্রদেশে বন্যা দ্বারা প্রায়ই স্থানে স্থানে ক্ষতি হইয়া থাকে।

বৃক্ষ-রোপণ।—আমন-ধান্য ও পাট জন্মিতে যেরূপ বৃষ্টিপাতের বা জলের আবশ্যক, সকল ফসলের পক্ষে সেরূপ বৃষ্টিপাতের বা জলের আবশ্যকতা নাই। পশ্চিম বঙ্গে এবং আর আর স্থানে যেথানে বৎসরে ৪০।৫০ ইঞ্চির কম বৃষ্টি হইয়া থাকে, ঐ সকল স্থানে এমন সকল ফসল জন্মান আবশ্যক যে সকলের জন্য অধিক বৃষ্টিপাত বা অধিক কাল ধরিয়া বৃষ্টিপাতের আবশ্যক করে না। বড় বড় বৃক্ষ একবার জন্মিয়া গেলে, বৃষ্টিপাতের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা বশতঃ অথবা বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্য বশতঃ, উহাদের কিছুই ক্ষতি হয় না। একারণ

পশ্চিম বঙ্গের নীরস ভূমিতে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মান কর্ত্তব্য। দুই বৎসর কাল ধরিয়া বৃক্ষের চারাগুলিকে বেড়া ঘেরিয়া, ও জল সেচনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে, পরে অতি সামান্য যত্নে বৃক্ষগুলি রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ভূমির গভীর প্রদেশ সিক্ত থাকে এবং এই সিক্ততাই বৃক্ষ সকলের নব পত্রোদ্গমনের সহায়তা করে। বৃহদাকারের বৃক্ষোপরি ভিন্ন এই দুই মাসে হরিত তরুণ পল্লব সাধারণতঃ আর কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু যে সকল ভূভাগে বৎসরে ১৫।২০ ইঞ্চি মাত্রও বৃষ্টি হয় না, অথবা যে সকল স্থানের ভূমি এত প্রস্তরময় বা বন্ধুর যে উহার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে বা দাঁড়াইতে পারে না, ঐ সকল ভূভাগে বড় বড় বৃক্ষও জন্মে না। সকল প্রকার গাছেরই জীবন জল এবং ভূমির সিক্ততা বৃষ্টির জলেরই উপর নির্ভর করে।

অনাবৃষ্টি-সহ ধান্য।—বৃক্ষ ভিন্ন আরও কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ্ সামান্য বৃষ্টি দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়। ধান ও পাট জন্মাইতে গেলে অধিক বৃষ্টির আবশ্যক, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু সকল প্রকার ধান ও সকল প্রকার পাট জন্মাইতে সমান পরিমাণে বৃষ্টির আবশ্যকতা নাই। আশু-ধান্য অল্প পরিমাণ বৃষ্টি দ্বারা এবং স্বল্প কালস্থায়ী বর্ষাকালে জন্মিয়া থাকে। আশু-ধান্য জন্মাইবার পক্ষে প্রধান বাধা এই যে ইহা নিকৃষ্ট ধান্য। অতি উৎকৃষ্ট, সুগন্ধ-যুক্ত সোয়াতি নামক এক প্রকার পেশ্‌ওয়ারী ধান্য আশু-ধান্য। এই ধান্য তিন মাসের মধ্যে পাকিয়া যায়, কিন্তু ইহার ফলন নিতান্ত কম। কিরূপ উপায়ে দো-কাটের বীজ বপণ করিয়া এই ধান্যের ফলন বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্ন ও উচ্চ উভয় প্রকার ভূমিতেই দো-কাটের সোয়াতি ধান্য জন্মাইতে পারা যায়। বঙ্গ দেশে

এই জাতীয় ধান্যের চাষ প্রচলন করিতে পারিলে দেশের সমূহ উন্নতি হওয়া সম্ভব। দো-কাটের বীজ হইতে অধিক অনাবৃষ্টি-সহ গাছ জন্মে, একথাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

মেস্তা পাট।—মেস্তা-পাট নামক এক জাতীয় পাট জন্মাইতেও অতি সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি পাতের আবশ্যক করে। যে সকল স্থানে বৎসরে ৫০।৬০ ইঞ্চির কম বৃষ্টি হইয়া থাকে ঐ সকল স্থানে এই জাতীয় পাটের প্রচলন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। এই পাট সাধারণ পাট অপেক্ষা দৃঢ় ও মসৃণ। ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। পাটেরই ন্যায় এই গাছ জন্মাইতে হয়, কেবল বিঘা প্রতি এক সের বীজ ব্যবহার না করিয়া মেস্তা-পাট লাগাইতে হইলে বিঘা প্রতি পাঁচ সের বীজ ছিটাইতে হয়। আর আর পাইট সমস্ত ঠিক পাটের ন্যায়। মেস্তা-পাটের জমিতে আদৌ জল দাঁড়াইতে দেওয়া উচিত নহে।

ফাপর।—তৈল-প্রদ ফসল গুলিন ও রবি শস্য সকল জন্মাইতেও অধিক বৃষ্টি পাতের আবশ্যকতা হয় না। যে সকল ভূভাগে বৃষ্টি অল্প হইয়া থাকে ঐ সকল ভূভাগে বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই, অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিণ মাসেই, উক্ত ফসল গুলি লাগান উচিত। বঙ্গ দেশের অন্যান্য স্থানে বৃষ্টি অধিক হইলেও ছোট নাগপুর অঞ্চলের কৃষকগণ তৈল-প্রদ বীজ ও রবি শস্য সকল লাগাইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ বান হইয়া থাকে। ফাপর বা রাজ-গীর নামক এক শস্য নিতান্ত নীরস প্রস্তরময় জমিতেও জন্মিয়া থাকে। ইহার বীজ হইতে গোধুমের ময়দার ন্যায় ময়দা প্রস্তুত হয়। কার্ত্তিক মাসে এই শস্য লাগান উচিত। বিঘা প্রতি ৮।১০ সের বীজ ছিটান আবশ্যক। সিমুল-আলুর গাছও সামান্য

বৃষ্টি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। এই গাছের মূল হইতে এরারুট্ ও ছাতু প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহারও প্রচলণ এদেশে হওয়া আবশ্যক।
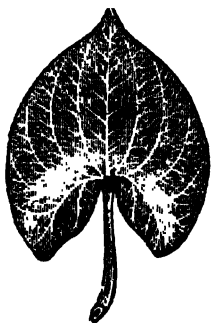
৫ম চিত্র। চুবড়ি-আলুর পাতা। ৬ষ্ঠ চিত্র। জেরুসালেম্ আর্টিচোকের পল্লব

৭ম চিত্র। জেরুসালেম আর্টিচোকের মূল।

হাতির-পায়া-আলু, দেবীর-আশান-আলু, ইত্যাদি কয়েক প্রকার চুবড়ি আলু বিলাতি গোল-আলুর স্তায় খাইতে। এই সকল চৈত্র বৈশাখ মাসে লাগান আবশ্যক। জেরুসালেম্-আর্টি-চোক্ নামক আর একটী গাছ

হইতে অতি সুখাদ্য মূল উৎপন্ন হয়। ইহাও বর্ষা কালের পূর্ব্বে বালি মাটিতে লাগান আবশ্যক। এই সকল ও অন্যান্য অনাবৃষ্টিসহ শস্য এদেশে যত জন্মান যায় ততই ভাল।

অতিবৃষ্টি।—অতিবৃষ্টি ঘটিত বন্যা দ্বারা স্থানে স্থানে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু ফসল নষ্ট হইয়া থাকে। যে সময়ে বন্যা আসিয়া ফসল নষ্ট হওয়া সম্ভব সে সময়ে মাঠে অধিক ফসল থাকা উচিত নহে। বন্যার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যে সকল ফসল লাগান যাইতে পারে ঐ সকলের উপরই অধিক নির্ভর করা আবশ্যক। নানা জাতীয় ফসল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাগাইতে পারিলে একই কারণ দ্বারা সকল ফসল গুলির ক্ষতি হইতে পারে না। এ কারণ নানা ফসল লাগান এবং অগ্র পশ্চাৎ করিয়া ফসল লাগানতে বিশেষ উপকার আছে। আশু-ধান্য চৈত্র মাসেও লাগান যাইতে পারে, বৈশাখ মাসেও লাগান যাইতে পারে, জ্যৈষ্ঠ মাসেও লাগান যাইতে পারে। আমন ধান্য রোপণের প্রশস্ত সময় আষাঢ় মাস। চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ক্রমশঃ যদি ধান্য লাগান যায় তাহা হইলে অনাবৃষ্টি বা অতি বৃষ্টির কারণ কিছু ক্ষতি হইলেও সম্পূর্ণ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। যদি কোন নিম্ন ভূভাগে অতিবৃষ্টি হেতু প্রতি বৎসরই ক্রমশঃ জল জমিয়া গিয়া ৮, ১০ বা ১৫ হাত গভীর জলাশয় হইয়া যায়, এমন স্থলে জলী ধান্য লাগান উচিত। দীর্ঘ কাণ্ড যুক্ত এই সকল ধান্য পূর্ব্ব বঙ্গে জন্মান হইয়া থাকে। জমিতে যেমন জল বাড়িতে থাকে এই সকল ধানের গাছও তেমনই বাড়িয়া যাইতে থাকে। কোন কোন জাতীয় পাট ও ইক্ষুও ৩৪ হাত জলে জন্মিয়া থাকে। যে সকল ভূভাগ বর্ষাকালে জলাশয়ের ন্যায় হইয়া যায় ঐ সকল ভূভাগে এইরূপ বিশেষ জাতীয় ধান্য, পাট ও ইক্ষু লাগান এবং জল নামিয়া গেলেই তৈল-প্রদ বীজ ও রবি-শস্য সকল জন্মান কর্ত্তব্য।

কীটের উৎপাত।—কীটের উৎপাত নিবারণের প্রধান উপায়, (ক) ভাল করিয়া ও অনেক বার করিয়া ভূমি কর্ষণ করা; (খ) একই জমিতে দুই তিন বৎসর ধরিয়া উপর্য্যুপরি একই ফসল না লাগান, (গ) পর্য্যায়-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ফসল লাগান, এবং (ঘ) কীটের দ্বারা যে ফসল নষ্ট হইল, সেই ফসলটী পরবৎসর এক কালীন না লাগান।

উদ্ভিদ রোগ।—'ধসা-লাগা' ইত্যাদি রোগ দ্বারা অনেক ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। লঙ্কা, বেগুন, গম, প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ফসল এইরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। গোধুমের বীজে এক জাতীয় উদ্ভিদ্ রোগের বীজ সংলগ্ন থাকিবার কারণ ইহাতে হর্দা ধরিয়া থাকে। ফসলের তল-দেশে জল দাঁড়াইবার কারণ এই সকল রোগ প্রায়ই জন্মিয়া থাকে। কয়েক জাতীয় ধান্য ও পাট ব্যতীত প্রায় সকল ফসলেরই জল দাঁড়াইবার কারণ অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। এ কারণ জল নির্গমনের ব্যবস্থা করা প্রায় সকল ফসলের জন্যই বিশেষ আবশ্যক। বর্ষা কালে যেমন আমন-ধান্যের গোড়ায় যাহাতে জল বাঁধিয়া থাকে সেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক, সেইরূপ অন্য ফসলের নিম্নে যাহাতে জল না বাঁধিয়া থাকে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কীট ও উদ্ভিদ্ রোগ নিবারণের একটা বিশেষ উপায় বীজ বা কলম লাগাইবার সময় উহাদের কীট ও উদ্ভিদণু নাশক কয়েকটী পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগান। অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয়টী বর্ণিত হইবে।

মূষিক প্রভৃতি।—মূষিক, শশক, বানর, হনুমান, শৃগাল, বিগ্‌ড়ি-হাঁস, হরিণ, বণ্যবরাহ প্রভৃতি কয়েকটী জন্তু কৃষি উৎপন্ন শস্য সমুদায়ের

মহা শত্রু। এই সকল শত্রু নাশের হেতু সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সৃষ্ট হইয়াছে। বিষধর সর্প দ্বারা মানুষের জীবন নাশের সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইহাদের মারিয়া ফেলা উচিত, কিন্তু যে সকল সর্পের বিষ নাই, ঐ সকল সর্প, ইন্দুরের গর্ত্তের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া ইন্দুর ভক্ষণ করিয়া থাকে ; এই সকল সর্প মারা উচিত নহে। বিড়াল ও বেজী দ্বারাও অনেক ইন্দুর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভেক, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, ঝিঁ-ঝিঁ-ফড়িং ইত্যাদি কয়েকটী জীব জমির ও শস্যের কীট খাইয়া অনেক উপকার করে। বন্দুক ও তীর-ধনু ব্যবহার দ্বারা শৃগাল, শশকাদি জন্তু বিনষ্ট করা উচিত। যে সকল স্থানে বন্দুকাদির ব্যবহার প্রচলিত নাই, ঐ সকল স্থান প্রায় ব্যাঘ্র-সঙ্কুল দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঘ্র মানুষের কিছু ক্ষতি করে বটে, কিন্তু শৃগাল শশকাদি বিনষ্ট করিয়া ক্ষতি অপেক্ষা উপকারই অধিক করিয়া থাকে। পক্ষী হইতে শস্যের উপকার ও অপকার উভয়ই ঘটে। কোন কোন পক্ষী শস্য খাইয়া জমির অপকার করে, যথা টিয়া, চড়ুই, ঘুঘু, বুল্ বুল্, বিগ্‌ড়ি-হাঁস, পায়রা, বাবুই, ইত্যাদি। কোন কোন পক্ষী জমির পোকা খুঁটিয়া খাইয়া চাষীর বিশেষ উপকার করে, যথা, শালিক, ছাতারে, ফিংএ, ইত্যাদি। কোন কোন পক্ষী পতিত জমির পোকা খুঁটিয়া খাইয়া উপকার করে, আবার কোন কোন ফসল খাইয়াও অপকার করে, যথা, কাক। কাক ভুট্টার দানা অপক্ক অবস্থায় খাইয়া কিছু ক্ষতি করে বটে, কিন্তু মোটের উপর জমির পোকা খুঁটিয়া খাইয়া উপকার অধিক করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সকল জন্তু ফসলের অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে, মানুষে ঐ সকলের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য অথবা উহাদের পুষিবার জন্য শীকার করিয়া থাকে। এইরূপে অপকারক জন্তুদিগের শীকার করা প্রথা গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। ফসল নষ্ট হইবার কারণ গুলিন বলিয়া যাও।

২। ভারতবর্ষের কোন্ ভূভাগে কি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহার একটী সাধারণ আভাস দাও।

৩। অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষ কি পরিমাণে বৃষ্টির অভাব হইলে হওয়া সম্ভব? কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়?

৪। কোন্ কোন্ জাতীয় ধান্য অত্যধিক জলেও জন্মিয়া থাকে? কোন্ কোন্ জাতীয় ধান্য স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারাও জন্মিয়া থাকে?

৫। কিরূপ প্রকরণ দ্বারা অনাবৃষ্টি-সহ আশু ধান্যকে আরও অনাবৃষ্টি-সহ করিতে পারা যায়?

৬। অনাবৃষ্টি-সহ আর কয়েকটী ফসলের নাম কর। এই সকল ফসলের উপকারিতা কি ও কি উপায়ে ইহাদের চাষ করিতে হয়?

৭। বৃক্ষরোপণের উপকারিতা কি?

৮। পাট ও ইক্ষু জলার মধ্যে জন্মে কি না?

৯। মেস্তা-পাটের চাষ বর্ণনা কর।

১০। ক্ষাপর কিরূপ ফসল?

১১। অতিবৃষ্টি দ্বারা যে যে স্থানে বন্যা হইয়া ফসল মারা যায় সেই সেই স্থানে কি নিয়মে ফসল জন্মান উচিত?

১২। কীটের উৎপাত নিবারণ করিবার কয়েকটী সাধারণ নিয়ম বর্ণনা কর।

১৩। কয়েকটী উদ্ভিদ রোগের নাম কর। ইহাদের উৎপত্তির সাধারণ কারণ কি?

১৪। কীট ও উদ্ভিদ রোগের নিবারণের একটী বিশেষ উপায় নির্দ্দেশ কর।

১৫। মূষিকাদি বৃহদাকার জন্তু দিগের হাত হইতে ফসল রক্ষা করিবার কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ কর।

১৭। উপকারক ও অপকারক পক্ষী কয়েকটীর নাম দাও।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনাবৃষ্টিসহ শস্য।

যে বৎসর অতি সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি হইবার কারণ ধান্যাদি প্রধান শস্য সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়, সে বৎসরেও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন শস্য উত্তম জন্মিতেছে। যে সকল শস্য স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া যায়, ঐ সকল প্রত্যেক কৃষকেরই জন্মান কর্ত্তব্য। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটী ফসল চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই অধ্যায়ে কয়েকটী বর্ণিত হইবে।

ভুট্টা।—নিম্ন বঙ্গদেশের লোক ভুট্টা বা মকা খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না বলিয়া, কৃষকেরা প্রায় এই ফসলটী অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলে ভুট্টার দানা হইতে সহজ পরিপাচ্য আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অপরিপক্ক অবস্থায় ভুট্টার দানা সিদ্ধ করিয়া খাইলে উহা পরি-

পাক হইয়া থাকে। কিন্তু কাঁচা ভুট্টা দুই চারি দিবসের অধিক ভক্ষ্য অবস্থায় রক্ষিত হইতে পারে না। দানা গুলি এক কালীন পাকিয়া গেলে
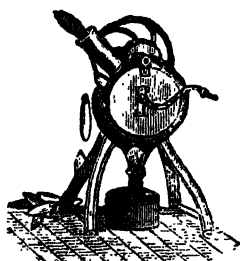
৮ম চিত্র। ভুট্টার দানা ছাড়ান কল।

ধান্য বা কলাইয়ের ন্যায় ইহা সহজেই রক্ষিত হয়। এ অবস্থায় ভুট্টা মোটা মোটা করিয়া ভাঙ্গিয়া, উহা জলে সিদ্ধ করিয়া, উহা হইতে ভাতের ন্যায় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি ভুট্টার ভাত খাইয়া পরিপাক করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও নিতান্ত সহজ পরিপাচ্য সামগ্রী নহে। পাকা ভুট্টার দানা ভাজিয়া বা দগ্ধ করিয়া, এমন কি, খৈ করিয়া খাইলেও, সহজে পরিপাক করিতে পারা যায় না। আমেরিকাবাসীরা ভুট্টার দানা হইতে "কর্ণফ্লাউয়ার" নামক অতি সহজ পরিপাচ্য আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সামগ্রী রোগীরও আহার বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রে ব্যবহার হইয়া থাকে। "কর্ণ-ফ্লাউয়ার' বা ভুট্টার পালো নিম্ন বর্ণিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

ভুট্টার পালো।—শুষ্ক ভুট্টার দানা গামলার মধ্যে রাখিয়া উহার সহিত ফুটন্ত জল মিশাইয়া দিতে হয়। সমস্ত রাত্রি এই জলের মধ্যে ভুট্টার দানা থাকিয়া নরম হইয়া যায়। পর দিবস ঐ দানা যাঁতায় পিষিয়া বা ঢেঁকিতে কুটিয়া লইয়া, যে মণ্ড প্রস্তুত হইবে,

উহা কাপড়ের উপর রাখিয়া, কাপড় সমেত পরিষ্কার জলের মধ্যে ছাঁকিতে ছাঁকিতে পালোটী সমস্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, জলের নিম্নে ক্রমশঃ জমিতে থাকিবে। পরে আর এক গামলা পরিষ্কার জলের মধ্যে কাপড় সমেত মণ্ডের অবশিষ্ট অংশ নাড়িয়া নাড়িয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যখন দেখা যাইবে যে আর শ্বেত সার বা পালো নির্গত হইতেছে না, তখন কাপড়ে অবশিষ্ট সামগ্রী বা সিটা নিংড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয় এবং গাম্‌লা দুইটীর জলের নিম্নে যে শ্বেত-সার জমিয়া যায় উহা, দুই এক ঘণ্টার পরে উপরিস্থিত জল ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় গাম্‌লার মধ্যে পরিষ্কার জল দিয়া, মিশাইয়া দিয়া, এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় উপরিস্থিত জল ফেলিয়া দিয়া, সংগ্রহ করিতে হয়। উপরিস্থিত জল গাম্‌লা কাত্‌ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, নিম্নস্থ শ্বেত-সার রৌদ্র-মুখী করিয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। এই শুষ্ক শ্বেত-সার পাক করিয়া খাইলে অতি সহজে পরিপাক হয়। সিটে ভাগ রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া গোরুর আহারের জন্য ব্যবহার করা চলে। ইহা হইতে পেষণ দারা ময়দা নির্গত হয় বটে, কিন্তু এই ময়দা সহজে পরিপাক করা যায় না বলিয়া, সিটে গবাদি জন্তুর আহারার্থই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গবাদি রোমন্থক জন্তুর পাকস্থলী
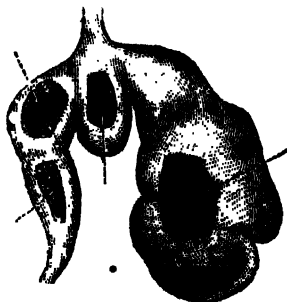
৯ম চিত্র। রোমন্থক জন্তুর পাকস্থলী।

চারিভাগে বিভক্ত এবং অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। এ কারণ উহারা মনুষ্যের বা অশ্বের অপরিপাচ্য সামগ্রীও পরিপাক করিতে পারে। স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারা ভুট্টা গাছ জন্মিয়া থাকে, ইহার কারণ, ভুট্টা গাছের শিকড় ৫।৬ ফুট্ পর্য্যন্ত গভীর হইয়া থাকে, চৈত্র মাসের পূর্ব্বেই গভীর ভাবে চাষ দিয়া ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া, ঐ মাসে যে দিবস অধিক পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া যাইবে, ঐ দিবসেই, অর্থাৎ জমি সরস থাকিতে থাকিতেই শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বীজের দানা লাগান কর্ত্তব্য। শ্রেণী গুলি এক হাত অন্তর করা উচিত, এবং বীজ আধ হাত অন্তর করিয়া পুতিয়া যাওয়া উচিত। সকল প্রকার ভুট্টা অপেক্ষা জুয়ানপুরের ভুট্টা হইতে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহা তিন মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায়; ইহা হইতে কিছু অধিক ফসলও জন্মিয়া থাকে, দেখিতে ইহার দানা গুলি শুভ্রবর্ণ এবং খাইতে সুমিষ্ট। বীজ লাগাইবার পরে গাছগুলি প্রায় এক হাত পরিমাণ উচ্চ হইলে উহাদের গোড়ায় মাটি চাপান আবশ্যক। কাঁচা অবস্থায় যদি ভুট্টা গুলি ব্যবহার বা বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে গাছ গুলি গোরুর আহারার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাঁচা ভুট্টার গাছ গোরুর জন্য অতি উত্তম খাদ্য। ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলে এক বিঘা জমি হইতে ৭।৮ মণ ভুট্টার দানা এবং ১০০।২০০ মণ ডাঁটা পাওয়া যাইতে পারে। ভুট্টা পাকিয়া গেলে গাছ গুলি গোরুর আহারের জন্য বিশেষ উপকারে আইসে না। কিন্তু কাগজ প্রস্তুতার্থে ইহা ব্যবহারে আনা যাইতে পারে। কাঁচা অবস্থায় মক্কা গুলি ভাঙ্গিয়া বিক্রয় বা ব্যবহার করিতে পারিলে গাছ গুলি পরে শুকাইয়া গেলেও গরুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলে গোরু উহা খাইয়া থাকে।

দেব-ধান্য বা জুয়ার।—এই ফসলও অপেক্ষাকৃত অল্প

পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারা জন্মিয়া থাকে। ইহা নানা জাতীয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেমন ধান্য প্রধান শস্য, মান্দ্রাজ প্রদেশে সেইরূপ দেব-ধান্য বা চোড়াম্ প্রধান শস্য। ইহার দানা পাকিয়া গেলেও ইহার গাছের উপরিভাগের অর্দ্ধেক গোরুর আহারের জন্য ব্যবহার হইতে পারে। নিম্নের অর্দ্ধেক জ্বালানী কাষ্ঠের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি গাছ গুলি ফুল হইবার পূর্ব্বেই ঘাসের ন্যায় কাটিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আগা-গোড়া সমস্তই ছোট ছোট করিয়া খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিলে গোরুতে খাইয়া ফেলে। এক বিঘা জমিতে ৮।১০ মণ দানা ও ১৫০৴ হইতে ২০০৴ মণ পর্য্যন্ত ডাঁটা জন্মিয়া থাকে। এক একটী দেশী গোরু প্রত্যহ ন্যূনাধিক অদ্ধ মণ ঘাস খাইয়া থাকে, এজন্য এই ঘাস জন্মাইতে পারিলে এক এক বিঘা জমির দ্বারা একটী করিয়া গোরু পুষিতে পারা যায়। কাঁচা অবস্থায় এই ঘাস কাটিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সম্বৎসরের জন্য গোরুর আহার এক কালীণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারা যায়। চৈত্র, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন করাও চলে, আবার ভাদ্র-আশ্বিণ মাসেও বীজ বপন করা চলে। চৈত্র-বৈশাখে বীজ বপন করিলে বীজ ভাল হইয়া পাকিতে পারে না, কেন না শ্রাবণ-ভাদ্রে বর্ষার ধারায় ফুলের রেণুগুলি ধৌত হইয়া পড়িয়া, বীজ জন্মাইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। কিন্তু চৈত্র-বৈশাখ মাসে দেব-ধান্যের বীজ বপন করিয়া লাগাইয়া দিলে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায়। এ কারণ, দেব-ধান্য ঘাসের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে, বিঘা প্রতি তিন সের বীজ ছিটাইয়া দেওয়া উচিত; যদি শস্যের জন্য ইহা জন্মান হয়, তবে ৴১॥০ সের মাত্র বীজ ব্যবহার করা উচিত। শস্যের জন্য যে বীজ লাগান হয়, উহা শ্বেত বর্ণের; ঘাসের জন্য যাহা লাগান হয়, ঐ বীজ লোহিত বা কৃষ্ণ বর্ণের হইয়া থাকে। জমির পাইট

ভাল রকম না হইলে এবং গাছের চারা অবস্থায় অধিক বৃষ্টিপাত ও গাছের বর্দ্ধনশীল অবস্থায় বৃষ্টির অসদ্ভাব হইলে জুয়ার গাছ গুলি ছোট ও হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে। এরূপ নিস্তেজ ক্ষুদ্রাকারের জুয়ার খাইয়া গবাদি জন্তু অনেক সময় মরিয়া যায়। জুয়ার গাছ জন্তুদের খাইতে দিবার সময় এই বিষয়টি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সিমুল-আলু।—এই ফসলটীও অতি সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারা জন্মিয়া থাকে। সিমুল-আলুর গাছ কলম হইতে জন্মে। কলম গুলি ৩ হাত অন্তর লাগাইতে হয়। সকল ঋতুতেই কলম হইতে গাছ জন্মাইতে পারা যায়, কিন্তু ফাল্গুন মাসই কলম লাগাইবার প্রকৃষ্ট সময়। ভাল করিয়া জমিতে চাষ দিয়া, জমি হইতে জল যাহাতে বাহির হইয়া যায় এমন ব্যবস্থা করিয়া, কলম লাগাইয়া দিতে হয়। গাছগুলি দুই হাতের অধিক উচ্চ হইতে দিতে নাই। গাছ অধিক উচ্চ হইয়া গেলে মূলের পরিমাণ কম হয়। মধ্যে মধ্যে ডগা ভাঙ্গিয়া দিলেই গাছগুলির ঝাড় বাঁধিয়া যাইবে ও উহারা খর্ব্বাকার থাকিয়া যাইবে। পৌষ বা মাঘ মাসে মাটি খুঁড়িয়া মূল গুলি বাহির করিয়া লইয়া, ময়দা ও এরারুট প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে মূল গুলি সমস্ত রাত্রি জলে ফেলিয়া রাখিয়া পরদিবস উহার উপরিভাগস্থ মোটা ছাল ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। জলে ভিজাইবার পরে ছাল কাটিয়া শাঁস বা শ্বেত শস্য সহজেই বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। এই শাঁস কাঁচা অবস্থাতেও আহার করা যায়। ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পরিষ্কার জলে এক ঘণ্টা ফেলিয়া, রাখিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া উহা হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া, পরে ঐ মণ্ড কাপড়ে রাখিয়া পরিষ্কার গামলার জলে নাড়িয়া-চাড়িয়া উহার শ্বেত-সার ভাগটী বাহির করিয়া লইতে হয়। ভুট্টার মণ্ড হইতে ঠিক্ যেরূপ ভাবে শ্বেত-সার

বা পালো বাহির করিতে হয়, সিমুল-আলুর মণ্ড হইতেও সেই ভাবেই শ্বেত-সার বা এরারুট্ বাহির করিতে পারা যায়। সিটেটা গরুকে খাইতে না দিয়া, শুকাইবার পরে, উহা যাঁতায় পিষিয়া, চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া উহা হইতে ময়দা প্রস্তুত করা যায়। সিমুল-আলুর পালো বিলাতে "এরারুট" বলিয়া ব্যবহার হয়। সিমুল-আলুর ময়দা গমের ময়দার সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করা উচিত।

চুব্ড়ি-আলু।—বঙ্গ-দেশে যে চুব্ড়ি আলু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উহা খাইতে সুস্বাদু নহে; কিন্তু চুব্ড়ি-আলু জাতীয় কয়েক প্রকার মূল বিলাতি আলুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটী আফ্রিকা দেশীয় চুব্ড়ি আলু, আর একটীর নাম দেবীর-আশান-আলু। হাতির-পায়া চুবড়ি আলু ও খাইতে উত্তম।

আফ্রিকা দেশীয় চুব্ড়ি-আলু বা কাফ্রি আলু শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া জন্মিতেছে; ওটাহিটী-আলু আলিপুর জেলে, শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থানে উত্তম জন্মিতেছে। এই সকল জাতীয় চুব্ড়ি-আলু বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রে লাগাইয়া, জল নির্গমনের পথ করিয়া দিয়া, পৌষ কিম্বা মাঘ মাসে খুঁড়িয়া উঠাইতে হয়। কাফ্রি-আলু দেখিতে চুব্ড়ি আলুর মত হইলেও খাইতে ঠিক্ বিলাতি আলুর ন্যায়।

ওল্।—ওল্ ও সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি দ্বারাই জন্মিয়া থাকে। বোল্পুর, সাঁতরাগাছি ও গেঁয়োখালির ওলে মুখ লাগে না, এজন্য এই তিনটী স্থানের একটী স্থান হইতে বীজ বা মুখী আহরণ করিয়া আনিয়া, মাঘ-ফাল্গুন মাসে অথবা চৈত্র-বৈশাখ মাসে ইহা লাগাইতে হয়। মাঘ ফাল্গুনে বীজ বা মুখী লাগাইতে পারিলে ভাদ্র মাসেই

ওল্ উঠাইতে পারা যায়, এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে বীজ লাগাইতে পারিলে পৌষ মাসে ওল্ উঠান চলে।

আফ্রিকা দেশীয় চুবড়ি-আলু এবং ওল্ অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিতে পারা যায়, গোল-আলুর ন্যায় পচিয়া যায় না।

জেরুসালেম্ আর্টিচোক্।—কি বর্ষাতে কি শীতে, দুই ঋতুতেই এই ফসলটী জন্মাইতে পারা যায়। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির দ্বারা ইহার ক্ষতি হয় না, কিন্তু ইহার গোড়ায় জল দাঁড়াইলে চলিবে না। বিলাতি ফসলের মধ্যে এরূপ সুস্বাদ মূল-যুক্ত সকল ঋতুর উপযোগী আর কোন ফসল নাই। উত্তমরূপে সার ও চাষ দিয়া, চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার মুখীগুলি দেড় হাত অন্তর লাগাইয়া দিলে, বর্ষাকালে গাছগুলি সতেজে বাড়িয়া যায়। আষাঢ় মাসে গাছগুলির গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিয়া, দাঁড়া ও জুলি বাঁধিয়া জল নিষ্ক্রমণের পথ করিয়া দিতে হয়। গাছগুলি দেখিতে পাট গাছের বা কৃষ্ণ-কলী ফুলের গাছের মত। পাতাগুলি পাট গাছের পাতা অপেক্ষা কিছু চওড়া ও পুরু। ফুলগুলি কতকটা গাঁদা ফুলের ন্যায় দেখিতে। অগ্রহায়ণ মাসে গাছগুলি শুকাইতে আরম্ভ করিলে উহাদিগকে উৎপাটন করিয়া উহাদিগের গোড়ার মূল বাহির করিয়া লইতে হয়। বড় বড় মূলগুলি আহারের জন্য রাখিয়া, মুখীগুলি অন্য জমিতে পূর্ব্ববর্ণিত প্রথায় পুনরায় লাগাইয়া দিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসে লাগান মুখী হইতে যে গাছ বাহির হইবে উহাকে জল-সেচন দ্বারা বাঁচাইয়া বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। দুই তিন বার জল সেচন ও একবার গোড়ায় মাটি চাপাইয়া দেওয়া শীতকালের কার্য্য। চৈত্র মাসে গাছগুলি শুকাইয়া গেলে উহাদের উৎপাটন করিয়া গোড়ার মূলগুলি পুনরায় বাছিয়া পৃথক করিতে হয়। বড় মূলগুলি

আহারের জন্য ব্যবহার এবং ছোট মূল বা মুখীগুলি ঐ মাসেই অন্য জমিতে লাগান আবশ্যক। এইরূপ বৎসরে দুইবার করিয়া এই উৎকৃষ্ট তরকারী আহরণ করিতে পারা যায়। জেরুসালেম আর্টিচোকের ডান্‌লা বা অন্য কোন তরকারি প্রস্তুত করিয়া খাইলে মনে হয় এমন উপাদেয় সামগ্রী অতি অল্পই আহার করিয়াছি। এই ফসলটী লাউ, বেগুন বা সীমের ন্যায় দেশময় প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ফাপর বা রাজ-গীর।—ইংরাজীতে এই ফসলটীকে বাক্‌-হুইট্‌ বা হরিণ-গোধুম কহে। ইহার বীজ পেষণ করিয়া যে ময়দা হয় উহা গোধুমের ময়দার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায় বলিয়া ইংলণ্ডে হুইট্‌ বা গোধুম নামে ইহা পরিচিত। বস্তুতঃ ফাপর গাছ আর গোধুম গাছ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় গাছ। ফাপর গাছের পাতা ছোট ছোট ও চাকা চাকা, গোধুমের পাতা ঘাসের পাতার ন্যায়। ফাপর গাছ কিছু লতানে হয়, ঠিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। ইহার বীজগুলি আকারে কতকটা গমের ন্যায় বটে, কিন্তু মেস্তা বা মেস্তা-পাটের বীজের ন্যায় এ বীজ পল্‌-তোলা বা কোণ-বিশিষ্ট। নিতান্ত নীরস ও প্রস্তরময় ভূমিতে এই ফসলটী জন্মে বলিয়া ছোট নাগপুর অঞ্চলে এবং পর্ব্বতময় ভূভাগে ইহার চাষ করা ভাল। ইহার শাকও মানুষে খাইয়া থাকে এবং শস্য পাকিয়া গেলে, শুষ্ক ডাঁটা ও পাতা বিচালির পরিবর্ত্তে গোরুকে খাইতে দেওয়া চলে। ইহার বীজ সমস্ত এককালে পাকিয়া যায় না। বীজ ছড়াইবার দুইমাস পরেই বীজ পাকিতে আরম্ভ হয় এবং চারি মাস পর্য্যন্ত ফসল জমিতে রাখিতে পারা যায়, তবে যখন অধিকাংশ ফল পাকিয়া যায় তখনই অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যেই, ফসলটী কাটা উচিত।

ইহাতে বীজও অধিক পাওয়া যায় এবং গাছগুলি এই সময়ে কিছু কাঁচা অবস্থায় থাকাতে, উহা গবাদি জন্তুর পক্ষে আরও উপাদেয় বোধ হয়। কিছু কাঁচা অবস্থায় লতাগুলি কাটিবার পরে যদি বৃষ্টি হয় তাহাতেও কিছু ক্ষতি হয় না, বরং এ সময়ে বৃষ্টিপাত হইলে কাঁচা ফলগুলি পরে ভাল করিয়া পাকিয়া শুষ্ক হয়। পর্ব্বতময় ভূভাগে ইহা চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে লাগান হয়। বঙ্গদেশের নিম্ন ভূমিতে ফাপর লাগাইতে হইলে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বীজ বপন করাই কর্ত্তব্য। কর্দ্দমময় উর্ব্বর জমিতে এ ফসল ভাল জন্মে না, এবং নীরস প্রস্তরময় ভূভাগ ভিন্ন অন্যত্রে এ ফসল লাগাইয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই। বিঘাপ্রতি আট দশ সের বীজ বপন করিলে পর্ব্বতময় স্থানে পাঁচ ছয় মন শস্য উৎপন্ন হয়। চারিসের ফাপরের ছাতু ছয় সের যবের ছাতুর সমান পুষ্টিকর। পক্ষীজাতির পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। এই শস্য আহার করিলে পক্ষীগণ অধিক পরিমাণে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। তিন মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায়, সামান্য বৃষ্টিতেও উত্তম জন্মে, নিকৃষ্ট জমিতে ভাল জন্মে, কি শীত কি গ্রীষ্ম উভয় কালেই সমান জন্মে, ফাপরের এই সকল বিশেষ গুণ আছে। দুর্ভিক্ষের সময় নিকৃষ্ট ভূমিতে এই ফসল অধিক পরিমাণে জন্মান কর্ত্তব্য, কেননা দুর্ভিক্ষ থাকিতে থাকিতেই ইহা লাগান ও উঠান যাইতে পারে। দুইটী প্রধান ফসলের মাঝে এই ফসলটী লওয়া চলে বলিয়া ইহাকে "আল্‌টপ্‌কা ফসল" বলা যাইতে পারে। কুটি বঙ্গদেশের একটী প্রধান "আল্‌টপ্‌কা ফসল"।

চীনার-বাদাম।—বালুকাময় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরময় জমিতে এই ফসল উত্তম জন্মে। ইহা একবার জমিতে লাগাইয়া দিলে, এককালীন জঙ্গলের মত চিরকালের ন্যায় ঐ জমি অধিকার করিয়া

ফেলে। বৈশাখে, কার্ত্তিকে এবং ফাল্গুনে, এই তিন মাসে বীজ লাগান চলে। বস্তুতঃ বর্ষার দুই তিনমাস ভিন্ন যে সে সময়ে চীনা-বাদামের বীজ বপন করা চলিতে পারে। কর্দ্দমময় জমিতে গাছ জঙ্গলের মত সতেজে বাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু ফলের পরিমাণ নিতান্ত কম হয়। গোরুর আহারের জন্য চীনাবাদামের গাছ যে সে জমিতে লাগান যাইতে পারে, কিন্তু ফলের জন্য লাগাইতে হইলে বালুকাময় জমিই নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ফলগুলি মাটির মধ্যে আলু যেরূপ ভাবে জন্মে ঐরূপে জন্মে। বিঘাপ্রতি সাত সের বীজ অর্দ্ধ হাত অন্তর এক একটী করিয়া কর্ষিত ভূমিতে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। গাছগুলি অর্দ্ধ হাত উচ্চ হইয়া গেলে ভুটার গাছের নীচে যেমন কোদাল দিয়া মাটি চাপাইয়া দিবার নিয়ম আছে চীনাবাদামের জন্য এই পাইটটা আবশ্যক। বালুকাময় ভূমিতে বিঘাপ্রতি ১০।১২ মণ ফল উৎপন্ন হয়। চীনাবাদামে জল সেচন আবশ্যক করে না। ফল উঠাইয়া লইবার পরে আপনা হইতেই জমি আবার গাছে পূর্ণ হইয়া যায়। তবে ক্রমাগত একই জমিতে এক ফসল অনেককাল ধরিয়া রাখা ভাল নহে। দুই তিন বৎসর অন্তর জমি পরিবর্ত্তন করিয়া চীনাবাদাম লাগান উচিত। চীনাবাদামের ছাড়ান ফলের শতকরা ওজনের চল্লিশ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল অতি সুস্বাদু এবং রন্ধন কার্য্যে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তৈল বাহির করিয়া লইয়া যে খোল ভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা গোরুর ও মানুষের খাদ্য। যেমন তিলের খোলভাগ হইতে তিল-কুটো সন্দেশ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ চীনাবাদামের খোলভাগ হইতে অতি উপাদেয় নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিক তৈল থাকিবার কারণ চীনাবাদাম খাইলে উদরাময় পীড়া

হইয়া থাকে, কিন্তু তৈলভাগ বাহির করিয়া দিয়া যে খোলভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা রন্ধন করিয়া খাইলে কোন পীড়া হয় না। বস্তুতঃ চীনাবাদামের খোল অতি পুষ্টিকর খাদ্য এবং মান্দ্রাজ-প্রদেশে যখন ইহা মানুষের উপাদেয় খাদ্য বলিয়া প্রচলিত আছে, তখন বঙ্গদেশেও চেষ্টা করিলে এ খাদ্য বড়ির পরিবর্ত্তে প্রচলিত হইয়া যাইতে পারে। চীনাবাদাম ও চীনাবাদামের তৈল ফ্রান্সদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

অনাবৃষ্টি বশতঃ দেশের সকল ফসলই যে নষ্ট হইয়া যায় এরূপ নহে। আমন ধান্য এককালীন মারা গেলেও আশু-ধান্য অল্প বিস্তর জন্মিয়া থাকে। সকল প্রকার আশু-ধান্য নিকৃষ্ট ধান্য নহে। শিবপুর কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে পঞ্জাব প্রদেশ হইতে আনীত সোয়াতি-ধান্য এবং মধ্য প্রদেশ হইতে আনীত নাগপুরী ধান্য হইতে অতি সুখাদ্য চাউল উৎপন্ন হয়, অথচ এই দুই জাতীয় ধান্য তিন মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায়। যদি ভাদ্র মাসেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলেও এই দুই জাতীয় ধান্যের কিছুই ক্ষতি হয় না। এই দুই জাতীয় ধান্যের দোকাট্ বীজ হইতে অধিকতর অনাবৃষ্টিসহ ও প্রচুর-তর ফলোৎপাদক গাছ জন্মে। উপরি উক্ত কয়েকটী ফসল ভিন্ন আরও অনেকগুলির নাম করিতে পারা যায়, যেগুলি অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারাও উত্তম জন্মিয়া থাকে। এই সকল ফসলের উপর দরিদ্র ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষের সময় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাদা ও রাঙ্গা আলু, ডুম্বুর, ফুটি ও কাঁকুড়, পটল, সজ্না, অড়হর, কলাই, চীনা, বাজ্রা, ইত্যাদি। কোন্ বৎসর অল্প বৃষ্টি হইবে কে বলিতে পারে? প্রত্যেক বৎসরেই কৃষকদের কর্ত্তব্য, এই অধ্যায়ে উক্ত অনাবৃষ্টিসহ ফসলগুলির মধ্যে কয়েকটি জন্মান। কেবল আমন ধান্যের উপর

নির্ভর করিলে পাছে কৃষক সমূলে নিধন প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্যই এই উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। গাছের নিম্নে জল দাঁড়াইলে ধান ভিন্ন প্রায় সকল গাছেরই ক্ষতি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু গাছের নিম্নে যাহাতে জল না দাঁড়ায় তাহার উপায়ও করা যাইতে পারে। একটি উপায় জমিতে সারিসারি দাঁড়া বাঁধিয়া দিয়া দাঁড়ার উপর বীজ বা কলম লাগান। দাঁড়ার নিম্নে অর্থাৎ জুলির মধ্যে জল দাঁড়াইলেও দাঁড়ার উপরিস্থ গাছের ক্ষতি হয় না। জমিতে দাঁড়া বাঁধিয়া লইতে পারিলে বর্ষাকালেও কলাই, বর্ব্বটী, চীনারবাদাম, ইত্যাদি ফসলের বীজ বপন করা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন।

(১) অনাবৃষ্টি বশতঃ অগ্রহায়ণী ধান্য মারা যাইলেও কোন্ কোন্ ফসল অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে?

(২) ভুট্টার পালো প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণনা কর। পালো প্রস্তুত করিয়া যে সিটেটা পড়িয়া থাকে উহা কিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে?

(৩) ভুট্টার চাষ বর্ণনা কর।

(৪) ভুট্টার ডাঁটা কি কি কার্য্যে আসিতে পারে?

(৫) এক বিঘা জমিতে কত ভুট্টার দানা ও কত ডাঁটা জন্মান সম্ভব?

(৬) জুয়ার চাষের প্রণালী বর্ণনা কর। ঘাসের জন্য যে জুয়ার লাগান যায় তাহারই বা কত বীজ ব্যবহার করিতে হয় এবং দানার জন্য যে জুয়ার লাগান হয় তাহারই বা কত বীজ ব্যবহার করিতে হয়?

(৭) জুয়ারের ফসল বিঘাপ্রতি কত হওয়া সম্ভব? বীজ বা

দানা সংগ্রহ করিতে হইলে ঘাসের পরিমাণ বা গুণ সম্বন্ধে কিরূপ তারতম্য হইয়া থাকে ?

(৮) এক শত বিঘা জুয়ার লাগাইয়া কয়টি গো-পালন করিতে পারা যায় তাহার একটী হিসাব দাও।

(৯) জুয়ার খাওয়াইলে গোরুর কোন ক্ষতি হওয়া সম্ভব কি না ?

(১০) সিমুল-আলুর চাষ বর্ণনা কর।

(১১) সিমুল-আলু হইতে কিরূপে এরারুট ও ময়দা প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া যাও।

(১২) সিমুল-আলু গাছের চাষ সম্বন্ধে কোন্ বিশেষ নিয়মটী পালন দ্বারা মূলের সবিশেষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ?

(১৩) চুব্‌ড়ি-আলু লাগাইতে হইলে কোন্ কোন্ জাতি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য ?

(১৪) চুব্‌ড়ি-আলু ও ওটাহিটি আলুর চাষ বর্ণনা কর।

(১৫) কোন্ কোন্ স্থানের ওল্ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ? ওল্ কোন্ কোন্ সময়ে লাগাইতে পারা যায় এবং কোন্ কোন্ সময়ে উঠাইতে পারা যায় ? যখন আলু লাগান যাইতে পারে তখন ওল্ লাগানতে ফল কি ?

(১৬) জেরুসালেম আর্টিচোক্‌এর চাষ বর্ণনা কর।

(১৭) ফাপর কিরূপ ফসল ? ইহা লাগাইয়া ফল কি ?

(১৮) চীনারবাদাম কিরূপে চাষ করিতে হয় ? কিরূপ জমিতে এই ফসল লাগান উচিত ?

(১৯) বিঘাপ্রতি কি পরিমাণে চীনাবাদাম হওয়া সম্ভব ? চীনাবাদাম হইতে কি পরিমাণ তৈল নির্গত হয় ? ইহার খোল বা সিটেটী কি ব্যবহারে আনা যাইতে পারে ?

(২০) নিম্ন জমিতে এই সকল ফসল জন্মাইতে হইলে কিরূপ প্রকরণে জমি প্রস্তুত আবশ্যক?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জল-সেচন।

বৃষ্টির অভাবেই যখন ফসলের অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে, তখন বৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা ভ্রম। জল-সেচনের কিছু উপায় সকল কৃষকেরই থাকা বিশেষ আবশ্যক।

জলের উৎপত্তি।—জল-সেচনের উপায় স্থির করিতে হইলে প্রথমে দেখা আবশ্যক চৈত্র-বৈশাখ মাসে কূপের মধ্যে মাটির কতদূর নিম্নে জল পাওয়া যাইতে পারে। সকল স্থানেই যে কূপের উপর নির্ভর করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কোথাও তটিনী, কোথাও কাটা-খাল, কোথাও পুষ্করিণী, কোথাও বা বিল, কোথাও বা গিরি-নির্ঝর, জলের উৎপত্তি স্থান। জলাগমের উৎপত্তিস্থান এবং গভীরতা বুঝিয়া জল-সেচনের উপায় নির্ণয় করিতে হয়। প্রধানতঃ, গভীরতা নিরূপণই উপায় নির্দ্দেশের পন্থা।

চারি হাত পর্য্যন্ত গভীর জলাশয় হইতে "ডোঙ্গা" বা "দোন্" দ্বারা জল উঠান উচিত। পল্লিগ্রামের অনেক সূত্র-ধর গাছের গুঁড়ি হইতে ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এক্ষণে কোন কোন লোহার কারখানায় লোহার ডোঙ্গা নির্ম্মিত হইয়া

থাকে। লুপ-লাইনের ঘুস্‌করা ষ্টেশনের অনতিদূরে শ্রীতারাপ্রসন্ন চাকৃদারের নিকট লৌহ নির্ম্মিত দোন কিনিতে পাওয়া যায়। এইগুলি ৭ ৮ হাত লম্বা এক ফুট্ চওড়া, ও এক ফুট্ গভীর হইয়া থাকে। ইহার মূল্য দৈর্ঘ্য অনুসারে ১।০ (পাঁচসিকি) করিয়া হাত। যে দিক্ জলের মধ্যে পাতিত করা হয়, ঐ দিক্ বক্র ও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্মভাগের সহিত একটী কড়ার সহযোগে রজ্জু, বা শৃঙ্খল দ্বারা একটী বাঁশ বা লৌহ-দণ্ড সংযুক্ত থাকে। এই বাঁশ বা লৌহ-দণ্ড হাড়-কাঠের ন্যায় একখণ্ড স্থূলকাষ্ঠের উপর স্থাপিত থাকাতে ডোঙ্গাটী উপর-নীচ হইয়া খেলিতে পারে। এই স্থূল কাষ্ঠ-খণ্ড জলাশয়ের পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে প্রোথিত করিয়া ডোঙ্গার প্রশস্ত অন্তভাগটী উহারই পার্শ্বে স্থাপিত করিয়া, উক্ত বংশ বা লৌহ-দণ্ডের অসংলগ্ন অন্ত-ভাগটীর সহিত কয়েকটী ভারী সামগ্রী বাঁধিয়া দিয়া দেখিতে হয় জল-পূর্ণ ডোঙ্গা সহজে উঠাইতে পারা যাইতেছে

১০ম চিত্র। ডোঙ্গা বা দোন

কি না। দণ্ডের অসংলগ্ন অন্ত-ভাগ অত্যধিক ভারী হইলে উহা নামাইতে কষ্ট হয়, এবং নিতান্ত লঘু হইলে জল-পূর্ণ ডোঙ্গা উঠাইতে কষ্ট হয়। এ কারণ, অবস্থা বুঝিয়া দণ্ড স্থূল কাষ্ঠ-খণ্ডের উপর অগ্র-পশ্চাৎ করিয়া বসাইয়া, উহার অসংলগ্ন অন্ত-ভাগটীতে ভার চড়াইতে হয়। দোন একজন মাত্র লোকে চালাইয়া থাকে। স্থান বিশেষে বাঁশের বা কাঠের ভারার ন্যায় একটী দাঁড়াইবার স্থান জলের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। এই ভারার উপর দাঁড়াইয়া দণ্ডের রজ্জু বা শৃঙ্খল সংলগ্ন অন্তভাগের উপর হাত দিয়া উহা নমিত করিয়া, দোনের সূক্ষ্মভাগের উপর এক পা দিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে আরও নমিত করিয়া জলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, দোনের উপর রক্ষিত হস্ত সরাইয়া লইলেই দণ্ডের অসংলগ্ন অন্তস্থিত ভারের সাহায্যে অতি অল্প আয়াসেই জল-পূর্ণ দোনটী উঠাইতে পারা যায়। দোনের প্রশস্ত অন্তদিয়া জল নিষ্ক্রমণ হইয়া চলিয়া গেলে, দোনটী পুনরায় পূর্ব্ব কথিত উপায়ে নমিত করিতে হয়। এইরূপে একজন লোক মিনিটে দশবার করিয়া অনায়াসে দোন দ্বারা প্রত্যেক বারে তিন ঘন-ফুট্ জল উঠাইতে পারে। এই হিসাবে ঘণ্টায় ১৮০০ ঘন-ফুট, এবং সমস্ত দিবসে, অর্থাৎ ৮ ঘণ্টায়, ১৪,৪০০ ঘন-ফুট জল উঠে। এই জল রাশির শতকরা ন্যূনাধিক দশভাগ মাত্র জল নষ্ট হয়; অর্থাৎ প্রত্যহ প্রায় ১৩,০০০ ঘন-ফুট জল জমিতে সেচণার্থে লব্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঘন-ফুট জল ৬৩/১০ গ্যালন হইলে, ১৩,০০০ ঘন-ফুট জলের পরিমাণ ৮১,৯০০ গ্যালন। একবিঘা জমি একবার জল-সেচন করিতে গেলে ন্যূনাধিক ২৭,০০০ গ্যালন জল আবশ্যক করে, এ কারণ ৮১,৯০০ গ্যালন জল দ্বারা তিন বিঘারও উপর জমিসেচন করা চলে।

বালি মাটিতে ইহার দ্বিগুন জল আবশ্যক করে, এবং নিতান্ত আঁঠিয়াল মাটিতে এত জল আবশ্যক করে না। দো-আঁশ মাটি হইলে দোন দ্বারা প্রত্যহ তিনবিঘা জমি * সেচন করা যায়।

টাবুট্।—মিসর দেশে টাবুট নামে একপ্রকার যন্ত্র ৪.৫ হাতের অনতি-গভীর জলাশয় হইতে জল তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা বলদ দ্বারা চালিত। চক্রের প্রশস্ত বেড়টীর ভিতর জল ভরিবার উপায় আছে। এই চক্র বলদ দ্বারা চালিত হয়। চিত্র দেখিলেই ইহার গঠন কৌশল বুঝা যাইবে।
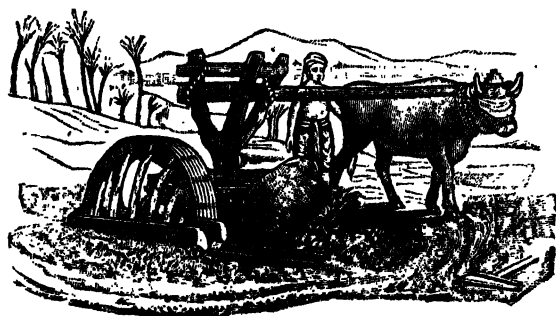
১১শ চিত্র। মিশর দেশের টাবুট্।

* ৩১/২ বিঘায় এক একার হয়। ৮০ হাত লম্বা ও ৮০ হাত প্রশস্ত জমি একবিঘা জমি; কিন্তু সকল স্থানে বিঘার পরিমাণ সমান নহে বলিয়া একার হিসাবে জমির পরিমাণ জানাও আবশ্যক।

৮ হাত বা ১২ হাত গভীর জলাশয় হইতে জল উঠাইতে হইলে উপর্য্যুপরি দুই বা তিন খানি দোন্ বসাইয়া জল উঠাইতে পারা যায়। কানপুর কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ডবল দোন বা
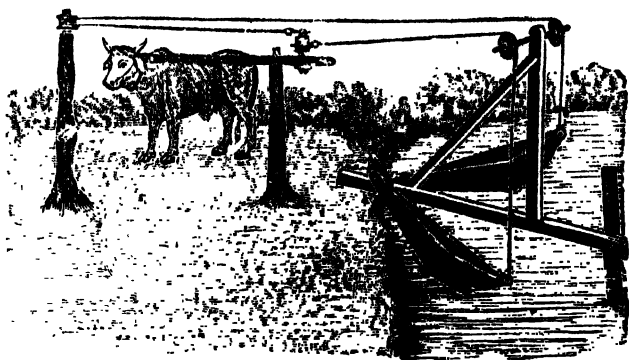
১২শ চিত্র। বালদেব বালতি।

"বালদেব বালতি" নামক জল তুলিবার কল প্রস্তুত হয়। ইহা বলদ দ্বারা চালাইতে হয়। চিত্র দেখিলেই ইহার গঠন প্রণালী বুঝা যাইবে। ইহা দুইখানি দোন্ যুক্ত। দোন দুইখানির তলে জল প্রবেশ করিবার কবাট আছে। এজন্য পা দিয়া ইহাদের নামাইতে হয় না। একখানি দোন উঠে ও অপর খানি নামে। এইরূপে ক্রমাগত জল উঠিয়া বালি মাটির জমি প্রত্যহ এক একার এই কলদ্বারা জল-সেচন হইতে পারে।

৭।৮ হাত গভীর নালা বা পুষ্করিণী হইতে জল উঠাইতে হইলে, সেউনী' ব্যবহার করা ভাল। সেউনী বাঁশের চেটাইয়ের ঠোঙ্গার বা
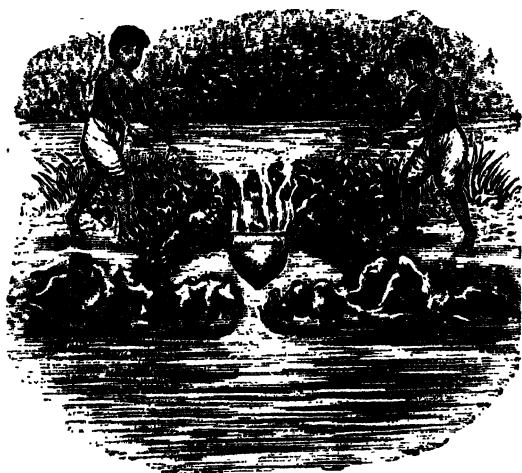
১৩শ চিত্র। সেচনী বা সেউনী।

টোকার মত একটী যন্ত্র বা আধার। ইহার মূল্য অতি সামান্য, অর্থাৎ দুই এক আনা মাত্র। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া দড়ি বাঁধিয়া, দুইজন লোক দুইদিক্ হইতে জলের মধ্যে ডুবাইয়া অমনই যতদূর উপরদিকে হাত যায় ততদূর উপরদিকে জলপূর্ণ সেউনীটী উত্তোলন করিয়া জমির উপরে উত্তোলিত জল ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। এক একবারে ন্যূনাধিক ⅓ ঘন-ফুট জল উঠিয়া থাকে, এবং প্রত্যেক মিনিটে ২০ বার করিয়া সেউনী উঠাইতে পারা যায়। হিসাব করিলে দেখা যাইবে সেউনী দ্বারা ঘণ্টায় ৪০০ ঘন-ফুট জল তুলিতে পারা যায়। এই জলরাশির শতকরা যদি ২৫ ভাগ অপচয় হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে ঘণ্টায় ৩০০ ঘন-ফুট, অথবা ১৮৯০ গ্যালন্ জল, জমিতে সেচনার্থ-লব্ধ হইয়া থাকে। দোন্ দ্বারা ঘণ্টায় ১০,০০০

গ্যালনেরও অধিক জল উঠিয়া থাকে, অর্থাৎ, সেউনী দ্বারা দোনের ⅙ ভাগ মাত্র কার্য্য হইয়া থাকে। দোনের দ্বারা যদি প্রত্যহ ৩ বিঘা জমি সেচন করা যায়, তাহা হইলে সেউনী দ্বারা অর্দ্ধ বিঘা মাত্র সেচন করা চলে। দোন চালাইতে একজন মাত্র লোক আবশ্যক হয়, কিন্তু সেউনী চালাইতে দুইজন লোকের আবশ্যক। সেউনী চালাইতে চালাইতে শীঘ্রই বাহু ভারিয়া যায়, এ কারণ অন্ততঃ আর একজন লোক অপর দুইজনের সাহায্যার্থে আবশ্যক। তবে শ্রান্ত ব্যক্তি বসিয়া না থাকিয়া জমিতে জল চালাইয়া দিতে পারে। দোন ব্যবহার করিতে হইলেও জল চালাইয়া দিবার জন্য একজন ব্যক্তির আবশ্যক। ক্ষিপ্র-হস্তে সেউনী চালাইয়া অভ্যস্ত শ্রমজীবী সেউনী দ্বারা ৮ হাত পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে জল উঠাইতে পারে। দোন দ্বারা ৪ হাত মাত্র ঊর্দ্ধে জল উঠান সম্ভব। বালদেব বাল্‌তি দ্বারা ৩ হাতের ঊর্দ্ধ জল উঠে না। একজনে চালাইতে পারে এরূপ জল-সেচনীকে
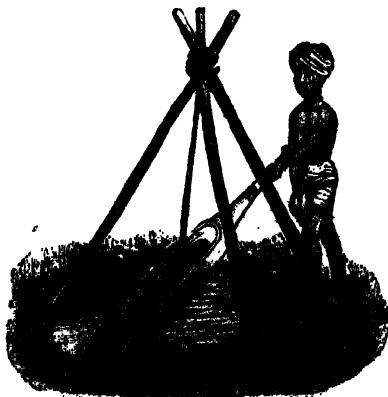
১৪শ চিত্র। জল সেচন হাতা।

হাতা কহে। ইহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র। নৌকার মধ্য হইতে জল ফেলিয়া

দিবার জন্যও এইরূপ যন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। দোন বা সেউনী দ্বারা উত্তোলিত জল যে স্থলে পতিত হইয়া ক্রমশঃ গড়াইয়া মাঠে চলিয়া যায় সেই স্থলটীর মাটি খড়, পাতা, ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক নতুবা মাটি ধসিয়া গিয়া জল অপচয় হয় এবং আর আর অনিষ্টও ঘটে।

১০।১২ হাত গভীর কূপ বা নালা হইতে জল উঠাইবার একটী সহজ উপায় "তেড়া" বা "লাঠা"র ব্যবহার। লোহার ডোল্ বা চাম্ড়ার বাল্তি দ্বারা তেড়া-কলের সাহায্যে জল উঠাইতে হয়। এই বাল্তি বা ডোলে ন্যূন্যধিক অর্দ্ধ ঘন-ফুট জল ধরে। মিনিটে

১৭৫ চিত্র। মিসর দেশীয় শাডুফ্।

তিন বাল্‌তি বা ডোল্‌ জল উঠাইতে পারা যায়। হিসাব করিলে দেখা যাইবে তেড়া-কল দ্বারা ঘণ্টায় ৮১ ঘন-ফুট বা ৫০০ গ্যালন জল উঠে, অর্থাৎ সেউনীর চারিভাগের একভাগ মাত্র। কূপের পার্শ্বে তাল গাছের অথবা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ জাতীয় গাছের কাষ্ঠ প্রোথিত করিয়া উহার উপর হাড়-কাঠের ন্যায় কোটর ও খিল লাগাইয়া একটী বাঁশ স্থাপিত করিয়া, এই বাঁশের স্থূলভাগে কোন ভারি সামগ্রী সংযুক্ত করিয়া, এবং সূক্ষ্মভাগে রজ্জুদ্বারা ডোল্‌ বা বাল্‌তি বাঁধিয়া, তেড়া-কল প্রস্তুত করিতে হয়। মিশর দেশে তেড়া বা শাডুক্‌-যন্ত্র শ্রেণীবদ্ধ করিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিন থাক্‌ করিয়া ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে। এই নিয়মে জলোত্তলন করিয়া নিম্নবর্ত্তী জলাশয় হইতেও ফসলে জল দেওয়া চলে।

পঁচিশ, ত্রিশ হাত বা ততোধিক নিম্নে জল থাকিলে, মোট্‌ অথবা ঘট-চক্র ব্যবহার করা উচিত। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারত-বর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রেই মোটের ব্যবহার আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মোট্‌ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের মোট শ্রেষ্ঠ, কেন না দাক্ষিণাত্যের মোটের ডোলের নিম্নে শুণ্ড থাকে। ডোল্‌টী উপরে উঠিয়া গেলে শুণ্ডটী প্রলম্বিত ভাবে নিম্নমুখী থাকিবার কারণ আপনা হইতেই ডোলের জল এই শুণ্ড দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়ে। আবার ডোল্‌টী কূপের মধ্যে নামিয়া গেলে, শুণ্ডের মুখ ডোল্‌টী বেড়িয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া থাকিবার কারণ ডোলের নিম্ন ভাগ দিয়া জল বাহির হইতে পারে না। একটী রজ্জু দ্বারা উপরিস্থিত কপি-কলের উপর নির্ভর করিয়া ডোল্‌টী উঠে বা নামে; আর একটী রজ্জু দ্বারা শুণ্ডের মুখ আট্‌কান থাকে। রজ্জু নিম্নস্থিত কপিকলের নিম্ন দিয়া চালিত হইয়া অপর রজ্জুর সহিত মিলিত

হইবার কারণ, মিলিত রজ্জু সংলগ্ন বলদ ক্রম নিম্ন বর্ত্মে উঠিতে বা নামিতে থাকিলে, উভয় রজ্জুই কূপের মধ্যে নামিতে বা উঠিতে থাকে। ডোলের মুখে সংলগ্ন রজ্জুটী উপরিস্থিত কপি-কল পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবার কারণ, নিম্নের শুণ্ডটী প্রলম্বিত হইয়া জল নিক্রমণের পথ করিয়া দেয় এবং ডোল হইতে জল বাহির করিয়া লইবার জন্য কূপের উপর একজন লোকের আবশ্যক করে না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মোটে জল নিক্রমণের এই সহজ কৌশলটী না থাকিবার কারণ ডোল হইতে জল বাহির করিয়া লইবার জন্য কূপের উপর একজন লোকের আবশ্যক হয়।

মোট ব্যবহার করিতে গেলে ইন্দারার অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের পাকা কূপের আবশ্যক। এই কূপের পার্শ্বে একটী ক্রম নিম্ন বর্ত্ম প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই বর্ত্মের শীর্ষভাগে একটী পাকা জলাধার থাকা উচিত। ডোলের শুণ্ডটী প্রলম্বিত হইয়া এই জলাধারের অভিমুখী হইলেই ডোল হইতে জল জলাধারের মধ্যে পতিত হইয়া থাকে। জলাধার হইতে কূপের চারি পার্শ্বস্থ ভূমিতে জল চালাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রণালী থাকে। এই সকল প্রণালীর যেটী আবশ্যক সেইটী দ্বারা জল চালাইয়া লইয়া যাইতে পারা যায়। মোট ব্যবহারে প্রথমতঃ কিছু ব্যয় অধিক হয় বটে, কিন্তু একবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিলে মোটের দ্বারা যেরূপ অল্পব্যয়ে গভীর কূপ হইতে অধিক পরিমাণ জল উঠাইতে পারা যায় এরূপ অল্প ব্যয়ে আর কোন উপায় দ্বারা গভীর স্থান হইতে এ পরিমাণ জল উঠাইতে পারা যায় না। মোট ব্যবহার করিতে হইলে দুইটী বলদ আবশ্যক। একজন রক্ষক আবশ্যক। উহার কার্য্য নিতান্ত লঘু; অর্থাৎ, বলদ যেন জল পূর্ণ-ডোল উঠাইবার জন্য নিম্নে চলিয়া যায় এবং জল-শূন্য ডোল কূপের মধ্যে

নামাইবার জন্য যেন উপরে পিছু হাঁটিয়া চলিয়া যায়, এই মাত্র দেখা চালকের কার্য্য। ডোল হইতে শুণ্ড পথে জল আপনা হইতেই জলাধারের পড়িয়া প্রণালী বিশেষ দ্বারা মাঠে চলিয়া যায়। মাঠে জল চালাইয়া দিবার জন্যও এক জন লোকের আবশ্যক। এই লোক ৪।৫ ঘণ্টা চালকের কার্য্য করিয়া, চালককে মাঠে জল চালাইয়া দিবার জন্য এই ৪।৫ ঘণ্টা নিযুক্ত করিতে পারে। ইহাতে উভয় ব্যক্তিরই শ্রম লাঘব হয়। মোটের ডোলে ন্যূনাধিক ৩ ঘন ফুট জল ধরে; ৩০।৪০ হাত গভীর কূপ হইতে জল উঠাইতে গেলে মিনিটে একবার মাত্র এক ডোল্ করিয়া জল উঠিয়া থাকে। মিনিটে ৩ ঘন-ফুট জল উঠিলে ৮ ঘণ্টায় ১৪৪০ ঘন-ফুট বা ৯০৭২ গ্যালন জল উঠে। যদি এই জল রাশির ১০৭২ গ্যালন জল অপচয় হয়, তাহা হইলে সমস্ত দিবসে, ৮০০০ গ্যালন, অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০০০ গ্যালন জল মোটের দ্বারা লব্ধ হইতে
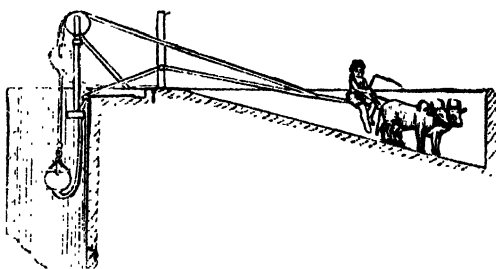
১৬শ চিত্র। একানে মোট।

পারে। যে মোট বর্ণনা করা গেল ইহা একানে মোট। ডবল মোট চালাইতে গেলে আরও বড় ইন্দারা আবশ্যক। একটী ডোল উঠিবে অপরটী নামিবে এই কার্য্য একটী চক্র-গাছের সাহায্যে সাধিত হয়।
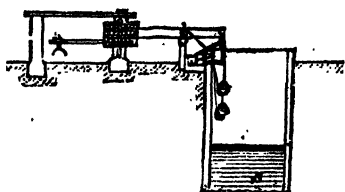
১৭শ চিত্র। ডবল মোট।

এই চক্র-গাছের সহিত বলদের যোক্ত সংযুক্ত থাকিবার কারণ, বলদ একবার এক দিকে উহাকে পাক দিয়া একটী ডোল উঠায়, পরে অপর দিকে পাক দিয়া অপর ডোলটীকে উঠায়।

ঘট-চক্র।—এই যন্ত্র পারস্য, মিশর, আফ্‌গানিস্থান, পঞ্জাব, প্রভৃতি ভূভাগে ব্যবহার হইয়া থাকে। ঘট চক্র নির্ম্মাণার্থ কিছু অধিক কৌশল ও নৈপুণ্য আবশ্যক। কিন্তু পঞ্জাবের লোকে যখন পল্লীগ্রামের সূত্রধারাদি দ্বারা এই কার্য্য করাইয়া লইতে পারে, তখন বঙ্গদেশ প্রভৃতি ভূভাগে ইহার প্রচলন হইবার পক্ষে বিশেষ কিছুই অন্তরায় নাই। এক বা দুই খানি বৃহৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত চক্রের উপর প্রলম্বিত ঘটের, অর্থাৎ ছোট ছোট কলসীর মালা দ্বারা, কূপ, নালা বা অন্য কোন গভীর জলাশয় হইতে জল উঠিয়া থাকে। জলাশয়ের উপর প্রলম্বিত এই চক্র মাঠের মধ্যে স্থাপিত অন্য এক খানি চক্রের সহিত দৃঢ়ভাবে একটী লৌহ শলকার দ্বারা সংলগ্ন থাকাতে, মাঠের উপর চক্র ঘুরাইতে পারিলেই জলাশয়ের উপর চক্রখানি অথবা চক্র দুই খানি ঘুরিতে এবং তৎসঙ্গে জলও উঠিতে থাকে। মাঠের উপরের চাকাখানি ঘুরাইবার জন্য একটী কৌশলও আছে। এই চাকার সহিত আট্‌কাইয়া ঘুরে এইরূপ আর একখানি চাকা মাটির সহিত সমান্তরাল হইয়া স্থাপিত হয়, এবং এই চাকা বলদের সহিত সংলগ্ন হইয়া ঘুরিতে থাকে। এই
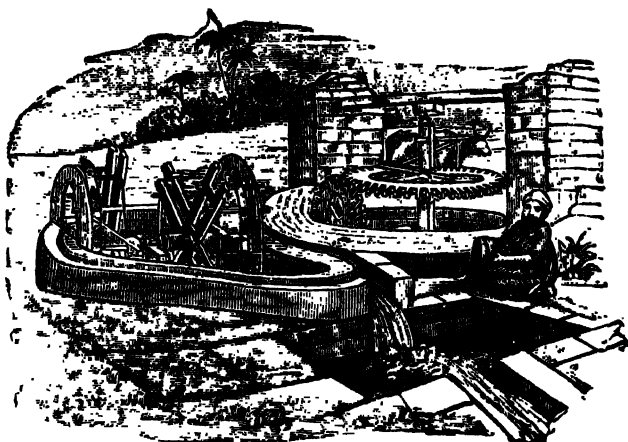
১৮শ চিত্র। পঞ্জাবের ঘটচক্র।

চাকা ঘুরিলেই অন্য দুই বা তিন খানি চাকা ঘুরে ও জল উটে। ডবল ঘট-চক্রের চারি খানি চাকা কিরূপে স্থাপিত এবং ইহাদের গতি কিরূপে বলদের দ্বারা সংসাধিত হয়, তাহা চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে।
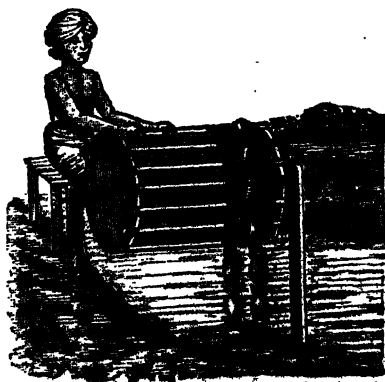
১৯শ চিত্র। মালাবার উপকূলের ঘট-চক্র।

অতি সহজে নির্ম্মিত এক প্রকার ঘট-চক্র ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিত্র দেখিলে ইহারও গঠন বুঝা যাইবে।

খালের জল।—সোননদী, বাঁকানদী, রূপনারায়ণ নদী প্রভৃতি কয়েকটী নদী হইতে খাল কাটিয়া পুল বাঁধিয়া মাঠে বিস্তৃতভাবে জল বিলির সরকারি বন্দোবস্ত আছে। ইহা দ্বারা কৃষকদিগের প্রভূত উপকার হইয়াছে। খালের জলের সহিত দামোদর প্রভৃতি কয়েকটী নদ নদীর পলি-মাটি মাঠে আসিয়া পড়িয়া মাঠের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। নির্ম্মল জল অপেক্ষা পলি মিশ্রিত জলের দ্বারা ফসলের অধিক উপকার দর্শে। এইরূপ জল পাইলে সুবৎসরেও কৃষক খালের জল পাওয়া জমি হইতে বিঘা প্রতি অন্ততঃ চারি পাঁচ টাকার অতিরিক্ত ফসল লাভ করিয়া থাকে। ইহা কেবল পলির সারভাগের মূল্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। অনাবৃষ্টি হইলে খালের জলের উপকারিতার ত কথাই নাই। সার বা জল যত অধিক দেওয়া যায় জমির বা ফসলের পক্ষে ততই অধিক লাভ, কৃষকদের এরূপ মনে করা অন্যায়। অতিরিক্ত জল ও অতিরিক্ত সার দ্বারা অনেক রকম ক্ষতিও হইয়া থাকে। যেখানে খাল আছে সেখানকার কৃষকেরা খাঁই করিয়া বৎসরে দুই বা তিনবার জল পাইয়া, ও প্রত্যেক বারে ৪।৫ ইঞ্চি জল পাইয়া, সন্তুষ্ট না হইয়া, পাঁচ বার জল চাহে ও প্রত্যেক বারে নয় ইঞ্চি করিয়া জল চাহে। নিতান্ত দুর্ব্বৎসরেও কিছু বৃষ্টি হয়, এমন স্থলে ধান্যের জন্য দুই তিন বার খালের জল যোগান দ্বারাই যথেষ্ট উপকার হয়। যে খাল দ্বারা ৫০ বর্গ মাইল জমির উপকার হওয়া সম্ভব সেই খাল দ্বারা অত্যধিক জল খরচ হইলে কেবল ১০ বর্গ মাইলের মাত্র উপকার হইতে পারে। কি

পরিমাণ খালের জল কৃষকদিগের পাওয়া উচিত তাহা একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

এক একার জমিতে একবার সাড়ে চারি ইঞ্চি পরিমাণ জল দিতে হইলে সর্ব্বশুদ্ধ কি পরিমাণ জলের আবশ্যক? এক একার জমি কতটুকু জমি? তিন বিঘার কিছু অধিক। ঠিক্ করিয়া বলিতে হইলে দশ বর্গ চেইন্ অর্থাৎ ৬৬০ ফুট × ৬৬ ফুট = ৪৩৫৬০ বর্গ ফুট্ জমি। এই জমিকে (৪½ ইঞ্চি ÷ ১২) দিয়া গুণ করিলে একার প্রতি প্রত্যেক বার ১৬৩৩৫ ঘন ফুট জলের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। একবার জমিতে ৪½ ইঞ্চি জল দিতে পারিলে পরে ১৫ দিবস আর জলের আবশ্যক হওয়ার সম্ভব থাকে না। এই ১৫ দিবস দিবারাত্র যদি খাল হইতে মাঠে প্রতি সেকেণ্ডে এক ঘন ফুট হিসাবে জল বিলির ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে একটী জল প্রণালীর সহযোগে ১৫ দিবসে কয় একার জমিতে জল বিলির বন্দোবস্ত হওয়া উচিত? পনের দিবসে, অর্থাৎ ১৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ = ১,২৯৬,০০০ সেকেণ্ডে, খাল হইতে প্রণালী বহিয়া ১২৯৬০০০ ঘন ফুট জল চলিয়া গেলে, এবং প্রতি একারে ১৬৩৩৫ ঘন ফুট্ জল বিলি হইলে এই সময়ের মধ্যে ১,২৯৬০০০ ÷ ১৬-৩৩৫ = প্রায় ৮০ একার জমিতে একটী প্রণালী হইতে জল বিলি চলিতে পারে। প্রণালীটী যদি এক ফুট গভীর ও এক ফুট্ প্রস্থ হয় এবং প্রণালীর জলস্রোতের উপর যদি এক খানি ছোট কাগজের নৌকা অথবা এক টুক্‌রা সোলা ভাসাইয়া দিয়া দেখা যায় এক মিনিট্ সময়ের মধ্যে নৌকা খানি বা সোলার টুক্‌রাটী ৬০ ফুট্ চলিয়া গেল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রণালী হইতে প্রতি সেকেণ্ডে মাঠে এক ঘন ফুট্ জল চলিয়া যাইতেছে। এই একটী উদাহরণের সাহায্যে প্রত্যেক খালের প্রত্যেক প্রণালীর দ্বারা কত জমির উপকার হওয়া

সম্ভব, ইহা হিসাব করিয়া স্থির করা যাইতে পারে। খালের ধারে ধারে কবাট আছে। এই কবাটের যদি এক বর্গ ফুট মাত্র খুলিয়া দেওয়া হয়, এবং প্রবাহ যদি সেকেণ্ডে এক ফুট হয়, তবেই প্রতি সেকেণ্ড এক ঘন ফুট জল মাঠে চলিতেছে এই রূপ ধরিতে হইবে। যদি ৪ বর্গ ফুট কবাট খুলিয়া দেওয়া হয় ও প্রবাহ যদি সেকেণ্ডে ২½ ফুট হয়, তবে প্রত্যেক সেকেণ্ডে (৫/২ × ৪) = ১০ ঘন-ফুট জল মাঠে চলিয়া যাইতেছে-এইরূপ স্থির করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। জল সেচনের উপায় স্থির করিতে হইলে প্রথমে কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ?

২। তিন চারি হাত নিম্ন হইতে জল তুলিতে হইলে কি উপায়ে জল তোলা শ্রেয়ঃ ? সাত আট হাত নিম্ন হইতে জল তুলিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত ? দশ-বার হাত নিম্ন জলাশয় হইতে জল তুলিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে ? বিশ, পঁচিশ বা ততোধিক গভীর জলাশয় হইতে জল তুলিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি কি ?

৩। দোন্ বা ডোঙ্গা যন্ত্র বর্ণনা কর। ইহা দ্বারা প্রত্যহ কত খরচে কি পরিমাণ ভূমিতে জল সেচন করা যাইতে পারে ?

৪। বালদেব বালতি কিরূপ যন্ত্র ? ইহা দ্বারা কি পরিমাণ কার্য্য হইতে পারে ?

৫। টাবুট ও শাডুফ নামক মিশর দেশীয় দুইটী জলোত্তলন যন্ত্র বর্ণনা কর।

৬। সেচনী বা সিউনী দ্বারা কি পরিমাণ কার্য্য হইতে পারে ? একখানা সিউনী দ্বারা যত কায হয় তদপেক্ষা অধিক বা অল্প খরচে উপর্য্যুপরি দুই খানা দোনের দ্বারা কার্য্য হইতে পারে ?

৭। তেড়া বা লাঠা দ্বারা কি পরিমাণ জমি সেচন করা যাইতে পারে?

৮। পঞ্জাবী ঘট-চক্র বর্ণনা কর।

৯। একানে ও ডবল মোট কিরূপে গঠিত হয় চিত্র দ্বারা দেখাইয়া দাও।

১০। ঘটচক্রের অনুরূপে সহজ উপায়ে জল তুলিবার একটী প্রকরণ বুঝাইয়া দাও।

১১। খালের জলের দ্বারা জমির ও ফসলের কি কি উপকার হয়?

১২। খাল হইতে যদি এক বর্গ ফুট পরিমাণ জল ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং এই জলের প্রবাহ যদি প্রতি সেকেণ্ডে ২½ ফুট হয়, তবে ১৫ দিবসে কি পরিমাণ জমিতে জল বিলি করিতে পারা যায়?

১৩। আমন ধান্য জন্মাইবার জন্য প্রত্যেক বারে মাঠে কয় ইঞ্চি জল দেওয়া উচিত।

১৪। ধান্যের জন্য দুর্ব্বৎসরে কয় বার জল বিলি আবশ্যক?

সপ্তম অধ্যায়।

খাদ্য-প্রদ বৃক্ষ।

যত্ন।—কৃষিজাত ওষধি সকল অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। বৃহদাকারের বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা মধ্যে গভীর ভাবে প্রোথিত থাকাতে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা বৃক্ষের বিশেষ ক্ষতি হয় না। চৈত্র-বৈশাখ মাসে মৃত্তিকা নিতান্ত নীরস থাকিবার কারণ মাঠে

কৃষিজাত ফসল কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বৃহদাকারের বৃক্ষের দিকে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে চৈত্র-বৈশাখ মাসেই ঐ গুলি নব পত্রে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মৃত্তিকার গভীর প্রদেশ হইতে রস শাখা প্রশাখা বহিয়া সঞ্চালিত হইয়া নব পত্রোদ্গমের সহায়তা করে। নিতান্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষকে এই সময়ে জল দিয়া বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক করে। বৃক্ষ রোপণ করিয়া প্রথম দুই তিন বৎসর শীত ও গ্রীষ্ম কালে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে বৃক্ষ দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়। বৃক্ষের চারা বেড়া দ্বারা, অথবা উহার কাণ্ডে গোবর মাখাইয়া, অথবা উহা খড় ও কাঁটা দ্বারা আবৃত করিয়া দিয়া, রক্ষা করা উচিত। সকল বৃক্ষই যে চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফলোৎপাদন করিতে সক্ষম হয় এরূপ নহে। কলমের গাছ ইহা অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে ফলোৎপাদন করে। সুপারি, নারিকেল, ইত্যাদি বৃক্ষ পাঁচ বৎসরের কমে প্রায় ফলবান হয় না, এবং সাধারণতঃ বীজ হইতে যে সকল বৃক্ষ হয়, ঐ সকল ফলবান হইতে দশ বৎসর লাগিয়া থাকে। বেড়া দ্বারা চারা গাছ রক্ষা করিতে পারিলে, এবং প্রথম তিন বৎসর গোড়া খুঁড়িয়া সার ও জল দিতে পারিলে, গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ফলবান হয়। ছাগলে বা গোরুতে গাছের পাতা খাইলে গাছ শীঘ্র বাড়ে না, এ কারণ যাহাতে গাছের পাতা না নষ্ট হয় সে বিষয়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হয়। তিন বৎসর কাল যত্ন করিয়া গাছ রাখিতে পারিলে, পরে বিনা আয়াসে ও বিনা যত্নে ফল ভোগ করিতে পারা যায়। গর্ত্ত করিয়া গাছ লাগাইয়া বেড়া দিয়া ইহাকে ঘিরিবার পূর্ব্বে ফলগাছ রোপনের সময় একটি কার্য্য করা ভাল। গর্ত্তের চতুষ্পার্শ্বে কয়েকখানি অস্থি ফেলিয়া দিয়া পরে গাছ লাগাইলে গাছের ফল সুমিষ্ট হয়। কৃষিজাত ওষধি সকল

সহজে বিনষ্ট হয় বলিয়া, সকল কৃষকেরই কর্ত্তব্য আপনাপন মাঠের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি গাছ লাগাইয়া দেওয়া। বৃক্ষ ছায়ায় সাধারণতঃ সকল ফসল হয় না বটে, কিন্তু যে যে ফসল বৃক্ষ ছায়ায় উত্তম জন্মে, এই সকল ফসল জন্মাইতে পারিলে জমির অপব্যয়ও হয় না অথচ বৃক্ষ গুলি হইতে দুর্দিনেও ফল পাওয়া যায়। বৃক্ষ ছায়ার নিম্নে হরিদ্রা, আদ্রক, এরারুট, মাট-বাদাম (বা চীনারবাদাম), পিপুল, গোলমরিচ, কাঙ্কুরা, * কাফি, ইত্যাদি কয়েক জাতীয় ফসল উত্তম জন্মিয়া থাকে।

অন্তর।—যে বৃক্ষ যত বড় হইয়া থাকে সেইটী বুঝিয়া রোপণ করিবার সময় অন্তর স্থির করিতে হয়। সম্পূর্ণ বড় হইলে যেন বৃক্ষগুলি পরস্পরকে স্পর্শ মাত্র করিতে পারে এমত অন্তরে বৃক্ষের চারা রোপণ করা আবশ্যক। নারিকেল গাছ ১০ হাত অন্তর রোপণ করা উচিত, অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ৬৪টী নারিকেল গাছ থাকিলে ফল ভাল হয় অথচ জমিরও অপব্যয় হয় না। রবার গাছ লাগাইতে হইলে বিঘাপ্রতি ৩৪টী মাত্র লাগান উচিত। মহুয়া গাছ ১৫ হাত অন্তর, কলাগাছ, সুপারি গাছ ও খর্জ্জুর গাছ ৮ হাত অন্তর, আম ও কাঁঠাল গাছ ২০ হাত অন্তর, পেঁপিয়া গাছ ৭ হাত অন্তর এবং কমলালেবু ও বাঁশ গাছ ১২ হাত অন্তর, লাগান উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত গাছগুলি সম্পূর্ণ বড় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জমির ব্যবহার করিয়া লইবার জন্য সার ও চাষ দিয়া জমির ফাঁকে ফাঁকে হরিদ্রা, আদ্রক, চীনারবাদাম ইত্যাদি ফসল জন্মান যাইতে পারে। প্রথম বৎসরে আশু-ধান্য লাগাইয়া, ধান্যের মধ্যে মধ্যে গাছ রোপণ করিতে পারিলে জমি বিল-

* কাঙ্কুরা বা রিহা গাছ হইতে প্রায় রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল ও তারসহ সূত্র বাহির করিতে পারা যায়। রঙ্গপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানে এই ফসল অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হয়। পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে রিহার চাষ প্রচলিত হওয়ার সম্ভব।

ক্ষণ পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রস্তরময় ভূভাগে আশু-ধান্যের পরিবর্ত্তে কুলথ কলাই লাগাইয়া পরে গাছের চারা রোপণ করিলে গাছ ভাল জন্মে।

বৃক্ষ রোপনের উপকারিতা।—প্রথমতঃ, বৃক্ষ সকল মৃত্তিকার গভীর প্রদেশ হইতে রস টানিয়া লইয়া পরিপুষ্ট হয় বলিয়া, বৃক্ষ হইতে যে বীজ, পুষ্প, পত্রাদি বিচ্যুত হইয়া পড়ে উহাদের সার-ভাগ মৃত্তিকার উপরিভাগের স্তর হইতে না আসিয়া মৃত্তিকার গভীর স্তর হইতেই আসিয়া থাকে। এই সকল সারবান পদার্থ জমির উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া জমির উপর স্তরকে ক্রমশঃ সারবান করিয়া তুলে। জঙ্গলময় প্রদেশের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ সারবান নহে, কেবল বৃক্ষের পত্রাদি বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াই উহা সারবান হইয়া থাকে। যে ভূভাগে প্রচুর বৃক্ষ থাকে ঐ ভূভাগ অপেক্ষাকৃত সারবান। এই সার বিনা মূল্যে, বিনা আয়াসে, লাভ করা যায়। সার লাভের এরূপ সদুপায় যেন কৃষকগণ অবহেলা না করে। দিবারাত্র বৃক্ষগণ মৃত্তিকার গভীর প্রদেশ হইতে সারবান পদার্থ সকল বহন করিয়া মৃত্তিকার উপরিভাগে বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে। বৃক্ষগণ দ্বারা এই প্রধান উপকারটী লব্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বৃক্ষ সকল দ্বারা কঠিন মৃত্তিকা ক্রমশঃ লঘু, ও লঘু মৃত্তিকা ক্রমশঃ কঠিনতর হইয়া, মৃত্তিকা কৃষিকার্য্যের অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে। নিতান্ত বালুকাময় মৃত্তিকাকে লঘু মৃত্তিকা কহা যায়। এইরূপ মৃত্তিকায় বৃক্ষ জন্মাইতে পারিলে কালক্রমে মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পুরাতন উদ্যানের মৃত্তিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া যায়। শিকড়, পত্র, ফল, ফুল, ইত্যাদি পদার্থ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়াই এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। নিতান্ত কর্দ্দমময় কঠিন মৃত্তিকার উপর বৃক্ষ রোপণ করিলেও

ঐ মৃত্তিকা শিকড়, পত্র, ইত্যাদি সহযোগে লঘু ও পুরাতন উদ্যানের মৃত্তিকার ন্যায় হইয়া আইসে। তৃতীয়তঃ, বৃক্ষ থাকিবার কারণ বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। যে দেশে বৃক্ষ নাই সে দেশে প্রায় বৃষ্টি হয় না; ইহার উদাহরণ মিসর, আরব, ইত্যাদি। এ সকল দেশেও যে যে ভূভাগে সহস্র সহস্র বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে সেই সেই ভূভাগে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। বৃক্ষ রোপণের ইহা সামান্য উপকারিতা নহে। চতুর্থতঃ, বৃক্ষ রোপণ দ্বারা ঝড়ের প্রবল বাত্যা রোধ হইয়া, কৃষিজাত ওষধি এবং ঘর-বাড়ি রক্ষা পাইয়া যায়। পঞ্চমতঃ, বৃক্ষদ্বারা শীতল স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, এবং উষ্ণ স্থান অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে বৃক্ষছায়ায় গিয়া পথিক আরাম উপভোগ করে, এবং শীতকালের রাত্রিযোগে শীত নিবারণ করিবার জন্য পথিক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। শৈত্য ও উষ্ণতার তীব্রতা লাঘব করিবার জন্য বৃক্ষ বিশেষ উপকারী। ষষ্ঠতঃ, বৃক্ষরাজি দ্বারা সংক্রামক রোগের বীজের অব্যাহত গতি প্রতিরোধ হইয়া থাকে। কোন গ্রামে হয়ত ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। এই গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে যদি বৃক্ষ থাকে, এবং এই গ্রামের মাঠের চতুষ্পার্শ্বেও যদি বৃক্ষ থাকে, তাহা হইলে ওলাউঠা রোগের বীজ অন্য গ্রামে সহজে যাইতে পারে না। সপ্তমতঃ, বৃক্ষ হইতে মনুষ্যের ও গবাদি জন্তুর আহার এবং জ্বালানী কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোময় জমির সারের জন্য ব্যবহার না করিয়া, জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহার করিবার কারণ, অনেক অপব্যয় হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ জন্মাইতে পারিলে, মধ্যে মধ্যে, অর্থাৎ দুই তিন বৎসর অন্তর, বড় বড় বৃক্ষ হইতে প্রশাখাগুলি কাটিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে, অনায়াসে গোময় সারের জন্য ব্যবহার হইতে পারে।

আহার্য্য সামগ্রী।—যে সকল বৃক্ষ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া কেবল শ্রেষ্ঠ জাতীয় কাষ্ঠ উৎপাদন করে, ঐ সকল বৃক্ষ কৃষকদের রোপণ করা আবশ্যক করে না। সাল, সেগুন, টুন, মেহগিনি, ইত্যাদি, এই শ্রেণীর বৃক্ষ। যে সকল বৃক্ষ অপেক্ষাকৃত দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্য বা গবাদি জন্তুর আহায্য পদার্থ উৎপাদন করে, এমন সকল বৃক্ষই কৃষকদের দ্বারা রোপিত হওয়া আবশ্যক। আমের আঁঠির মধ্যে যে কষি থাকে উহা সিদ্ধ করিয়া উহার কষ বাহির করিয়া লইলে, উহা হইতে রুটী প্রস্তুতের উপযুক্ত ময়দার ন্যায় সামগ্রী লাভ করা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র লোকে কৃষিজাত শস্যের উপর নির্ভর না করিয়া নানা বৃক্ষজাত সামগ্রীর উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকে। আমের কষির ময়দা ইহারই অন্যতম সামগ্রী। মহুয়া গাছের ফুল এইরূপ আর একটী সামগ্রী। বেল, কাঁঠাল বীজ, ডুম্বুর, সজনার শাক ও ডাঁটা, বক-ফুলের সুঁটি, হিজ্‌লিবাদাম, ইত্যাদি সামগ্রীও বৃক্ষজাত। আহা ' বিহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের কত লোক দুর্ভিক্ষের সময় শুষ্ক মহুয়ার ফুল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। পেঁপিয়া অতি সহজ পাচ্য ফল। অপক অবস্থায়ও ইহা পাক করিয়া খাওয়া যায়। পেঁপিয়া গাছ যত লাগান যায় ততই ভাল। অপক্ক কাঁঠালও পাক করিয়া খাইলে সহজে পরিপাক হয়, এ কারণ কাঁঠাল গাছ লাগানতেও বিশেষ উপকার আছে। গবাদি জন্তুর আহারের জন্য বৃহৎ জাতীয় তুঁত গাছ বিশেষ উপকারী। তুঁত গাছের অতি কোমল নবীন পত্র ও পত্র-মুকুল শাকের ন্যায় পাক করিয়া আহার করিতে পারা যায়। বাঁশের কোরকও পাক করিয়া লোকে আহার করিয়া থাকে। হিজ্‌লিবাদাম হইতে যে তৈল নির্গত হয় উহা আহারার্থে সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। হিজ্‌লিবাদামের গাছ সমুদ্রের

অদূরবর্ত্তী উচ্চ স্থানে জন্মান যাইতে পারে। মহুয়ার ফল হইতে যে ঘৃতবৎ তৈল বাহির হয় উহা তাদৃশ সুস্বাদু নহে; কিন্তু সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি এই তৈলই আহারার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। গুড় ও চিনি খর্জ্জুর গাছ হইতে লাভ করা যায়। নোনা গাছের ও ওলট্‌-কম্বল গাছের আঁশ হইতে রজ্জু প্রস্তুত হইতে পারে। বস্তুতঃ মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত সামগ্রী আবশ্যক সে সমস্তই নানাবিধ বৃক্ষ হইতে উৎপাদন করিতে পারা যায়। হঠাৎ বন্যা আসিয়া অথবা বৃষ্টিপাতের ন্যূনতা বশতঃ কৃষিজাত ওষধি সমস্ত প্রায় যেমন নষ্ট হইয়া যায়, বৃক্ষ সমুদায় তেমন সহজে নষ্ট হয় না। এ কারণ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ কৃষকদের আপন আপন জমির চতুষ্পার্শ্বে লাগান কর্ত্তব্য।

ডাল ও শিকড় ছাটা।—বৃক্ষ লাগাইবার পাঁচ বৎসর পরে, অর্থাৎ উহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে, কোন কোন বৃক্ষের এক বৎসর অন্তর ডাল ছাটিয়া দিলে, উহাতে ফল অধিক হয়। লেবু ও লিচু ইহার উদাহরণ। আবার কোন কোন বৃহৎ বৃক্ষের শিকড় কাটিয়া দিলে উহাতে ফল অধিক ধরে। আম্র বৃক্ষ ইহার উদাহরণ। যে আম্র বৃক্ষে বা লেবু গাছে কখন ফল ধরে না, তাহাতে ফল ধরাইবার উপায়, গাছগুলির গোড়া হইতে কিছু অন্তরে ঘেরিয়া একটী দুই এক হাত পরিমাণ প্রশস্ত ও গভীর গর্ত্ত করিয়া গাছগুলির কতক শিকড় কাটিয়া দিয়া ঐ গর্ত্তে কয়েকখানা হাড় ফেলিয়া দিয়া পুনরায় গর্ত্ত বুজাইয়া দেওয়া। হাড়ের একটী গুণ ইহা সাররূপে ব্যবহার করিলে গাছের ফুল ও ফল উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ।—বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ প্রকারের বৃক্ষ জন্মান দ্বারা লাভ অধিক হয়। যে স্থানে অনেক

তসর-কীট পালনকারী সাঁওতাল বা অন্য জাতীয় লোক বাস করে সেই স্থানে আসন গাছ লাগানতে লাভ আছে। যে স্থানে অনেক লোকে রেশম-কীট পালন করে সেখানে বৃহৎ জাতীয় মোরস্ আল্‌বা নামক তুঁত গাছ লাগানতে লাভ আছে। যে স্থানে অনেক লোকে এণ্ডিকীট পালন করে সে স্থানে ভেরাণ্ডা বা এরণ্ড গাছ লাগানতে উপকার আছে। যেখানে রঙ্গের কার্য্য হয়, সেখানে রিঠা গাছ, লট্‌কান্ গাছ, পাট্‌ সিন্দুরিয়া বা আবির গাছ, চিলা গাছ, হরিতকী গাছ, ইত্যাদি লাগানতে লাভ আছে। যেখানে লোকে লাক্ষার কীট পালন করিতে জানে, সেখানে কুসুম্ব্, কুল ও পলাস বৃক্ষ লাগান ভাল। যেখানে চাম্‌ড়ার কার্য্য অধিক আছে সেখানে বাব্‌লা, ডিবি-ডিবি, টৌরি, আসন, হরিতকী, এই সকল গাছ লাগান উচিত। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্রেড্‌ফ্রুট্ বা রুটী-ফলের গাছ, হিজ্‌লি বাদামের গাছ ও নারিকেল গাছ লাগান উচিত। মোটের উপর আম, কাঁঠাল, বাঁশ, পেঁপে, সজ্‌না, বেল, কলা ও আতা, এই কয়েকটী গাছের দিকে কৃষক-সাধারণের লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য।

বীজ ও কলম।—বীজ বা আঁঠি হইতে গাছ যেরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সবল হয় কলমের গাছ সেরূপ হয় না; এ কারণ কৃষক-সাধারণের পক্ষে কলমের গাছ লাগাইবার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। বৃক্ষ জন্মান দ্বারা কি কি উপকার দর্শে?

২। সাধারণতঃ কোন্ গাছগুলি কৃষকদিগের লাগান উচিত?

৩। বৃক্ষ জন্মান দ্বারা পার্শ্বস্থ জমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে কিরূপ তারতম্য ঘটে তাহা বুঝাইয়া দাও।

৪। বৃক্ষ ছায়ায় যে যে ফসল জন্মান যাইতে পারে তাহাদের নাম দাও।

৫। চারা-গাছ রোপণের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক?

৬। বৃক্ষের ফলোৎপাদনের কাল সম্বন্ধে কয়েকটী উদাহরণ দাও।

৭। কোন্ বৃক্ষ কত অন্তরে লাগাইতে হয় তাহা কতকগুলি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৮। মনুষ্য কৃষিকার্য্য দ্বারা যে যে প্রকারের সামগ্রী লাভ করিয়া থাকে সেই সেই প্রকারের সামগ্রী কোন্ কোন্ গাছ হইতে লাভ করা যায়?

৯। কলমের গাছ লাগাইয়া লাভ কি?

১০। ডাল ছাটা ও শিকড় ছাটার উপকারিতা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১১। বিশেষ বিশেষ স্থানে ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ লাগানতে লাভ আছে, এই কথার সার্থকতা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

অষ্টম অধ্যায়।

পোকা লাগা ও ধসা ধরা।

সাধারণ নিবারণোপায়।—ফসলে পোকা লাগিয়া অথবা "ধসা ধরিয়া" কখন কখন অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার রাখিতে পারিলে, এবং ভালরূপে অনেক দিন ধরিয়া

অনেকবার জমিতে চাষ দিতে পারিলে, পোকা লাগিয়া ও ধসা ধরিয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কর্ষিত ভূমির উপর কাক, শালিক প্রভৃতি পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে বসিয়া ভূমি হইতে কীট খুঁটিয়া খাইয়া থাকে। অনেক দিবস পর্য্যন্ত অকর্ষিত অবস্থায় পতিত আছে এরূপ ভূমির মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় উহা নানাপ্রকার কীটের বাসায় পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে ভূমি কর্ষিত হইলে এই সকল বাসা ভাঙ্গিয়া যায় এবং পক্ষীগণও আলোড়িত মৃত্তিকা হইতে সহজে কীট খুঁটিয়া খাইতে পারে। অনেক দিন ধরিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমি কর্ষণ করিতে পারিলে সূর্য্যের রশ্মি ও উত্তাপ মৃত্তিকার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপর পতিত হইয়া নানাপ্রকার ধসা-রোগের বীজকে নষ্ট করে। অনেক কৃষক আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে ধান্য কাটিয়া পুনরায় বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাস না পড়িলে আর জমিতে চাষ দেয় না। চৈতালী ফসল যদি নাও জন্মান হয় তথাপি ধান্য ছেদনের অব্যবহিত পরেই একবার ভূমি কর্ষণ করিয়া, পরে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত মাসে একবার করিয়া জমিতে চাষ দিয়া বর্ষারম্ভে ধান্য রোপণ করা উচিত। এরূপ প্রথা অবলম্বন করিতে পারিলে কীট ও ধসা-রোগের হস্ত হইতে প্রায় নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যদি ধান্য ছেদনের পরেই দেখা যায়, ভূমি নিতান্ত শুষ্ক, কঠিন ও চাষ দিবার অনুপযুক্ত হইয়া আছে, তাহা হইলে মাঘ বা ফাল্গুনে যে দিবস প্রথমে বৃষ্টিহইবে, সেই দিবসেই চাষ দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। অনেক দিবস ধরিয়া মৃত্তিকা শ্লথ অবস্থায় অবস্থায় রাখিতে পারিলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিরও বৃদ্ধি হয়।

বীজ-শোধন।—কোন কোন কীটের ও ধসা-রোগের উৎপত্তির কারণ, বীজে কীটের ডিম্ব বা রোগের বীজ নিহিত থাকা।

বীজ, কলম ইত্যাদি বপন বা রোপণ করিবার সময় উহাদের শোধন করিয়া লওয়া উচিত। বীজাদি শোধন বা রোগ-বিচ্যুত করিতে হইলে উহাদের কীট-নাশক ও জীবাণু-নাশক বা-রোধক কয়েকটী সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এই সকল সামগ্রী হয় বিষাক্ত, নতুবা তিক্ত বা তীব্র স্বাদ অথবা দুর্গন্ধ যুক্ত। সাধারণতঃ তুঁতিয়া মিশ্রিত জলের মধ্যে বীজ বা কলম ডুবাইয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ চূর্ণ শেঁকোবিষ, চুণ, ক্ষার ও সর্ষপ বা রেড়ির খোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুকাইয়া লইয়া, ঐ দিবসেই বপন বা রোপনার্থ ব্যবহার করা উচিত। যদি এক ছটাক গুঁড়া তুঁতিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ২০০ ছটাক অর্থাৎ বার-তের সের আন্দাজ গরম জলের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া লইয়া, এক দিবসের মধ্যেই এই তুঁতিয়া মিশ্রিত জল ব্যবহার করিয়া লইতে হয়। সেঁকোবিষ অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত; অর্থাৎ যদি একমণ চূর্ণ খোল, পাঁচ সের চূর্ণ ক্ষার ও পাঁচ সের চূর্ণ চুণ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এক ছটাক মাত্র সেঁকোবিষ ভাল করিয়া চূর্ণ করিয়া উক্ত তিনটী সামগ্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা নিয়ম। তুঁতিয়ার জলের মধ্যে বীজ, কলম বা মূল অনেকক্ষণ রাখিলে উহার উৎপাদিকা শক্তির নাশ হয়, এ কারণ বীজাদি তুঁতিয়ার জলে এক মিনিট্ মাত্র ডুবাইয়া চূর্ণ ও শুষ্ক সার-পদার্থ দ্বারা শুকাইয়া লইতে হয়।

অন্যান্য উপায়।—কখন কখন দেখা যায়, উত্তম করিয়া অনেক দিবস ধরিয়া ভূমি কর্ষণ করিয়া এবং বীজ শোধন করিয়া ব্যবহার করিয়া লইয়াও, কোথা হইতে আসিয়া ফসলে পোকা লাগিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, প্রায় রাত্রিকালে পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া গাছের পাতায় বা ডালে ডিম্ব প্রসব করিয়া চলিয়া যাওয়া এবং ঐ সকল

ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া কীটাবস্থায় পরিণত হওয়া। ডিম্ব হইতে প্রস্ফুটিত ঐ কীটই গাছের পত্রাদি খাইয়া, অথবা গাছের রস শোষণ করিয়া, অথবা গাছের ডালের বা ফলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ফসলের ক্ষতি করে। রাত্রিকালে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বালাইতে পারিলে কীটের দৌরাত্ম্য হ্রাস হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং কার্ত্তিক মাসেই কীটের দৌরাত্ম্য অধিক হইয়া থাকে। এই দুই সময়ে সন্ধ্যারাত্রে ক্ষেত্রে অগ্নি জ্বালাইতে পারিলে, অনেক পতঙ্গ অগ্নি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গাছে ডিম্ব প্রসব না করিয়া আপনা হইতেই অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া মরিয়া থাকে। পঙ্গপাল ঝাঁকে ঝাঁকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে উড়িয়া গিয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষুধা নিবারণার্থ ক্ষেত্রে নামিয়া ফসলের অনেক ক্ষতি করে। পূর্ব্ব হইতে পঙ্গপাল আসিতেছে ইহা জানিতে পারিলে গ্রাম শুদ্ধ লোক ক্ষেত্রে যাইয়া হোল্লা করিতে পারিলে পঙ্গপাল ঐ গ্রামের ক্ষেত্রে না নামিয়া অন্যত্রে উড়িয়া চলিয়া যায়।

কার্পাস, চা, ইত্যাদি অধিক কাল স্থায়ী ফসলে পোকার দৌরাত্ম যদি অধিক হয়, সন্ধ্যার পরে পাটকাটি অথবা খড়ের আঁটিতে আগুন লাগাইয়া দিয়া, ঐ জলন্ত আঁটি ক্ষেত্রের গাছে স্পর্শ মাত্র করিতে করিতে চলিয়া যাইতে হয়। গাছ গুলি সামান্য পরিমাণে ঝল্‌সাইয়া

২০শ চিত্র। গাছ ঝল্‌সান যন্ত্র।

যাইবে বটে, কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যেই পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিবে এবং কীট আর দেখা যাইবে না। যদি একবার ঝল্‌সাইয়া লইলে কীট এক-কালীন নষ্ট না হয়, তাহা হইলে আর একবার গাছ গুলি ঝল্‌সাইয়া লওয়া যাইতে পারে। অগ্নি দ্বারা ধসা-রোগেরও বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। গাছ ঝল্‌সাইবার জন্য একপ্রকার যন্ত্রেরও ব্যবহার আছে। ইহা আস্‌বেষ্টস্ নামক অদাহ্য পদার্থের গোলা একটী ছড়ির উপর লাগান। কেরোসিন্ তৈলে গোলা ডুবাইয়া জ্বালাইয়া এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।

চারা-গাছে পোকা।—বেগুন গাছ, কপি গাছ, ইত্যাদি গাছে যদি চারা অবস্থায় পোকা লাগে, তাহা হইলে শেঁকো বিষ, চূণ ও ক্ষার চূর্ণ করিয়া পুঁটুলির মধ্যে রাখিয়া, এইরূপ ২০।২৫টী পুঁটুলি বাঁশে বা যষ্টিতে ঝুলাইয়া চারা গাছের উপর ঝাড়িতে ঝাড়িতে চলিয়া যাইতে হয়। এক ভাগ শেঁকো বিষ, ১০০ ভাগ চূণ ও ১০০ ভাগ ক্ষার ব্যবহার করা উচিত। বাঁশের বা যষ্টির দুই দিকে দুই জন থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যেই এক বিঘা জমিতে বিষ ছিটান হইয়া যায়। বেগুন গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে, অথবা ফুল-কপির ফুল দেখা দিলে, অথবা বাঁধা কপি বাঁধিতে আরম্ভ করিলে, অথবা শাকের কোন অবস্থাতেই, শেঁকোবিষ ব্যবহার করা উচিত নহে। বিষাক্ত গুঁড়া ছিটাইবার জন্য কয়েক প্রকার হাপর যন্ত্রেরও ব্যবহার আছে।
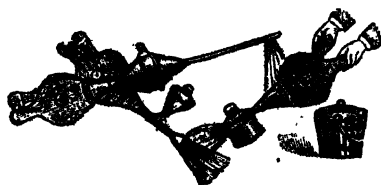
২১শ চিত্র। গুড়া ও আরক ছিটাইবার হাপর-যন্ত্র।

মৃত্তিকার মধ্যে পোকা।—চোরা পোকা, কোরা পোকা, প্রভৃতি কতকগুলি পোকা মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া ফসলের ক্ষতি করে। চোরা-পোকা রাত্রি কালে মৃত্তিকা হইতে বাহিরে আসিয়া গাছ ও পাতা খাইতে ও নষ্ট করিতে থাকে। কোরা-পোকা কীটাবস্থায়

২২শ চিত্র। কোরাপোকা, কীট, পুত্তলি ও পতঙ্গাবস্থা।

দিবা-রাত্রি মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া গাছের শিকড় কাটিয়া গাছ নষ্ট করে। পতঙ্গ অবস্থায় কোরা পোকা রাত্রি কালে মৃত্তিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া গাছের পাতা খাইতে থাকে। মৃত্তিকার মধ্যগত কীটকে মারিতে হইলে পিচ্‌কারি দ্বারা কেরোসিন্ বা রেড়ির তৈলের আরক ব্যবহার করা উচিত। কেরোসিন্ তৈলের আরক প্রস্তুত করিতে হইলে অর্দ্ধ বোতল কেরোসিন্ তৈল ও অর্দ্ধ বোতল ঘোল একত্র করিয়া উত্তম করিয়া দশ মিনিট ধরিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশ্রিত

২৩শ চিত্র। আরক ছিটাইবার দম্ কল।

করিয়া লইতে হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ ৫০ বোতল জলের সহিত মিলাইয়া দিয়া পিচ্‌কারি দ্বারা গাছের গোড়ায় গোড়ায় প্রবেশ করাইয়া

দিলে গাছের গোড়ায় যত পোকা আছে সমস্ত মরিয়া যায়। পিচ্‌কারির পরিবর্ত্তে যে দম্‌কল পৃষ্ঠে করিয়া ব্যবহার করার নিয়ম আছে ঐ দম্‌কল ব্যবহার দ্বারা অনেক জমিতে অল্প সময়ের মধ্যে আরক ছিটান চলে। দম্‌কল ব্যবহার রাত্রিকালেই হওয়া উচিত কেননা রাত্রিকালেই এই সকল পোকা গুলি মাটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া গাছে উঠে এবং রাত্রিকালে আরক অধিকক্ষণ তরল অবস্থায় থাকে, ছিটাইতে ছিটাইতে শুকাইয়া যায় না। রেড়ির তৈলের আরক প্রস্তুত করিতে হইলে, তৈলটী সোডার সহিত জ্বাল দিতে দিতে ও আলোড়ন সহ জল ঢালিতে ঢালিতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইহাও দম্‌কলের দ্বারা রাত্রিযোগে ক্ষেত্রে ছিটাইতে হয়।

২৪শ চিত্র। আরক ছিটাইবার দম্‌কলের ব্যবহার।

গাছের উপরি ভাগে যদি কোন পোকা লাগিয়া ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে কেরোসিনের বা রেড়ির তৈলের আরক দম্‌কলের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে হয়। তামাক সিদ্ধ জল, হিংএর জল, হলুদও লঙ্কার গুঁড়া, এ সমস্ত

ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিলেও পোকা পলাইয়া বা মরিয়া যায়। মহুয়ার খোল জ্বালাইয়া ক্ষেত্রে ধূম দিতে পারিলেও পোকা পলাইয়া যায়।

গাছ গুলি এক ফুটের অধিক উচ্চ হইয়া গেলে ক্ষেত্রে কুক্কুট, পেরু, ইত্যাদি গৃহ-পালিত পক্ষী ছাড়িয়া দিলে, উহারা গাছের পোকা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়া ফেলে। তামাক ও বেগুন গাছের পাতায় পোকা লাগিলে এই উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। নিতান্ত চারা গাছের মধ্যে কুক্কুটাদি পক্ষী ছাড়িয়া দিলে উহারা গাছ খাইয়া নষ্ট করে।

চিতে-লাগা, ধসা-ধরা, কুড়ে-লাগা, তুলশী-মারা হওয়া, পচ্-ধরা বোঞো-লাগা, হর্দ্দা হওয়া ইত্যাদি রোগ আণুবীক্ষনিক জীবিতাণু বা বীজাণু দ্বারা ঘটিয়া থাকে। জমিতে জল আট্কাইলে, অথবা পূর্ণ মাত্রায় জমিতে সূর্য্যের কিরণ না পড়িলে প্রায় এই সকল রোগ হইয়া থাকে। ধান্য ভিন্ন আর কোন ফসলই প্রায় আবদ্ধ জলের উপর থাকিয়া সুস্থ ও সতেজ অবস্থায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পাট, অড়হর ভুট্টা, জুয়ার, ইক্ষু, এ সকল গাছ বর্ষার ফসল হইলেও চারা অবস্থায় আবদ্ধ জল দ্বারা প্রায়ই রোগগ্রস্থ হইয়া পড়ে। বেগুণ ও লঙ্কা গাছের গোড়ায় জল আটকাইলেই প্রায় "ডাল ভাঙ্গা রোগ" অথবা "তুলসী-মারা" অথবা "ধসা-ধরা" হইয়া ফসল মারা যায়। জল যাহাতে জমিতে না দাঁড়াইতে পায় এরূপ প্রণালী পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার মাটি উস্কাইয়া দেওয়াতে গাছ সতেজ হইয়া বাড়িয়া যায়, মৃত্তিকার মধ্যস্থ কীটাদির বাসা আলোড়িত হয়, সূর্য্যের রশ্মি মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধসা-রোগের বীজ নষ্ট করে। এ কারণ, মধ্যে মধ্যে কোদালি, নিড়ানি, ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা পোকা-লাগা ও ধসা-ধরার পক্ষেও

উপকার দর্শে। গমের হর্দ্দা-রোগ নিবারণের কোন সদুপায় অদ্যাবধি স্থির হয় নাই। এই রোগের বীজাণু গমের বীজের সহিত আইসে, এ কারণ নির্ব্বাচিত, অর্থাৎ রোগশূন্য বীজ তুঁতিয়ার জল দ্বারা শোধন করিয়া ব্যবহার করিলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। ধানের শু, এবং ভুট্টা ও জুয়ারের ভুষা-রোগও এই জাতীয়। তুঁতিয়ার জলে এই সকল ফসলের বীজ ডুবাইয়া ব্যবহার করিলে বীজের দোষটা কাটিয়া যায়।

বীজ রক্ষা।—নানা উপায় অবলম্বন দ্বারা কীটের উৎপাত প্রশমিত থাকিলেও শস্য ছেদনকালে এককালীন কীটের ডিম্ব-বিচ্যুত শস্য সংগ্রহ করিতে পারা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অলক্ষিতভাবে কিছু কিছু কীটের ডিম্ব প্রায়ই ফসলের মধ্যে থাকিয়া যায়। বীজ রক্ষা করিতে গেলে উহাকে শোধন করিয়া লইয়া রক্ষা না করিলে ভাণ্ডারের মধ্যেই ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া ভাণ্ডারের বীজ বা শস্য কীট দষ্ট হইয়া অল্প-বিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। কৃষকগণ ভুট্টা, গম প্রভৃতি শস্যের বীজ প্রায়ই কীট হইতে রক্ষা করিতে পারে না। একারণ কীট-দষ্ট বীজ চতুর্গুণ পরিমাণ ব্যবহার করিয়াও কখন কখন পূর্ণমাত্রায় ফসল জন্মাইতে পারে না। বীজ রক্ষা করিবার সহজ উপায় কার্ব্বণ-বাইসালফাইড্ নামক আরক ব্যবহার করা। ৪০৲ মণ বীজ রক্ষা করিতে এক সের মাত্র কার্বণ-বাই-সালফাইড্ ব্যবহার করিতে হয়। এই আরক অতি সহজ-দাহ্যমাণ পদার্থ; একারণ, ইহার নিকট দীপ বা অগ্নি কখনই লইয়া আসা বিধেয় নহে। বৃহদাকারের জালার মধ্যে উত্তমরূপে শুষ্ক বীজের পুঁটুলি বা আল্গা বীজ রাখিয়া, উহার মধ্যে খোলা এক পাত্র আরক প্রবেশ করাইয়া দিয়া জালার মুখ গোবর দিয়া বন্ধ করিয়া

দিয়া, এক ঘণ্টা পরে বীজ বাহির করিয়া লইয়া উহা আবদ্ধ টিনের আধারের মধ্যে অথবা লবণাক্ত থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া রাখিলে বীজ কীট-বিচ্যুত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। লবণের জলে থলিয়াগুলি ভিজাইয়া, শুকাইয়া লইলে ঐ থলিয়ার মধ্যে কীট প্রবেশ করে না। জালার মধ্যে বীজ রাখিয়া জালার মুখে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ শুষ্ক নিমের পাতা দিয়া রাখিলেও বাহিরের কীট জালার মধ্যে প্রবেশ করে না।

[এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ নর্ম্মাল বিদ্যালয় ও কৃষি বিদ্যালয়ে পাঠ্য।]

কীটের জাতি নির্ণয়।—পৃথ্বী-তলে কত সহস্র সহস্র জাতীয় কীট আছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কোন কোন কীট কৃষিকার্য্যের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। আবার কতকগুলি কীট অন্য কীটকে খাইয়া অথবা ফুল-বির্দ্ধ করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করে। আর কতকগুলিন কীটের সহিত কৃষিকার্য্যের কোন সম্পর্কই নাই। কীট সকলকে প্রধানতঃ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ক। চতুঃ-পত্র-মক্ষিকা। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, বোল্‌তা ভিম্‌রুল, ও কুম্ভকারিকা কীটের চারিটী পত্রের ন্যায় পক্ষ থাকাতে ইহাদিগকে চতুঃপত্র মক্ষিকা বলা যাইতে পারে। পিপীলিকাদিগের পুং ও স্ত্রী পতঙ্গগণ অল্পক্ষণের জন্য পক্ষবিশিষ্ট হয়। পিপীলিকার ক্লীব পতঙ্গগুলি পক্ষবিহীন। পিপীলিকা বেগুণ গাছ, চারা কপি গাছ, প্রভৃতির অনিষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু গাছের কয়েক জাতীয় কীট খাইয়া ফেলিয়া পিপীলিকাগণ কৃষিকার্য্যের সহায়তাও করে। কুম্ভকারিকা কীট গৃহাভ্যন্তরে ও অন্যান্য স্থানে মৃত্তিকা দ্বারা বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল বাসার মধ্যে নানা প্রকার কীট

মুখে করিয়া লইয়া গিয়া আপন শাবদিগকে ইহারা আহার করাইয়া থাকে। একারণ কুম্ভকারিকা কীটও কৃষিকার্য্যের সহায়তা সম্পাদন করে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী পতঙ্গাবস্থায় অন্য কীটের গাত্রের মধ্যে ডিম পাড়িয়া দিয়া সেই কীটের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

খ। কঠিন-পক্ষ-কীট।—ধাম্‌সা-পোকা, কান্‌কুটুর, পদ্মপোকা, আমের ভোঁ-পাকা, কোরা-পোকা, শশার পোকা, ধেনো-কাঁচ-পোকা, ফুলে কাঁচ পোকা, বেগুণ গাছের পদ্মপোকা, খেজুর গাছের পোকা, ঘুন-পোকা, চেলে-পোকা ও আর আর শুঁড়ই বা শুণ্ড-কীট, বৃহী-কীট, বোমা-কীট, মাল-পোকা, চিঁড়ে-কোটা, ইত্যাদি পতঙ্গাবস্থায় এক জোড়া করিয়া কঠিন পক্ষলাভ করে বলিয়া, ইহাদিগকে কঠিন-পক্ষ কীট বলা যাইতে পারে।
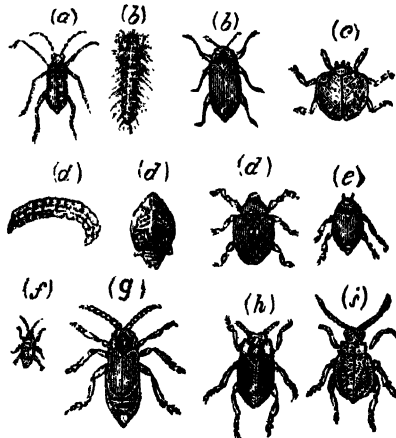
২৫শ চিত্র। কঠিন-পক্ষ-কীট।

(a) ধাম্‌সা-পোকা।

(b) কান্‌-কুটুর ও ইহার সোরে-পোকা অবস্থা।

(c) বেগুণ গাছের ২৮-স্ফুট-পদ্ম-পোকা।

(d) আম্রের ভোঁ-পোকা, কীট, পুত্তলিকা ও পতঙ্গাবস্থা।

(e) কোরা-পোকা।

(f) ধান গাছের মরিচা-পোকা।

(g) শশার পোকা।

(h) গম ও মসিনা গাছের চেপ্‌টী-পোকা।

(i) ধান গাছের কাঁচ-পোকা।

(a) **ধাম্‌সা-পোকা** কৃষকের বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ধান, পাট, ইক্ষু, এই সকল ফসলের ক্ষেত্রে ক্ষিপ্র-পদে শত শত ষড়বিন্দু-বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় এক প্রকার কীট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখা যায়। ইহারাই ধামসা-পোকা। ইহারা কি করিয়া বেড়াইতেছে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, কখন গাছে উঠিতেছে, কখন মৃত্তিকার বা গাছের কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে ইহারা নানা জাতীয় পোকা খাইয়া বেড়াইতেছে। ধানের চারায় যদি মরিচা-পোকা লাগে অমনই সহস্র সহস্র ধাম্‌সা-পাকা আসিয়া মরিচা-পোকা নষ্ট করিতে আরম্ভ করে। ধানে গাঁদি-পোকা লাগিলেও ধামসা-পোকায় কৃষকের উপকার করিয়া থাকে।

(b) **কান্‌কুটুর** রেশমের কোয়া, চামড়া, ইত্যাদি কাটিয়া নষ্ট করে। সোরে-পোকা কান্‌কুটুরেরই কীটাবস্থা। কীটাবস্থাতেও এই বীজ পলু-পোকা, চাম্‌ড়া ইত্যাদি আহার করিয়া অনেক ক্ষতি করে। তবে ইহারা মাংসাশী জীব বলিয়া অন্যান্য কীটও ভক্ষণ করে; এবং এই কারণ ইহারা কৃষকের ক্ষতি ও উপকার দুইই করিয়া থাকে। ধাম্‌সা-পোকা ও কান্‌-কুটুর অপেক্ষা বৃহত্তর কৃষ্ণকায় এক প্রকার

কঠিন-পক্ষ-কীট পঙ্গপাল পর্য্যন্ত খাইয়া নষ্ট করে। এই কীটও কৃষকের এক প্রধান বন্ধু।

(*c*) পদ্ম-পোকা অর্দ্ধ বর্ত্তুলাকার, চাকচিক্যশালী, রঞ্জিত, স্ফুটযুক্ত কীট। ইহারা প্রায়ই কীটভক্ষণ করিয়া কৃষকের উপকার করিয়া থাকে। চিত্রে যে পদ্ম-পোকাটি প্রদর্শিত হইয়াছে উহা বেগুণগাছের পাতা খাইয়া অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে। পতঙ্গাবস্থায় কঠিন পক্ষদ্বয়ের উপর ইহাদের ২৮টী স্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

(*d*) আম্রের ভোঁ-পোকা দ্বারা পূর্ব্ব-বঙ্গে বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া থাকে। আম্রগুলি অপক্ক ও ক্ষুদ্র থাকিতেই পতঙ্গগুলি ফলের গাত্রে ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। ঐ ডিম্ব হইতে কীট নির্গত হইয়া ফলের মধ্যে ছিদ্র করিয়া ভিতরে চলিয়া যায়। ক্রমশঃ ফলের গাত্রের ছিদ্রটিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কীটগুলি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ফলের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া প্রথমতঃ পুত্তলিকাবস্থা ও পরে পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পতঙ্গগুলি ফল কাটিলে বা পাকিলে উড়িয়া চলিয়া যায়। ইহারা মৃত্তিকার মধ্যে অথবা গাছের ত্বকের মধ্যে অথবা অন্ত কোথায় গিয়া পর বৎসর পর্য্যন্ত আশ্রয় লয় তাহা এখনও নির্নীত হয় নাই। যদি মৃত্তিকার মধ্যে আশ্রয় লয় তাহা হইলে আম্র গাছের নিম্নস্থ জমি চাষ করিয়া হলুদ ইত্যাদি ফসল লাগানই উচিত। আমেরিকাতে পতঙ্গে যাহাতে ফলের উপর ডিম না পাড়িতে পারে তজ্জন্য নানা প্রকার বিষাক্ত ও তীব্র গন্ধযুক্ত আরক দমকলের দ্বারা ফল বৃক্ষের উপর ছিটান হইয়া থাকে। এ নিয়ম এদেশে প্রচলিত হইবার অনেক বিলম্ব আছে। মৃত্তিকার আলোড়ন ভিন্ন আর একটী উপায় এদেশে সহজে প্রচলিত হইতে পারে। বাগানে ফল ধরিলেই ফলের রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। এ কারণ অনেকে ফল গাছের নিম্নে

ঘর বাঁধিয়া তিন চারি মাস কাল ফল বাগান চৌকি দিয়া থাকে। ফল গাছের নিম্নে রন্ধন করা ও রাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া রাখা উত্তম নিয়ম। ধূম দ্বারা কতকটা পতঙ্গ নিবারিত হয়। রাত্রে অগ্নি জ্বালিলে অনেক পতঙ্গ অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াও প্রাণত্যাগ করে। কর্ষিত জমিতে কুক্কুটাদি পক্ষী সহজে কীট পতঙ্গ খুঁটিয়া খাইতে পারে, একারণ ফল বাগানের নিম্নস্থ জমি কর্ষিত করিয়া উহাতে মধ্যে মধ্যে কুক্কুটাদি পক্ষী রাখাতে উপকার দর্শে।

(৫) কোরা-পোকার কীট, পুত্তলিকা ও পতঙ্গাবস্থা পূর্ব্বেই স্বাভাবিক আকারে, ২২শ চিত্র দ্বারা, প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পোকা অলক্ষিত ভাবে অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে। যে সকল ক্ষেত্র রীতিমত কর্ষিত হইয়া থাকে, ঐ সকল ক্ষেত্রে এই পোকা থাকিতে পারে না। তিন অবস্থাতেই পোকাটী মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিতি করে। কীটাবস্থায় গাছের শিকড় খাইয়া ইহারা কখন কখন গাছকে এক কালীন মারিয়া ফেলে। পুত্তলিকা অবস্থায় কিছুই না খাইয়া মৃত্তিকার মধ্যে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। পতঙ্গাবস্থায় রাত্রিকালে মৃত্তিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া গাছের পাতা ও ফুল খায়। ফলের বা ফুলের বাগান প্রস্তুত করিবার সময়ে অনেকে সমস্ত জমি ভাল করিয়া অনেক বার ধরিয়া কর্ষিত না করিয়া কেবল গর্ত্ত করিয়া ফল বা ফুল গাছের চারা লাগাইয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত ভ্রম। ভূমির অকর্ষিত ভাগ গুলিতে নানা জাতীয় কীটের বাসা থাকিয়া যায়। এই সকল বাসা হইতে কীট গুলি ক্রমশঃ লাগান গাছের শিকড়ে আশ্রয় লইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ও ক্রমশঃ গাছ গুলিকে মারিয়া ফেলে। সমস্ত ভূমি কর্ষণ ও আলোড়ণ দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে পারিলে

কোরা-পোকার হইতে ফসলের বা ফল ও ফুল গাছের ক্ষতি হইতে পারে না।

(*f*) ধান গাছ যখন ছোট থাকে তখন **মরিচা-পোকা** গাছের পাতার রস খাইয়া কিছু ক্ষতি করিয়া থাকে। ধাম্‌সা-পোকা মরিচা-পোকা খাইয়া অনেক উপকার করে। কিন্তু কখন কখন মরিচা-পোকার প্রাদুর্ভাব এত অধিক হইয়া পড়ে যে ধাম্‌সা-পোকা উহাদের খাইয়া শেষ করিতে পারে না। এমত অবস্থায় অনেক গাছ চারা অবস্থাতেই সাদা হইয়া মরিয়া যায়। ভাল করিয়া শীতকাল হইতে ধানের জমি কর্ষিত করিয়া রাখিতে পারিলে মরিচা-পোকার প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না।

(*g*) **শশার-পোকা** লোহিতের আভা যুক্ত হরিদ্রা বর্ণের কীট। ইহা শশা, লাউ, কুমড়া, ফুটি, তরমুজ, ইত্যাদি গাছের কচি পাতা, কচি ফল ও ফুল খাইয়া অনেক ক্ষতি করে। কেরোসিনের আরক ছিটাইয়া ইহার নাশ ও প্রতিকার করা যায়। কিন্তু ভূমির কর্ষণ অনেক দিবস ধরিয়া হইলে এই কীটেরও প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না।

(*h*) এবং (*i*) **চেপ্‌টী-পোকা** ও **ধানগাছের কাঁচ-পোকার** দৌরাত্ম্যও জমির রীতিমত কর্ষণ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়। খেজুর, নারিকেল, প্রভৃতি গাছের পাতা পরিষ্কার ভাবে না বাহির হইয়া যদি ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ ভাবে বাহির হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে গাছের মাজার মধ্যে **মাল-পোকা** আছে। রাত্রি কালে গাছের নিম্নে অগ্নি জ্বালাইলে মাল-পোকা গুলি প্রায় উড়িয়া আসিয়া অগ্নিতে পড়ে। এদেশে কোন কোন স্থানে খোল পচাইয়া হাঁড়িতে করিয়া খেজুর ও নারিকেল গাছের নীচে রাখিয়া মাল-পোকা ধরার নিয়ম আছে। মাল-পোকা খোল খাইতে আসিয়া খোলের জলের মধ্যে পড়িয়া উড়িতে

অক্ষম হওয়া অসম্ভব নহে। কোটরের মধ্যে কেরোসিনের আরক পিচ্‌কারি দ্বারা প্রয়োগ করিলেও মাল্‌-পোকার বংশ মারা যায়।

ফুলে-কাঁচ-পোকা ভিমরুলের ন্যায় বৃহদাকারের কীট। ইহার কঠিন পক্ষ দুই খানিতে পীত ও কৃষ্ণ বর্ণের ডোরা আছে। কুম্‌ড়ার ফুল, অড়হরের ফুল, মেস্তা পাটের ফুল, চীনাবাদামের ফুল, ইত্যাদি নানাজাতীয় ফুলের পাপ্‌ড়ি ও অভ্যন্তরস্থ অংশ সকল খাইয়া এই কীট ফসলের হানি করে। ভাল করিয়া জমি চাষ দিতে পারিলে এবং পর্য্যায়ক্রমে ফসল জন্মাইতে পারিলে এই কীট হইতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। একই ক্ষেত্রে অনেক দিবস ধরিয়া বৃহদাকারের ফুল যুক্ত কোন ফসল জন্মাইলে এই কীট বৃদ্ধি পায়।

গ। প্রজাপতি জাতীয় কীট।—দাড়িম্ব, পেয়ারা, ইত্যাদি কয়েক জাতীয় ফলে এক প্রকার বেগুনে রংএর প্রজাপতি ডিম পাড়িয়া ফলের মধ্যে কীট জন্মাইয়া দেয়। হিংএর ও খয়েরের জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া সেই ন্যাকড়া দ্বারা ফল গুলি বাঁধিয়া দিলে এই পোকা কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। শুদ্ধ ন্যাকড়া বাঁধিয়াও ফলগুলি এই প্রজাপতির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়।

শ্বেতবর্ণ আর এক জাতীয় প্রজাপতি ছোলার কাঁচা ফলের উপর সর্ষপ ও মসিনার কাঁচা ফলের উপর, কপির উপর, ও ইক্ষুর উপর ডিম পাড়িয়া, এই সকল ফসলে পোকা ধরাইয়া দেয়। প্রাট, শন, তিল, রেড়ি, ইত্যাদি গাছের পাতা এক রকম শোঁয়া-পোকাতে খাইয়া যায়। এই শোঁয়া-পোকাও শেষে প্রজাপতি অবস্থায় পরিণত হয়। জমি ভাল করিয়া চাষ দিলে, ও এক জাতীয় ফসল একই স্থানে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর না লাগাইলে, এই সকল প্রজাপতি বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। ক্ষেত্রের চারিদিকে সুলপো-শাক, ধোনে-

শাক ইত্যাদি তীব্র গন্ধ যুক্ত ওষধি লাগাইতে পারিলে ফসলে প্রজাপতির আক্রমণ কম হয়।

ইক্ষুর মাজরা-পোকাও ক্ষুদ্রকায় এক প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হয়। কীট-নাশক কোন একটী পদার্থ কলম লাগাইবার সময় ব্যবহার করিলে ও ইক্ষু ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা সমস্ত জ্বালাইয়া দিলে এই কীট দমনে থাকে। শেঁকো-বিষ, ৮০০ গুণ অন্য পদার্থের সহিত মিলাইয়া কলম লাগাইবার সময় ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ রেড়ির খোল, চূণ, ছাই ইত্যাদি পদার্থ গুঁড়া করিয়া জলের সহিত মিলাই তাহার সহিত ৮০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র শেঁকো-বিষ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া, আকের কলম বা টিকৃলি গুলি এই মিশ্রিত গোলার মধ্যে ডুবাইয়া ডুবাইয়া জমিতে লাগান উচিত।
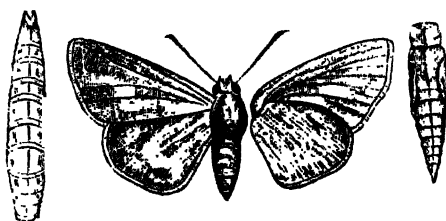
২৬শ চিত্র। ধান গাছের পট্ট-গুপ্ত পোকা।

(কীট, পতঙ্গ ও পুত্তলি অবস্থা।)

ধান-গাছের পট্ট-গুপ্ত পোকাও প্রজাপতির ডিম হইতে উদ্ভুত। ইহা পট্ট, অর্থাৎ রেশমের ন্যায় সূত্র বাহির করিয়া ধানের পাতার মধ্যে জড়িত হইয়া গুপ্ত ভাবে থাকে। ভাল করিয়া অনেক দিবস ধরিয়া জমিতে চাষ দিতে পারিলে এই পোকা দ্বারা ধান গাছের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে না।

চোরা-পোকা আলু গাছ ও আর আর কোমল পল্লব যুক্ত গাছের এবং চারা গাছের বড় ক্ষতি করে। ইহারা দেখিতে প্রায় পলু-পোকা, অর্থাৎ রেশম-পোকার ন্যায়। মাটির মধ্যে এই পোকা মৃত্তিকা ও সূত্রে জড়িত এক প্রকার কোষও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দিবাভাগে কীট বা পতঙ্গ কিছুই দেখা যায় না। রাত্রি হইলে পতঙ্গ গুলি পাতায় ডিম দিয়া যায়, এবং কীট গুলি মাটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া পাতা খায় ও ডাল কাটিয়া দিয়া অযথা ফসল নষ্ট করে। দিবাভাগেও অন্ধকার ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিলে কীট গুলি মাটির মধ্য হইতে ডালে আসিয়া পাতা খাইতে থাকে। গাছের নিম্নে নিম্নে কেরোসিনের আরক পিচ্‌কারি দ্বারা মাটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে এই কীট মরিয়া যায়। অনেক দিবস ধরিয়া ভাল করিয়া জমিতে চাষ দিতে পারিলে এবং পর্য্যায়-ক্রমে ফসল লাগাইতে পারিলে এই কীট দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে না। যে লেধা-পোকা কার্পাস গাছের নিতান্ত ক্ষতি করে, উহাও এক প্রকার চোরা-পোকা। রাত্রি-কালে এই সকল পোকা গাছের উপরে আসিয়া পাতা খায় বলিয়া দম্‌কল দ্বারা কেরোসিনের আরক ব্যবহার রাত্রিযোগে করিলে উপকার অধিক পাওয়া যায়।

কয়েক জাতীয় প্রজাপতি রেশম উৎপন্ন করিয়া মানুষের বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। তুঁত পাতা খাইয়া যে রেশম-কীট গরদ-রেশম উৎপন্ন করিয়া থাকে, উহাকে পলু-পোকা কহে। তসর, এণ্ডি, মুগা ইত্যাদি অন্যান্য কয়েক প্রকারের রেশমও প্রজাপতির কীট হইতে জন্মে।

ঘঁ। দ্বি-পক্ষ মক্ষিকা। মাছি, মশা, ইত্যাদি দ্বি-পক্ষ মক্ষিকা। নাম্‌লা আমের মধ্যে যে এক প্রকার কৃমির ন্যায় শ্বেত কীট দেখিতে

পাওয়া যায় উহা এক জাতীয় দ্বি-পক্ষ মক্ষিকার কীট। কুমড়া, শশা, ইত্যাদি ফল গাছে থাকিয়াই পচিয়া গিয়াছে, এরূপ কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে এই পচা কুমড়া বা শশার মধ্যে সহস্র সহস্র শ্বেত কৃমি রহিয়াছে। এই কৃমিও এক প্রকার দ্বি-পক্ষ মক্ষিকার কীট।

৬। শোষণ কীট।—যে সকল কীট পত্র ও নব পল্লবে ক্ষিপ্রপদে বেড়াইয়া বেড়াইয়া, অথবা স্থির ও নিশ্চল ভাবে থাকিয়া উদ্ভিদের রস শোষণ করিয়া ফসলের ক্ষতি করে, উহাদের শোষণ-কীট বলা যাইতে পারে। গাঁদি-পোকা (২য় চিত্র) এক প্রকার ক্ষিপ্র শোষণ-কীট। যে সকল শোষণ-কীট স্থির ভাবে থাকিয়া উদ্ভিদের রস শোষণ করিয়া থাকে উহাদিগকে জাব-পোকা বলা যাইতে পারে। সর্ষপের, সিমের ও কপির জাব-পোকা, চা-এর জাব-পোকা [২৯শ
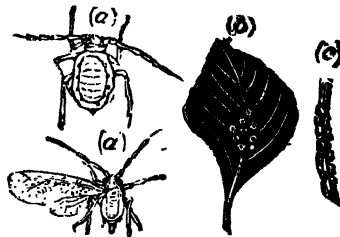
২৭শ চিত্র। জাব-পোকা।

(a) পক্ষহীন স্ত্রী-কীট ও পক্ষ-যুক্ত পুং পতঙ্গ।

(b) (c) স্ত্রী-কীটের স্বাভাবিক আকার ও অবস্থানুভাব।

চিত্র (a) ও (c)], বৃক্ষের জাব-পোকা [২৭শ চিত্র (b)], ইত্যাদি নানা জাতীয় জাব-পোকা উদ্ভিদের নিতান্ত ক্ষতি করিয়া থাকে। ভাল করিয়া চাষ দেওয়া, এবং পূর্ণ পরিমাণে রৌদ্র ও বায়ু লাগা, অধিকাংশ

ফসলের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এ সকলের অভাব হইলে জাব-পোকা প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটিয়া ফসলের ক্ষতি হইয়া থাকে। লাক্ষা-কীট একপ্রকার জাব-পোকা। ইহা বৃক্ষের রস শোষণ করিয়া বৃক্ষের কিছু ক্ষতি করে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা নির্ম্মিত বাসা হইতে লাক্ষা প্রস্তুত হয় বলিয়া, পলাশ, বট, অশ্বথ, গুলার, কুসুম্ব, কুল, অড়হর, ইত্যাদি গাছে আদর করিয়া লোকে এই কীট পালন করে।

চ। অসম-পক্ষ-কীট। পঙ্গপাল, ফড়িং আরশুলা, উই-চিংড়ি, এই সকল কীটের নিম্ন দুইখানি পক্ষ উপরস্থ দুইখানি পক্ষ অপেক্ষা অনেক বড় ও কুঞ্চিত, এ কারণ ইহাদের অসম-পক্ষ-কীটের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়।

২৮শ চিত্র। উই-চিংড়ি।

ধানের ফড়িংএর কথা (১ম চিত্র দেখ) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "গধই" বা গঙ্গা-ফড়িং নামক এক প্রকার ফড়িং চারা গাছের বড় শত্রু। কি নীল, কি কলাই, কি বর্ব্বটী, কি আফিং, কি গোধুম, কি যব, কি মসিনা, কি সর্ষপ, কি তিল, কি বাজ্‌রা, সকল ফসলেরই চারা গাছ খাইয়া গঙ্গা-ফড়িং কৃষকের বিশেষ ক্ষতি করে। কাট্‌-ফড়িং গঙ্গা-ফড়িং অপেক্ষা সরু ও লম্বা। কাট্‌-ফড়িং ধানের চারা-গাছের পরম শত্রু। উই-চিংড়ি, উশ্রং বা ঝিঙ্গুনও চারা গাছের, বিশেষ কপির চারার, মহা শত্রু। ক্ষেত্রে ডুবাইয়া জল-সেচন করিতে পারিলে, অথবা অনবরত কয়েক দিবস ধরিয়া বৃষ্টিপাত

হইলে ফড়িং ও উইচিংড়ি মারা যায়। কিন্তু ভাল করিয়া অনেক দিন ধরিয়া চাষ করা ও ফসল পর্য্যায় অবলম্বন করাই এই সকল শত্রু দমনের প্রধান উপায়। প্রত্যেক বীজ বা কলম যদি তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া, কীট-রোধক চূর্ণে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া লইয়া বপন বা রোপণ করা হয়, তাহা হইলে চারা-অবস্থায় গাছকে কীটে নষ্ট করে না।

ছ। স্নায়ু-পক্ষ-কীট। ঝিঁজি-পোকা বা ঝিঁজি-ফড়িং-এর এবং পক্ষযুক্ত উই-পোকার পক্ষগুলি দেখিলে চারি খানি পক্ষই প্রায় সমানও স্নায়ুর ন্যায় রেখা-যুক্ত দেখা যাইবে। ঝিঁজি-পোকা

২৯শ চিত্র। উই।

(a) মাতৃ-কীট। (d) পুং-পুত্তলিকা।
(b) ক্লীব-কীট। (e) স্ত্রী-পুত্তলিকা।
(c) যোদ্ধৃ-কীট। (f) সপক্ষ উই।
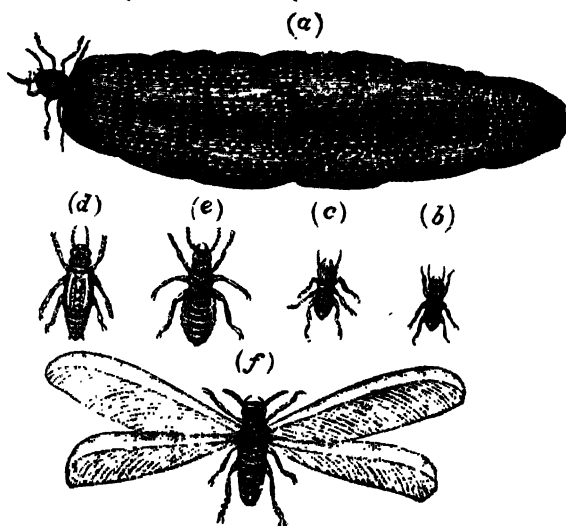
অন্য কীট খাইয়া ফসলের উপকার করিয়া থাকে। ইহাদের কীটাবস্থা জলে অতিবাহিত হয় বলিয়া এ অবস্থাতেও ইহারা ফসলের ক্ষতি করে না।

উই গাছের বড় ক্ষতি করে। আকের কলম, চারা গাছ, ইত্যাদি উই লাগিয়া অনেক নষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষুদ্রকায় উই এত ক্ষতি করিয়া থাকে, উহারা ক্লীব, অর্থাৎ না পুরুষ না স্ত্রী। অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় ও বলবান উইগুলি লড়াই করিয়া অন্য জন্তু হইতে, মাতৃ-উই ও ক্লীব, উই দিগকে রক্ষা করে। পুং ও স্ত্রী উই গুলির পক্ষ হয়, এবং পক্ষ হইয়া উড়িয়া বেড়াইলেই উহারা প্রায় কাকাদি পক্ষী দ্বারা ভক্ষিত হয়। যে দুই একটী স্ত্রী-কীট ভক্ষিত না হইয়া, পক্ষ বিযুক্ত অবস্থায় কোটর মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, সেই দুই একটী স্ত্রী-কীট সহস্র সহস্র ডিম্ব প্রসব করিয়া মাতৃ-কীট রূপে নূতন বাসার কর্ত্তৃ হইয়া রাজত্ব করিতে থাকে। কি ক্লীব-কীট, কি যোদ্ধৃ বা রক্ষক-কীট, কি পুং-কীট, কি স্ত্রী-কীট সকলেই মাতৃকীটের অনুগত। শস্যক্ষেত্র হইতে উই নিবারণেরও প্রধান উপায়, ভূমির আলোড়ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্ষণ। কিঞ্চিৎ সেঁকোবিষ ও চূণ মিশ্রিত রেড়ির খোল চারাগাছের নিম্নে ব্যবহার দ্বারা ও উই নিবারণ হয়।

ধসা। নানা প্রকার আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদণুদ্বারা নানা জাতীয় ধসা রোগ জন্মিয়া থাকে। এই রোগের সাধারণ কারণ ভাল করিয়া চাষ না হওয়া, জমিতে জল বসা, এবং গাছে ভাল রূপে রৌদ্র ও বায়ু না পাওয়া, অর্থাৎ অতি নিকট নিকট গাছ লাগান ও ছায়া স্থানে গাছ লাগান। বিষয়টী নিতান্ত জটিল বলিয়া কেবল দুইটী মাত্র উদাহরণ দ্বারা এস্থলে এই জাতীয় রোগোৎপত্তির কারণ বুঝাইয়া দেওয়া গেলে।

ভুষা-রোগ। জুয়ার, শ্যামা, ইক্ষু, প্রভৃতি গাছের শিষ বাহির হইয়া কখন কখন উহাতে শস্য না জন্মিয়া ভুষার ন্যায় কৃষ্ণ-বর্ণের চূর্ণ পদার্থ জন্মিয়া যাইতে দেখা যায়। এই সকল রোগের সাধারণ নাম ভুষা-রোগ দেওয়া গেল। ভুষার ন্যায় যে চূর্ণ পদার্থ অঙ্গুলীতে সহজে লাগিয়া যায় উহারই এক কণা মাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুন্দর চিত্রিত আণ্ডাকার বীজ সমষ্টি বলিয়া বুঝা যাইবে। এই বীজ সিক্ত স্থানে থাকিয়া পূর্ণাকার, অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার হইয়া, ক্রমশঃ পল্লবিত হইতেছে দেখা যায়। বীজ হইতে নির্গত পল্লবের খণ্ড বিচ্যুত হইয়াও পুনরায় পল্লবিত হয়। এই রূপে আনুবীক্ষণিক বীজ ও আনুবীক্ষণিক পল্লবখণ্ড দ্বারা ভুষা-রোগ ক্রমশঃ সিক্ত মৃত্তিকা হইতে চারা গাছের মধ্যে প্রবেশ করে। গাছের মধ্য দিয়া আণুবীক্ষণিক পল্লবগণ শাখা প্রশাখাতে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ শীষের মধ্য দিয়া উঠিয়া বীজ-বান হয়। এই অবস্থায় ফসলে যেন ভুষা লাগিয়াছে এইরূপ মনে হয়।
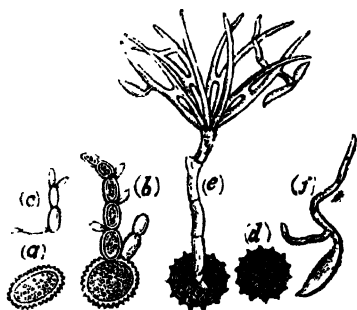
৩০শ চিত্র। ধসা-ধরা।

(*a*) ভুষা-রোগের বীজানু। (*d*) ধানের-গুয়ের বীজনু।
(*b*) ভুষা-রোগের পল্লবিত বীজানু। (*e*) ধানের-গুয়ের পল্লবিত বীজানু।
(*c*) ভুষা-রোগের পল্লবিত পল্লব-খণ্ড। (*f*) ধানের-গুয়ের পল্লবিত পল্লব-খণ্ড।

ধানের-গু ও প্রায় এই জাতীয় রোগ। ধানের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধময় একপ্রকার পদার্থ শীষের মাথায় জন্মিতে দেখা যায়। ইহা সহজে ভুষার ন্যায় অঙ্গুলীতে লাগিয়া যায় না। ধানের-গু জলের সহিত একটু গুলিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় উহা বর্ত্তুলাকার বীজ-সমষ্টি। এই বীজ সিক্ত স্থানে রাখিলে ইহাও পল্লবিত হয়, এবং ইহারও পল্লব-খণ্ড হইতে নূতন পল্লব বাহির হইয়া, দ্বিবিধ রূপে ইহা বর্দ্ধিত হয়, এবং ক্রমশঃ ধান গাছের মধ্য দিয়া উঠিয়া শিষের মধ্যে বীজ-বান হইয়া পুনরায় পরিলক্ষিত হয়।

তুঁতিয়ার জলে অথবা আল্‌কাত্‌রায় বীজ ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ চূণ, ও গুঁড়া খোলে মিশাইয়া বপন করিলে ধসা-রোগের বীজানু মরিয়া যায়। এক ভাগ গুঁড়া তুঁতিয়া ২০০ ভাগ ফুটন্ত জলে মিশ্রিত করিয়া তুঁতিয়ার জল প্রস্তুত করিতে হয়। কেবল বীজের সহিত ধসা-রোগের বীজানু ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে এরূপ কোন কথা নাই। পূর্ব্ব বৎসরে যদি ঐ রোগাক্রান্ত কোন ফসল ঐ জমিতে জন্মিয়া থাকে তবে জমিতেই বীজানু থাকা সম্ভব। ফসল পর্য্যায় অবলম্বন করিয়া, ভাল করিয়া বীজ তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া পরে বপন করিয়া, কার্য্য করিতে পারিলে, ধসা-রোগের বড় ভয় থাকে না। গুঁড়া খোল ও চুণের সহিত $\frac{১}{৮০০}$ ভাগ শেঁকো-বিষ গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া এই মিশ্রিত চূর্ণ-পদার্থে তুঁতিয়ার জলে ডুবান বীজ বা কলম মাথাইয়া লইলে প্রত্যেক বীজ বা কলমের গাত্রে ধসা ও কীট নাশক পদার্থ লাগিয়া যাইবে। ইহা দ্বারা পোকা-লাগা ও ধসা-ধরা দুইই নিবারিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। কি নিয়মে কৃষি-কার্য্য করিলে পোকা লাগিয়া ও ধসা ধরিয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয় না?

২। মৃত্তিকার কর্ষণ দ্বারা পোকা-লাগা ও ধসা-ধরার পক্ষে কিরূপে সুবিধা ঘটে?

৩। কোন্ সময়ে ধান্য ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া আরম্ভ করা উচিত? ইহার ফল কি?

৪। বীজ বা কলমে পোকা বা ধসা-রোগের বীজ থাকিলে উহাকে শোধন করিয়া লইবার উপায় কি?

৫। কীট ও উদ্ভিদণু নাশক বা রোধক কয়েকটী পদার্থের নাম কর। কি পরিমাণে এই সকল পদার্থ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে?

৬। তুঁতিয়ার জল ও শেঁকো-বিষ ব্যবহার সমন্ধে কি কি বিশেষ নিয়ম পালন করা আবশ্যক?

৭। বীজ বা কলম শোধন করিয়া লইয়াও গাছে কখন কখন পোকা লাগে ও ধসা-ধরে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা কিরূপে হইয়া থাকে বল।

৮। রাত্রে মাঠে মধ্যে মধ্যে অগ্নি জ্বালাইতে পারিলে কি উপকার দর্শে? কোন্ কোন্ মাসে অগ্নি জ্বালান দ্বারা উপকার অধিক হয়?

৯। পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য কিরূপে নিবারণ করিতে হয়?

১০। বহুকাল-স্থায়ী কোন ফসলে যদি কীটের বা ধসা-রোগের দৌরাত্ম্য ঘটে তবে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত?

১১। চারা গাছে যদি পোকা লাগে তাহা হইলে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে?

১২। মৃত্তিকার মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া যে সকল পোকা ফসলের ক্ষতি করে উহাদের প্রতিকারের উপায় কি?

১৩। কেরোসিনের ও রেড়ির-তেলের আরক কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়?

১৪। গাছের পাতায় পোকা ধরিলে কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে?

১৫। কীট বা অণু-নাশক পদার্থ প্রয়োগ করিবার জন্য কি কি যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে?

১৬। কুক্কুটাদি পক্ষী দ্বারা কীট খাওয়াইয়া নষ্ট করা কিরূপ ফসলে চলিতে পারে?

১৭। উদ্ভিদণু দ্বারা যে যে রোগ ঘটিয়া থাকে তাহাদের কতকগুলির নাম কর। এই সকল রোগের সাধারণ হেতু নির্দ্দেশ কর।

১৮। উদ্ভিদণু ঘটিত রোগ নিবারণের কয়েকটী সাধারণ উপায় নির্দ্দেশ কর।

১৯। পোকার ডিম ও উদ্ভিদণু বিচ্যুত ফসলের বীজ সংগ্রহ করিবার উপায় কি?

২০। কার্ব্বণ-বাই-সাল্‌ফাইড্‌ কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়?

২১। কীট সকলকে প্রধাণতঃ যে কয়টী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, উহাদের নাম ও উদাহরণ দাও।

২২। চতুঃ-পত্র-মক্ষিকার মধ্যে মানুষের উপকারী ও অপকারী দুই শ্রেণীর কয়েকটী করিয়া কীটের নাম কর।

২৩। কঠিন-পক্ষ-কীটের মধ্যে মানুষের উপকারী ও অপকারী উভয় শ্রেণীর কয়েকটী করিয়া কীটের নাম কর। অপকারী কীট-গুলির দমনের উপায় নির্দ্দেশ কর।

২৪। ধাম্‌সা-পোকার বিবরণ লিখ।

২৫। কোরা-পোকা কিরূপে অপকার করিয়া থাকে? এই পোকা নিবারণের উপায় কি?

২৬। প্রজাপতি জাতীয় কয়েকটী কীটের নাম কর এবং চোরা-পোকার দৌরাত্ম্য কিরূপে নিবারণ করা যায় তাহা বর্ণনা কর।

২৭। কীটের সকল অবস্থা বর্ণনা কর।

২৮। দ্বি-পক্ষ-কীটের মধ্যে ফসলের হানিকারক দুই একটী কীটের নাম কর।

২৯। শোষণ-কীটের মধ্যে মানুষের উপকারী ও অপকারী উভয় শ্রেণীর দুই একটী কীটের নাম কর।

৩০। জাব-পোকা নিবারণের সাধারণ উপায় কি?

৩১। লাক্ষা-কীট কোন্ কোন্ গাছে জন্মান যাইতে পারে?

৩২। অসম-পক্ষ-কীটের কয়েকটী উদাহরণ দাও। ইহাদের মধ্যে যে গুলি ফসলের অনিষ্ট কারক উহাদের দমনের উপায় কি?

৩৩। স্নায়ু-পক্ষ-কীটের কয়েকটী উদাহরণ দিয়া এই শ্রেণীর বিশেষত্ব বুঝাইয়া দাও।

৩৪। ঝিঁঝি-পোকা কিরূপে ফসলের উপকার করিয়া থাকে বুঝাইয়া দাও।

৩৫। উই-পোকার জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর। ইহা দমনে রাখিবার কয়েকটী উপায় বর্ণনা কর।

৩৬। ধসা-ধরা রোগ কিরূপে ঘটিয়া থাকে উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

নবম অধ্যায়।

খোল বা খৈল।

খোসা-ছাড়ান বীজের খোল।—তৈল-প্রদ বীজ সকলকে ঘানি দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে পেষণ করিয়া উহাদের তৈল ভাগ বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাকে খোল বা খৈল কহে। রেড়ি, কার্পাস প্রভৃতি কয়েক প্রকার তৈল-প্রদ বীজের উপরি ভাগের খোলা বা কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া, কুলা দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, আভ্যন্তরীণ শস্য হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যায় এবং তৈল বাহির করিয়া লইবার পরে যে খোলভাগ অবশিষ্ট থাকে উহাও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ খোল। কার্পাসের বীজের খোলা বাদ দিয়া তৈল প্রস্তুত করিবার পরে যে খোল পাওয়া যায় গবাদি জন্তুর পক্ষে উহার ন্যায় তেজস্কর খাদ্য আর কিছুই নাই। গবাদি জন্তুকে যদি কোন তেজস্কর খাদ্য খাওয়াইতে হয়, তাহা হইলে আমরা প্রায় এই কয়েকটি সামগ্রীর কোনটী খাইতে দিয়া থাকি ঃ—সর্ষপ খোল, তিসির খোল, মটর ও গমের ভুসি। জন্তুদিগের আহারার্থ যে উপাদানটী সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর, অর্থাৎ, রক্ত মাংস গঠনে সমর্থ, ঐ উপাদানটীকে আল্‌বুমিনয়েড্‌ কহে। জমির সারের জন্যও আল্‌বুমিনয়েড্‌ বিশেষ উপকারক। আর দুইটী তেজস্কর উপাদানের নাম অস্থিসার ও পটাশ্‌। এক টন্‌, অর্থাৎ, ২৭৯ মন, খোসা ছাড়ান কার্পাস বীজের

খোলে, কত আল্‌বুমিনয়েড্‌, কত অস্থি-সার, এবং কত পটাশ্‌ আছে, এবং এক এক টন্‌ সর্ষপ খোল, তিসির খোল, মটর ও গমের ভুসিতে, কত করিয়া, এই তিনটী উপাদান আছে, নিম্ন দত্ত তালিকা দ্বারা ইহা জানা যাইবে :—

	২৭$\frac{১}{৫}$ মনে (অর্থাৎ ১ টনে) কত		
	অল্‌বুমিনয়েড্‌।	অস্থি-সার।	পটাশ্‌।
খোসা ছাড়ান কার্পাস বীজের খোল	১১ মন ৯ সের।	৩৪ সের।	২১$\frac{১}{২}$ সের।
সর্ষপ খোল······	৮ মণ ১৩ সের।	২৭ সের।	১৬ সের।
তিসির খোল...	৮ মণ ৩ সের।	২১$\frac{১}{৪}$ সের।	১৫ সের।
মটর...	৬ মণ ৫ সের।	৯ সের।	১০ সের।
গমের ভুসি...	৪ মণ ১০ সের।	৩৯ সের।	১৫$\frac{১}{২}$ সের।

খোসা ছাড়ান কার্পাসের খোল্ যে সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর খাদ্য ইহা উপরিদত্ত তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে। কোন কোন জেলায় এদেশের লোক কার্পাসের বীজ গোরুকে খাইতে দিয়া থাকে, কিন্তু বীজের খোসা ছাড়াইয়া উহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইয়া খোল রূপে এই বীজের ব্যবহার এ দেশে কুত্রাপি প্রচলিত নাই। কার্পাসের বীজের এবং রেড়ির বীজের খোসার মধ্যেও অনেক সারবান পদার্থ, অর্থাৎ, অস্থি-সার, পটাশ ও চুণ, আছে। কিন্তু আহারের জন্য খোসা কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে, কেন না ইহা সহজে পরিপাক করা যায় না এবং ইহা হইতে উদরাময় রোগ হওয়া সম্ভব। জমির সারের জন্যও ব্যবহার করিতে হইলে এই দুই প্রকার খোসা জ্বালাইয়া ক্ষারে পরিণত করিয়া ব্যবহার করা উচিত, কেননা খোসা অবস্থায় ইহারা সহজে পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় না।

সারের তারতম্য।—সকল প্রকার খোল জমির সারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সকল প্রকার খোল জন্তুদিগের খাইতে দেওয়া যায় না। রেড়ির খোলে, মহুয়ার খোলে, নিমের খোলে এবং চা-বীজের খোলে, বিশেষ বিশেষ বিষাক্ত পদার্থ থাকিবার কারণ, এগুলি অখাদ্য। আবার সকল খোল সারের জন্যও সমান উপকারী নহে। রেড়ির খোল, কার্পাসের খোল, সর্ষপ খোল, পোস্ত-দানার খোল, কুসুমের খোল, তিসির খোল, তিলের খোল, চীনার-বাদামের খোল, সোর-গোঁজার খোল, নারিকেলের খোল ও নিমের খোল জমির পক্ষে শ্রেষ্ঠ সার। মহুয়ার খোল ও চা-বীজের খোল যদি যৎসামান্য দরে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তবেই সাররূপে ইহাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনেক বীজ আছে যে সকল হইতে তৈল বাহির হয় না, কিন্তু যে সকল স্থানে স্থানে ভূরি পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। ঐ সকলকে গুঁড়াইয়া বা পচাইয়া সাররূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উদাহরণ স্থলে, তেঁতুলের বীজ, লিচুর বীজ, কালকাসুন্দের বীজ, ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। জমির সার সম্বন্ধে একটী সাধারণ নিয়ম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। জান্তব পদার্থ সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার। রক্ত, মাংস, অস্থি, শামুক, রেশম-কারখানার আবর্জ্জনা ইত্যাদি যত উত্তম সার, কাষ্ঠ, পত্র, ফুল ও বীজ তত শ্রেষ্ঠ সার নহে। কাষ্ঠ (যথা, করাতের গুঁড়া) অতি নিকৃষ্ট সার; কিন্তু শাখা প্রশাখা জ্বালাইয়া ক্ষার করিয়া অপেক্ষাকৃত উত্তম সার পাওয়া যায়। পচা পাতা, এবং শাখা-প্রশাখা ক্ষার অপেক্ষা উত্তম সার। ফুল পাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার এবং বীজ ফুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার; তবে সকল ডাল, পালা, ক্ষার, পাতা, ফুল ও বীজ সমান তেজস্কর সার নহে। আগাছাতে ফুল ধরিলে ঐ গুলি কাটিয়া সারের

গাদায় ফেলিয়া রাখা উচিত। ফুল ধরিবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ নিতান্ত চারা-অবস্থায়, ঘাস অথবা অন্য কোন গাছ গবাদি জন্তুর আহারের জন্য ব্যবহার করিলে তাদৃশ উপকার দর্শে না। বীজের মধ্যে যে সকল বীজ সুঁটির মধ্যে জন্মে, ঐ সকল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যথা সিম, কলাই, কালকাসুন্দিয়া, বাব্‌লা, ইত্যাদি। এই সকল বীজ গুঁড়া করিয়া বা পচাইয়া ব্যবহার করা ঠিক্ খোল্ ব্যবহারের সমান না হইলেও ইহা দ্বারা জমির বিশেষ উপকার দর্শে। গোবর-সার অপেক্ষা বীজের গুঁড়া বা পচা বীজ অনেক শ্রেষ্ঠ সার।

অসাক্ষাৎ সার-প্রয়োগ।—যে সকল খোল গবাদি জন্তুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে, ঐ সকল খোল জমিতে সাররূপে ব্যবহার না করিয়া, জন্তুদের খাইতে দিয়া, ঐ জন্তু সকল জমিতে বাঁধিয়া রাখিয়া অথবা উহাদের মল-মূত্র জমিতে প্রয়োগ করিয়া ব্যবহার করিলে দ্বিবিধ উপকার সাধিত হয়। এইরূপ অসাক্ষাৎ সার প্রয়োগে ব্যয় কম হয়, অথচ গবাদি জন্তু বলিষ্ঠ ও জমি সারবান হয়। গোরুর পাকস্থলী ও অন্ত্র দিয়া আহার সামগ্রী সকল চালিত হইয়া মল-মূত্র আকারে পরিণত হওয়াতে অতি সামান্য পরিমাণ সার-ভাগ গোরুর শরীরের মধ্যে সঞ্চিত হয়। অধিকাংশ সারভাগই মল-মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া মৃত্তিকাকে সারবান করিয়া তুলে। নিকৃষ্ট আহার পাইয়া জন্তুগণ যে মল-মূত্র ত্যাগ করে উহা নিকৃষ্ট, অর্থাৎ, এলবুমিনয়েড্ ও অস্থিসারে অপেক্ষাকৃত হীন। তেজস্কর সামগ্রী খাইয়া জন্তুগণ যে মল-মূত্র ত্যাগ করে উহা এলবুমিনয়েড্ ও অস্থি-সার-পূর্ণ। তেজস্কর সামগ্রী আহার করিয়া কেবল জন্তুগণ বলিষ্ঠ ও অধিক কার্য্যক্ষম হয় এরূপ নহে, এই সকল সামগ্রীর আহার দ্বারা গৌণভাবে ক্ষেত্রের মৃত্তিকাও সারবান হইয়া থাকে। যত প্রকার

সামগ্রী জন্তুগণ আহার করিয়া থাকে তন্মধ্যে খোল সর্ব্বাপেক্ষা সারবাণ পদার্থ; যত প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ সাধরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে তন্মধ্যে খোল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার।

জন্তুদের আহারের জন্য সর্ষপ খোল, তিসির খোল, কার্পাস বীজের খোল, নারিকেলের খোল, কুসুমের খোল, ও সোর-গোঁজার খোল ব্যবহার করিতে পারা যায়। প্রত্যহ এক হইতে পাঁচ সের পর্য্যন্ত খোল ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্রকায় গোরুকে দুই তিন সেরের অধিক খোল খাইতে দেওয়া উচিত নহে। বৃহদাকারের গোরু অথবা মহিষকে দুই বারে পাঁচ সের পর্য্যন্ত খোল দেওয়া যাইতে পারে। যখন জন্তুগণকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় অথবা যখন উহারা দুগ্ধ দেয় তখন উহাদের খোল দিতে হয়। যখন উহারা পরিশ্রম করে না অথবা দুগ্ধ দেয় না তখন খোল এক কালীন বন্ধ রাখা অথবা অতি সামান্য পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। বাছুরকে খোল খাইতে দিলে উহারা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায় এবং বিশেষ বলিষ্ঠ হয়। খোল জলে দুই এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে বিচালি বা ঘাসের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। বাছুরকে ঘোলের সহিত খোল মিশাইয়া খাইতে দিলে উহারা আরও অধিক বলিষ্ঠ হয়।

সারের জন্য বিঘা প্রতি দুই হইতে দশ মণ পর্য্যন্ত খোল ব্যবহার করা উচিত। আলু, কপি ও ইক্ষুর জন্য দশ-বার মণ পর্য্যন্ত খোল ব্যবহার করা যাইতে পারে। কপি প্রভৃতির চারা ভাল করিয়া জমিতে লাগিয়া গেলে এবং কিছু বলিষ্ঠ হইলে পরে উহাদের গোড়ার মাটী আল্গা করিয়া দিয়া গুঁড়া খোল মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। চারা যখন নিতান্ত ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র থাকে তখন খোল প্রয়োগ দ্বারা চারা

গুলি কখন কখন জ্বলিয়া, অর্থাৎ মরিয়া যায়। ধান্যে খোল-সার ব্যবহার করিতে হইলে বিঘা প্রতি ২।৩ মণ ব্যবহার করা উচিত। তামাকের জন্য কার্পাস-বীজের খোল, অথবা পুরাতন পচা কার্পাসের বীজের গুড়াঁ. সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার।

কীট-রোধক সার।—রেড়ির খোল ও সর্ষপ খোলের গন্ধ ও স্বাদ তীব্র বলিয়া, গোধুম, ইক্ষু, আলু ইত্যাদি ফসলের বীজ বা কলম বপন করিবার বা বসাইবার সময় এই দুই খোল ব্যবহার করিলে বীজে বা কলমে উই প্রভৃতির কীট লাগে না। মহুয়া ও নিমের খোল তিক্ত বলিয়া ইহারাও কীট-রোধক সার। কীট-রোধক সারের সহিত কীট-নাশক শেঁকো-বিষও ব্যবহার করা উচিত।

নবম অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। খোসা ছাড়ান কার্পাস ও রেড়ির বীজের খোল ও আস্ত কার্পাস ও রেড়ির বীজের খোল এই চারি সামগ্রীর গুণাগুণের প্রভেদ নির্দ্দেশ কর।

২। গবাদি জন্তুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর খাদ্য গুলি ক্রমিক নিয়মে উল্লেখ কর।

৩। কার্পাস বীজের খোলা ও রেড়ির বীজের খোলা সার রূপে ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায় কি না?

৪। যে খোল গুলি কেবল সারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাদের নাম কর।

৫। যে খোল গুলি জন্তুদের খাইতে দেওয়া চলে সে গুলির সার রূপে ব্যবহার সম্বন্ধে কি নিয়ম পালন করা উচিত?

৬। মহুয়ার খোল ও চা-বীজের খোল সারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না?

৮। বীজ, ফুল, পত্র, পল্লব, করাতের গুঁড়া, রক্ত, মাংস, জন্তুর অস্থি, শামুক, রেশম-কুঠির আবর্জ্জনা, এই সকল সামগ্রী খোলের সহিত তুলনায় কিরূপ সার ?

৯। আগাছা সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে কি নিয়মে ব্যবহার করা উচিত

১০। কোন্ জন্তুকে কি পরিমাণে খোল খাইতে দেওয়া উচিত তাহার একটী আভাস দেও।

১১। কোন্ ফসলে কি পরিমাণ কোন্ সময়ে খোল-সার প্রয়োগ করিতে হয় তাহার একটী বিবরণ লিখ।

১২। কীট-রোধক সার কাহাকে কহে ?

তৃতীয় ভাগ।

সরল কৃষি-বিজ্ঞান।

[ছাত্রবৃত্তি পরিক্ষার উপযোগী।]

দশম অধ্যায়।

উর্ব্বরতা।

প্রথম নিদর্শন।—উদ্ভিদ-পদার্থ যে সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা গঠিত, বৃষ্টির জল ও আকাশের বায়ু উহাদের অধিকাংশেরই উৎপত্তি-স্থল। মৃত্তিকা হইতে যে কয়েকটী উপাদান গৃহীত হয়, ঐ সকলের পরিমাণ অতি সামান্য; একারণ, সাধারণতঃ, ধান, পাট প্রভৃতি যে সকল শস্য কৃষকগণ বিনা-সারে জন্মাইয়া থাকে, ঐ সকল উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলেই সুন্দর জন্মে। যে সকল ক্ষেত্রে কৃষকগণ বিনা-সারে, ভুট্টা, গোধুম, আলু ও ইক্ষু জন্মাইয়া থাকে, ঐ সকলের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ উর্ব্বর বলিয়া জানা উচিত। যে সকল ক্ষেত্রে কৃষকেরা কেবল মাত্র জুয়ার, বাজরা, সোরগোঁজা, মেস্তা-পাট, ধান ও পাট জন্মাইয়া থাকে ঐ সকলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হওয়া সম্ভব, কেন না এই সকল ফসল মৃত্তিকার উৎকর্ষতার উপর তাদৃশ

নির্ভর না করিয়া, বৃষ্টি ও বায়ুর উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকে। কোন একটী ভূভাগ উর্ব্বর কি না ইহা স্থির করিতে হইলে কৃষকেরা যে সকল ফসল উহাদের ক্ষেত্রে জন্মাইয়া থাকে, এই বিষয়ে প্রথমে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিনা-সারে যে সকল ফসল সাধারণতঃ ভাল জন্মে না, সেই সকল ফসল যে ভূভাগে বিনা-সারে কৃষকগণ জন্মাইয়া থাকে সেই ভূভাগ নিশ্চয় উর্ব্বর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

দ্বিতীয় নিদর্শন।—মৃত্তিকার উর্ব্বরতা স্থির করিবার দ্বিতীয় উপায় পতিত জমির প্রতি লক্ষ্য করা। যে ভূভাগের পতিত জমি সকলে নানাবিধ জঙ্গল, উচ্চ ও ঘন হইয়া জন্মিয়া থাকে, সেই ভূভাগ উর্ব্বর বলিয়া স্থির করা উচিত। কোন কোন বালুকাময় জমিতে উচ্চ ও ঘন হইয়া কেবল বন-ঝাউ অথবা শর গাছ জন্মিয়া থাকে; এ সকল জমি উর্ব্বর বলিয়া গণ্য নহে। কোন কোন গাছ নিতান্ত নিস্তেজ বা অনুর্ব্বর জমিতে উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে, এ সকল গাছ উর্ব্বরতার নিদর্শন হইতে পারে না। নানাজাতীয় আগাছা যে স্থানে সতেজে জন্মিয়া থাকে সেই স্থানই উর্ব্বর। এই সকল আগাছার মধ্যে অনেক গুলি সুঁটি-প্রদ উদ্ভিদ্ জাতীয়ের অন্তর্গত হইলে ঐ জমি বিশেষ উর্ব্বর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাল্‌কাসুন্দিয়া, হেকুটী, চূনা-কলাই, বাব্‌লা, ধইঞ্চা, জয়িন্তি, ইত্যাদি সুঁটি-প্রদ উদ্ভিদ্ জাতীয়ের অন্তর্গত।

তৃতীয় নিদর্শন।—জমির উর্ব্বরতা স্থির করিবার আর একটী সহজ উপায় জীব-জন্তুদিগের আকার ও পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখা। যে মৃত্তিকা কীট-পতঙ্গ পূর্ণ, যে মৃত্তিকা শামুক ও অস্থি-কঙ্কাল সঙ্কুল, যে স্থলের ভেক প্রভৃতি বন্য জীব গুলি হৃষ্ট-পুষ্ট ও সংখ্যায় প্রচুর, যে স্থলের মানুষ ও গবাদি জন্তু স্থূলকায়, দীর্ঘ, ও স্থূল অস্থি-যুক্ত, সেই

মৃত্তিকা, সেই স্থল, উর্ব্বর বলিয়া গণ্য করা উচিত। যে মাটির মধ্যে অনেক কেঁচো দেখিতে পাওয়া যায় উহা অতি সুন্দর মাটি। কেঁচো তিন চারি হাত পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া থাকে। কেঁচোর মাটি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর এবং কেঁচো দ্বারা জমি ওলট্ পালট্ও হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিম্নের মৃত্তিকা উপরি ভাগে আসিয়া এবং উপরের মৃত্তিকা নিম্নে যাইয়া থাকে। জমিতে যত কেঁচো থাকে ততই ভাল।

চতুর্থ নিদর্শন।—যে মৃত্তিকার বর্ণ কৃষ্ণ বা পীত এবং যাহা শীত কালেও লাঙ্গল করিতে পারা যায় এরূপ লঘু, উহা প্রায় উর্ব্বর হইয়া থাকে। শ্বেত, ধূসর ও অত্যধিক লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা এবং যে মৃত্তিকার মধ্যে বৃষ্টি পাত না হইলে লাঙ্গল চলে না, উহা বড় উর্ব্বর হয় না। যে মৃত্তিকা বৃষ্টিপাতে ধৌত হইয়া সহজে স্থানান্তরিত হইয়া যায়, উহাও শস্য জন্মাইবার পক্ষে উপযুক্ত নহে। যে মৃত্তিকা হইতে অতি সত্বর জল নামিয়া যায়, অথবা যে মৃত্তিকার উপরে জল অনেক দিবস দাঁড়াইয়া থাকে, এই উভয় প্রকার মৃত্তিকাই সাধারণ কৃষিকার্য্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। নিতান্ত লঘু জমিতে সর্ষপ, তরমুজ, ফুটি, পটল, চীনার বাদাম, ইত্যাদি ফসল ভাল জন্মিতে পারে, নিতান্ত কঠিন জমিতে ধান, ইক্ষু ও পাট ভাল জন্মিতে পারে, কিন্তু সাধারণ কৃষিকার্য্যের জন্য দো-আঁশ জমিই ভাল। নিতান্ত কঠিন মৃত্তিকা ("টান্ মাটি") রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা উর্ব্বর বলিয়া স্থির হইতে পারে, কিন্তু কার্য্য স্থলে এরূপ মৃত্তিকার উপর বৃক্ষ অথবা ঘাস মাত্র জন্মান উচিত। অগ্রহায়ণ হইতে বেশাখ মাস পর্য্যন্ত এরূপ মৃত্তিকায় ঘাসও ভাল জন্মে না।

জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার উপায়। (১) সার ব্যবহার করা; (২) অড়হর, শন, নীল, ধইঞ্চা, কলাই, ইত্যাদি সুঁটি-প্রদ, অর্থাৎ কলাই জাতীয়, উদ্ভিদ্ মধ্যে মধ্যে জন্মান; (৩) পর্য্যায়-ক্রমে

ফসল লাগান, অর্থাৎ একই জমির উপর ক্রমাগত একই ফসল না লাগাইয়া, পাঁচ, ছয় অথবা ততোধীক প্রকার ফসল জমি ভাগ করিয়া লাগাইয়া, ক্রমান্বয়ে সকল জমি গুলিতেই ঐ সকল ফসল লাগাইয়া তিন চারি বা পাঁচ বৎসর অন্তর এক এক জমি খণ্ডে একটী করিয়া ফসল লাগান; (৪) সহরের বা খালের ময়লা জল অথবা অন্য কোন সারবান জল জমিতে সেচন করা; (৫) জমির পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগ প্রতি বৎসর ক্রমান্বয়ে পতিত ফেলিয়া রাখিয়া, ঐ পতিত জমির উপর গবাদি জন্তু রাখিয়া উহাদের ভাল করিয়া খোল খাওয়ান; (৬) জমির চতুস্পার্শ্বে বাব্‌লা ইত্যাদি সুঁটি-প্রদ গাছ লাগান; (৭) শীত-কালে জমি মধ্যে মধ্যে চাষ দিয়া ফেলিয়া রাখা, এবং (৮) পুষ্করিণী, কূপ, নালা প্রভৃতি প্রতি বৎসর পঙ্কোদ্ধার করিয়া ঐ পঙ্ক চৈত্র-বৈশাখ মাসে জমিতে ছিটাইয়া দিয়া পরে চাষ ও বীজ বপনের বন্দোবস্ত করা।

অনুর্ব্বরতা।—নানা কারণে জমি অনুর্ব্বর হইতে পারে। (১) যে জমি সমতল নহে উহা হইতে মৃত্তিকার সহিত অঙ্কুরিত বীজ সকল ধৌত হইয়া গিয়া ফসল জন্মিবার ব্যঘাত ঘটে। পর্ব্বতের উপরিস্থিত জমি চাষ করিতে হইলে, উহাকে থাকে থাকে সমতল করিয়া লইয়া পরে ফসল জন্মাইতে হয়। ভুট্টা, প্রভৃতি যে সকল ফসল বর্ষা পড়িবার দুই এক মাস পুর্ব্বে লাগান হয় ঐ সকল বন্ধুর জমিতেও জন্মিয়া থাকে। (২) যে জমির উপরিভাগ নিতান্ত কঠিন ও জমাট উহাতে ঘাস পর্য্যন্ত ভাল জন্মে না। এরূপ জমিতে মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত করিয়া গাছ লাগাইলে সুবিধা আছে। (৩) কোন কোন জমির মধ্যে লবণ বা অন্য কোন গলনশীল পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকাতে উহাতে ফসল জন্মে না। এমন উষর জমিতে নালা কাটিয়া দিয়া উহা হইতে বৃষ্টির জলের সহিত গলিত পদার্থ সকল ধৌত হইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দিয়া পরে

উহাতে ফসল লাগান চলে। (৪) কোন কোন জমি নিতান্ত বালুকা-ময়। এই সকল জমিতে স্বভাবতঃ বন-ঝাউ ইত্যাদি গাছ জন্মিয়া ক্রমশঃ ইহাতে জৈবিক পদার্থ জমিয়া গিয়া ফসল জন্মিবার উপযুক্ত হয়। এই সকল জমিতে ধইঞ্চা, চীনাবাদাম প্রভৃতি কলাই জাতীয় ফসল জন্মাইয়া কৃত্রিম উপায়ে সত্বর ইহাদিগকে উর্ব্বর করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এক কালীন অনুর্ব্বর জমি, অর্থাৎ যে জমিতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারা যায় না এরূপ জমি প্রায় নাই।

দশম অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। মৃত্তিকার উর্ব্বরতা কিসের উপর নির্ভর করে?

২। কোন্ জমি স্বভাবতঃ কিরূপ উর্ব্বর ইহা জানিবার উপায় কি?

৩। পতিত জমি অথবা জঙ্গলময় স্থান দেখিয়া কেমন করিয়া বুঝিব ঐ জমির মৃত্তিকা উর্ব্বর কি না?

৪। মৃত্তিকার বং দেখিয়া কতদূর উহার উর্ব্বরতা বুঝিতে পারা পারা যায়?

৫। নিতান্ত কঠিন বা নিতান্ত লঘু জমি কি কি কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে?

৬। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার কয়েকটী উপায় বল।

৭। অনুর্ব্বর জমি কাহাকে কহে? অনুর্ব্বর ও উষর জমিকে উর্ব্বর করিবার উপায় কি?

একাদশ অধ্যায়।

অড়হর ও ধইঞ্চা।

মূল-গণ্ডের সারবত্তা।—সুঁটি-প্রদ যে কোন গাছ হউক না কেন, শিকড় শুদ্ধ মাটি হইতে উঠাইলে, উহাদের মূলে কতকগুলি গণ্ড বা স্ফোটক দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ফোটক বা গণ্ড পরিষ্কার জল দ্বারা ধৌত করিয়া যদি পেষণ করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় উহার মধ্য হইতে পিচ্ছিল এক প্রকার রস নির্গত হইয়াছে। ঐ রস অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ, চঞ্চল, সহস্র সহস্র জীবিত উদ্ভিদণু দ্বারা ঐ রস গঠিত। এই সকল উদ্ভিদণু অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, অড়হর, ধনিচা বা ধইঞ্চা, চীনাবাদাম শন, নীল কলাই, প্রভৃতি গাছের শিকড়ে সংলগ্ন হইয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া যায়,এবং যেমন সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে অমনই শিকড়ের গাত্রে স্ফোটক জন্মিয়া গিয়া ঐ স্ফোটকের মধ্যগত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। এই সকল ক্ষুদ্র উদ্ভিদের একটা বিশেষ ক্ষমতা এই, ইহারা বয়ু হইতে সারবান পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। যে সকল মৃত্তিকাতে চুণের পরিমাণ কিছু অধিক, ঐ সকল মৃত্তিকাতে উদ্ভিদণু দ্বারা সারবান পদার্থ অতি সহজে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ কারণ নিতান্ত অসার জমিতেও যদি চুণের পরিমাণ অধিক থাকে, তাহা হইলে উহাতে ডাইল, কলাই, নীল, ধইঞ্চা, বাব্‌লা, প্রভৃতি সুঁটি-প্রদ উদ্ভিদ অতি সুন্দর জন্মে। এবং

এইরূপ জমিতে এই সকল ফসল জন্মাইলে জমিও সারবান হইয়া থাকে।
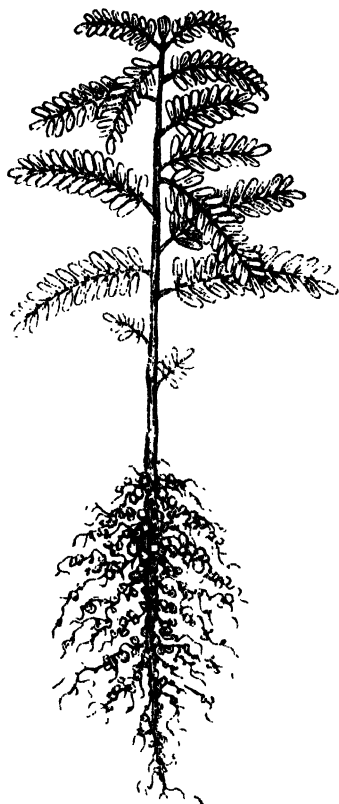
৩১শ চিত্র। ধইঞ্চা গাছ।

গণ্ডের পরিমাণ।—সুঁটি-প্রদ সকল উদ্ভিদের মূলে সমান পরিমাণ গণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না।—কোন প্রকার উদ্ভিদের মূলে বা অধিক, কোন প্রকার উদ্ভিদের মূলে বা অল্প সংখ্যা গণ্ড দেখিতে

পাওয়া যায়। সুঁটি-প্রদ উদ্ভিদ্ ভিন্ন অন্য কোন কোন প্রকার উদ্ভিদের মূলেও উদ্ভিদণু-জাত গণ্ড দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, ধইঞ্চা, শন ও অড়হরের মূলে গণ্ডের সংখ্যা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অসার জমিকে সারবান করিতে হইলে ইহাদেরই মধ্যে একটী ফসল জন্মান উচিত। ধনিচা ও অড়হরের শিকড় জমির মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করে বলিয়া, জমির নিম্ন-স্তর পর্য্যন্ত এই দুইটী ফসল দ্বারা উর্ব্বরতা লাভ করে। এই দুই গাছের পত্রও জমিতে ভূরি পরিমাণে পতিত হইয়া জমিকে আরও সারবান করিয়া তুলে।

চাষের নিয়ম।—ধইঞ্চা ও অড়হরের বীজ একই সময় লাগাইতে হয়। চৈত্র-বৈশাখই বীজ লাগাইবার প্রশস্ত সময়। ধইঞ্চা আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া পাকিয়া যায়। অড়হর ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্য্যন্ত জমি অধিকার করিয়া থাকে, তবে মাঘী অড়হর দুই এক মাস পূর্ব্বে পাকিয়া যায়। ধইঞ্চা কাটিয়া অনায়াসে জমিতে চাষ দিয়া আলু লাগান চলে, এবং আলু উঠাইয়া ভুট্টা বা ইক্ষু ঐ একই জমিতে লাগান চলে। অড়হর প্রায় সম্বৎসর জমি অধিকার করিয়া থাকে বলিয়া নিস্তেজ জমি ভিন্ন ভাল জমিতে অড়হর লাগাইয়া লাভ নাই। ধইঞ্চা ভাল জমিতেও লাগান যাইতে পারে। কেন না, ইহা উঠাইবার পরে দুইটী বহুমূল্য ফসল লাগাইবার বিশেষ সুবিধা হয়, এবং সারবান জমি আরও সারবান হওয়াতে বিনা সারেও ধইঞ্চার পরে আলু উত্তম ফলিয়া থাকে। ধইঞ্চা-মূলে জল আটকাইবার কারণ নষ্ট হইয়া যায় না,—অবরুদ্ধ জল দ্বারা অড়হরের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বর্ষা পাড়িয়া গেলে অড়হরের বীজ বপন করিলে ফল ভাল হয় না; ধইঞ্চার বীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে

ভুট্টা উঠিয়া গেলে, জমিতে যে সে রকমে দুই এক চাষ দিয়া ছিটাইয়া দিলে ভাদ্র-আশ্বিণ মাসে ধইঞ্চা গাছ গুলি তিন চারি হাত লম্বা হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় ধইঞ্চা গাছ গুলি কাটিয়া গোরুকে খাইতে দিলে, অথবা ধইঞ্চার জমিতে গোরু বাঁধিয়া দিয়া পরে চষিয়া লইলে, বিশেষ উপকার দর্শে। ঘাস অপেক্ষা সুঁটি-প্রদ গাছ চতুর্গুণ বলকারক। এ কারণ দুগ্ধবতী গাভী ধইঞ্চা গাছ খাইয়া অতি সুন্দর দুগ্ধ দান করিয়া থাকে। ধইঞ্চা গাছ অতি সত্বর বাড়িয়া যায়; চারি মাসের মধ্যে কখন কখন দশ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে; ইহা গবাদি জন্তুর পক্ষে অতি বলকারক খাদ্য, এবং ইহার শিকড়ে সারবান পদার্থ সঞ্চিত হয়, এই কয়েক কারণে ধইঞ্চা গাছ সাধারণ কৃষিজাত গাছের মধ্যে গণ্য হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। সকল কৃষকেরই এই গাছ জন্মাইবার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

ধইঞ্চার কাঠি ও আঁশ।—সাধারণতঃ, ধইঞ্চা গাছের ডাঁটা গুলি জলে পচাইয়া উহা হইতে এক প্রকার আঁশ বাহির করা নিয়ম আছে, এবং কাঠি গুলি পানের বরোজে ব্যবহার করারও নিয়ম প্রচলিত আছে। জমি সারবান করিবার জন্য এই গাছ লাগান হইলে জমিতে গাছ গুলি কাটিয়া, উহাদের পাতা ও ফলগুলি জমিতে ঝরিয়া গেলে, কাঠি গুলি বারুইদের নিকট বিক্রয় করা যাইতে পারে। এক এক পণ কাঠি এক একটী আঁঠি করিয়া বাঁধিয়া লইয়া, দুই হইতে চারি টাকা কাহন দরে কাঠি বিক্রয় করিতে পারা যায়। গোরুর আহারের জন্য এই গাছ জন্মানর নিয়ম কুত্রাপি প্রচলিত নাই।

অড়হর চাষ।—অড়হর দুই জাতীয়,—মাঘী ও চৈতালী। একই সময়ে দুই প্রকার অড়হরের বীজ লাগাইলে এক প্রকার মাঘ মাসে কাটিবার উপযুক্ত হয়, অন্য প্রকার চৈত্র মাসে কাটিবার উপযুক্ত

হয়। দুই প্রকার অড়হরই দেখিতে একই রকম। মোটের উপর চৈতালী অড়হরের দানা কিছু বড় হয় এবং ফলে অধিক। ইহার দানাও অনেক দিবস গুদামে থাকিয়াও নষ্ট হয় না, মাঘী অড়হর বিবর্ণ হইয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে কীট-দষ্ট হইয়া নষ্ট হয়।

পিষ্ট-উদ্ভিজ্জ।—ফুল হইলেই অড়হর গাছগুলি কাটিয়া একটা পাকা গর্ত্তের মধ্যে চাপ দিয়া রাখিতে পারিলে, উহা হইতে গবাদির আহার্য্য সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এই সামগ্রীর নাম সাইলেজ, বা পিষ্ট-উদ্ভিজ্জ। ভুট্টার গাছ, জুয়ার গাছ, অড়হর গাছ, ইত্যাদি গাছকে কলের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইয়া অথবা আস্ত, সময় অতিবাহিত না করিয়া, প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত গর্ত্ত বা গুহার মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিলে, ছয় মাস পরে হউক, এক বৎসর পরে হউক, গর্ত্ত বা গুহার মধ্য হইতে ঐ পিষ্ট উদ্ভিজ্জ বাহির করিয়া গবাদি জন্তুকে খাইতে দিলে, উহারা হৃষ্টচিত্তে উহা খাইয়া থাকে। অড়হর প্রভৃতি গাছ বর্ষা কালে অতি সতেজে জন্মিয়া থাকে। এই কালে গবাদি জন্তুর আহারার্থ ঘাসের অভাব থাকে না। এই সময়ে যদি জন্তু দিগের আহারের উপযোগী অতিরিক্ত ঘাস ও অন্যান্য গাছ পিষ্ট-উদ্ভিজ্জ আকারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে জন্তুগণ পুষ্টিকর ও পর্য্যাপ্ত আহার পাইয়া বাঁচিয়া যায়। কাঁচা মক্কাগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া ভুট্টা গাছ গুলি প্রোথিত করিয়া আবৃত অবস্থায় রাখিলে উত্তম পিষ্ট-উদ্ভিজ্জ প্রস্তুত হয়।

বীজের ও ফসলের পরিমাণ।—ধইঞ্চা গাছের বীজ গুলি মাসকলাইয়ের বীজের ন্যায়। এই বীজ ঘন করিয়া জমিতে লাগাইতে হয়। বিঘা প্রতি তিন চারি সের বীজ বুনিলে যথেষ্ট হয়। বিঘা প্রতি ৩।৪ কাহণ ধইঞ্চার কাঠি জন্মে। অড়হরের বীজ বড় বড়

হইলেও, গাছ গুলি অন্ততঃ এক এক হাত অন্তরে হওয়া আবশ্যক বলিয়া বিঘা প্রতি দুই সের অড়হরের বীজ বপন করিলেই যথেষ্ট হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ মণ মাত্র অড়হর বঙ্গদেশে ফলিয়া থাকে। বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহার দুই তিন গুণ ফসল জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল প্রদেশের অড়হরের দানা গুলিও অপেক্ষাকৃত বড় ও সুমিষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে অড়হর লাগাইতে হইলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বীজ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

পর্য্যায়।—ধইঞ্চা ও অড়হর জন্মাইবার কারণ যদি ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইল, তাহা হইলে ক্রমাগত একই জমির উপর বারম্বার এই ফসল জন্মাইয়া কেন না জমি অত্যুর্ব্বর করিয়া লওয়া সম্ভব? কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই জমির উপর উপর্য্যুপরি যদি দুইটী শুঁটি-প্রদ ফসল লওয়া যায় তাহা হইলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি হয় না, এবং দ্বিতীয় ফসলটী ও ভাল জন্মে না। শুঁটি-প্রদ ফসল জন্মাইয়া পরে অন্য কোন জাতীয় একটী ফসল জন্মাইয়া জমির উর্ব্বরতা হ্রাস করিয়া লইয়া, পরে আবার একটী শুঁটি-প্রদ ফসল জন্মান যাইতে পারে। এ কারণ, ধান ও কলাই, অথবা ধান ও অড়হর এই দুইটী ফসল পর্য্যায়-ক্রমে ক্রমাগত জন্মাইলে কোন ক্ষতি হয় না, বরং কলাই বা অড়হর জন্মান দ্বারা ধান্যের বিশেষ উপকারই দর্শে। আশু-ধান্য কাটিয়া জমিতে কলাই ছিটাইয়া দেওয়া অথবা আমন ধান্য "থোড় মুখ" হইলেই জমিতে খেঁসারি বা মুসুরি ছিটাইয়া দেওয়া, এদেশে এই সাধারণ নিয়মটী প্রচলিত থাকাতে জমির উর্ব্বরতার অধিক হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এ দেশের আর একটী প্রচলিত নিয়ম সম্বন্ধেও এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিবরণ অধ্যয়ন দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি জন্মে। ক্রমাগত অনেক দিন ধরিয়া একই জমিতে

ধান জন্মাইতে জন্মাইতে যখন জমি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া আইসে তখন কৃষকগণ ঐ নিস্তেজ জমিতে অড়হর জন্মাইয়া উহা পুনরায় সারবান করিয়া লয়। কৃষকদিগের বিশ্বাস অড়হরের পাতা পড়িয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহা ভ্রান্তি-মূলক বিশ্বাস নহে, কিন্তু উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধির প্রধান কারণ মূলের গণ্ড গুলিতে সঞ্চিত সারবান্ পদার্থের অবস্থান। নীল জন্মাইয়া পরে ধান লাগাইলে ধান ভালরূপ ফলিয়া থাকে, অথচ নীলের গাছ গুলি সমস্ত জমি হইতে কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মূলে সঞ্চিত সারবান পদার্থের কারণই অড়হর, ধইঞ্চা, চীনার-বাদাম, নীল প্রভৃতি শুঁটি-প্রদ ও গভীর মূল যুক্ত ওষধিগুলি কৃষি কার্য্যের বহুমূল্য সহায় বলিয়া গণ্য ও কৃষকদের মধ্যে পরিচিত হইবার যোগ্য।

চর জমিতে ধইঞ্চার উপকারিতা।—দামোদর, পদ্মা, প্রভৃতি বৃহৎ নদ-নদীর বালুকাময় চরে পাঁচ-সাত বৎসর ধরিয়া শর, বন-ঝাউ প্রভৃতি গাছ জন্মিয়া কিছু সারবান পদার্থ বালুকার সহিত জমিয়া গেলে, চর-গুলি আশু-ধান্য জই, যব, চীনা, কলাই, সর্ষপ, নীল, ইত্যাদি ফসল জন্মাইবার উপযুক্ত হয়। এইরূপ পাঁচ-সাত বৎসর অপেক্ষা না করিয়া চরে ধইঞ্চার বীজ ছিটাইয়া দিয়া, একই বৎসরের মধ্যে বালুকার সহিত সারবান জৈবিক পদার্থ জমাইয়া লইয়া দ্বিতীয় বৎসর হইতে চরে চাষ চলিতে পারে।

একাদশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। শিকড় শুদ্ধ কয়েকটি অড়হর, ধনিচা, নীল, শন, চীনা বাদাম, কলাই ও ছোলাগাছ উঠাইয়া, কাহার শিকড় কত গভীর ও কাহার শিকড়ে কি পরিমাণ গণ্ড দেখিতে পাইতেছ বর্ণনা কর।

২। মূল-গণ্ড কিরূপে জন্মে এবং ইহা দ্বারা কিরূপে জমির উপকার সাধিত হয়।

৩। কোন কোন ভূভাগে যে অড়হর, কলাই, নীল প্রভৃতি ফসল উত্তম জন্মে ইহার বিশেষ হেতু কি?

৪। একটী চীনাবাদামের গাছ উঠাইয়া দেখাইয়া দাও উহার ফল গুলি কোথায় এবং উহার মূল-গণ্ড গুলি কোথায়।

৫। ধইঞ্চা বা ধণিচা গাছের চাষ কিরূপে করিতে হয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া যাও।

৬। অড়হর কয় প্রকারের হইয়া থাকে? ইহাদের চাষের নিয়ম বর্ণনা কর।

৭। ধইঞ্চা ও অড়হর কিরূপ পর্য্যায়ে চাষ করা উচিত? জমি সারবান করিবার জন্য ধনিচার বিশেষ উপযোগিতা বুঝাইয়া দাও।

৮। ধইঞ্চা বা অড়হর গাছ গরুকে খাইতে দিলে কোন উপকার আছে?

৯। পিষ্ট-উদ্ভিজ্জ কাহাকে কহে? কোন্ কোন্ ফসল পিষ্ট-উদ্ভিজ্জ প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী?

১০। ধণিচা গাছের কোন্ কোন্ অংশ কিরূপে ব্যবহারে আনিতে পারা যায়? বিঘা প্রতি এই ফসলের ফলন কিরূপ হয়?

১১। সুঁটি-প্রদ ফসল দ্বারা যে জমির উপকার দর্শে ইহা এদেশস্থ কৃষকদের কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দাও।

১২। চর-ভূমিতে ধইঞ্চ লাগাইবার বিশেষ প্রযোজনিতা দেখাইয়া দাও।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ইক্ষু ও শর্করা।

শর্করার উৎপত্তি।—ইক্ষু হইতেই যে কেবল শর্করা জন্মে এমত নহে। বঙ্গদেশে শর্করার আর একটী প্রধান উৎপত্তির উপাখর্জ্জুর-রস। তালের রস হইতেও তালের মিছরি প্রস্তুত হইয়া থা[illegible] বীট-মূল হইতেই ইউরোপ খণ্ডে শর্করা উৎপাদন করা হয়। উত্তর আমেরিকায় মেপ্‌ল্‌ বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা ও তৎসন্নিকটস্থ দ্বীপ-পুঞ্জে, জব-দ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, চীন ও অষ্ট্রে[illegible]লিয়ায়, ইক্ষু হইতে, শর্করা প্রস্তুত হইয়া [illegible]াকে। প্রায় ভারতবর্ষ হইতেই অন্য সকল দেশে ইক্ষুর চাষ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রায় অন্য সকল দেশেই ভালরূপ ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। ইউরোপীয় ও আমেরিক কৃষকগণ বিজ্ঞানালোক দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইক্ষুর চাষে এবং শর্করা প্রস্তুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই, এই উন্নতির এ[illegible] কারণ।

শ্রেষ্ঠ জাতীয় ইক্ষু।—[illegible]। বঙ্গদেশে প্রচলিত ইক্ষুর মধ্যে শ্যামসাড় ও খড়ি জা[illegible]তীয় ইক্ষুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত ইক্ষু খাইতে অতি সুমিষ্ট এবং ইহা [illegible]ইতে অতি সুন্দর ও সুস্বাদু গুড় প্রস্তুত হয়; কিন্তু খড়ি ইক্ষু জন্মাইতে ব্যয় কম পড়ে অথচ উহা হইতে গুড় প্রায় সমান পরিমাণই হইয়া থাকে। খড়ি ইক্ষুর আর একটী প্রধান গুণ এই, ইহা একবারে জমিতে লাগাইতে

দ্বাদশ অধ্যায়।

যবক্ষার প্রস্তুত প্রণালী।

লোণা-মাটি।—যবক্ষার বা সোরা বারুদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে; এ কারণ, বিশুদ্ধ, অর্থাৎ বারুদ প্রস্তুতের উপযোগী, সোরা প্রস্তুতের বিরুদ্ধে রাজ-নিয়ম প্রচলিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু লোণা-মাটি, অর্থাৎ সারের জন্য ব্যবহারের উপযুক্ত সোরা-পূর্ণ মাটি, প্রত্যেক কৃষকই প্রস্তুত করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে পারে। আনুবীক্ষণিক কয়েক প্রকার উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে সারবান পদার্থ (অর্থাৎ যবক্ষার-জান) সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া দিতে পারে, একাদশ অধ্যায়ে এই কথা বলা হইয়াছে। এই সকল আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্ যে কেবল-মাত্র সুঁটি-প্রদ বা অন্য কোন গাছের মূল অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হয়, এমত নহে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অবস্থাগত হইলে মৃত্তিকা মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া যায়। এই সকল বিশেষ অবস্থা সপ্তবিধ:—

১ম, মৃত্তিকার মধ্যে জান্তব অথবা উদ্ভিজ্জ জৈব পদার্থের অবস্থান।

২য়, মৃত্তিকা-মধ্যে চুণের (অথবা ঘুটিং পাথরের) পরিমাণের প্রাচুর্য্য।

৩য়, মৃত্তিকার শৈথিল্য।

৪র্থ, মৃত্তিকার সৈক্ত্য, অথচ তরলত্বের অভাব।

৫ম, রৌদ্রের অভাব।

৬ষ্ঠ, মৃত্তিকার উষ্ণতা (ন্যূনাধিক ৯৮° ফারেন্ হিট্)।

৭ম, মৃত্তিকার গভীরত্ব, এক হাতের অনধিক।

লোণা-মাটির ভাঁটি।—প্রত্যেক কৃষক আপন গৃহের অথবা ক্ষেত্রের সন্নিকট একটী লোণা-মাটি প্রস্তুতের ভাঁটি করিয়া উক্ত সপ্তবিধ অবস্থা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রতি বৎসরে একবার করিয়া ঐ লোণা-মাটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারে। ভাঁটিটী সূর্য্যের কিরণ ও বৃষ্টির জল হইতে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ, উহার উপরে একটী অনতি-উচ্চ চালা অথবা টিনের ছাদ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ছাদের বা চালার নিম্নবর্ত্তী মৃত্তিকা একফুট বা ১৫ ইঞ্চি গভীর করিয়া চষিয়া বা খুঁড়িয়া, উহার উপর ৩।৪ ইঞ্চি, ঘোড়ার নাদি বা গোময়, এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরাতন চুণ বা ঘুঁটিং পাথর, বিস্তৃত করিয়া দিয়া, পুনরায় লাঙ্গল বা কোদালি দ্বারা মৃত্তিকা আলোড়িত করিয়া সমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইয়া, মধ্যে মধ্যে, অর্থাৎ, মাসে দুই তিনবার জল ছিটাইয়া দিয়া মৃত্তিকা আলোড়িত করিয়া লইলে, চারি পাঁচ মাস পরে ঐ মৃত্তিকা সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোধুম, আশু-ধান্য, ইক্ষু, ভুট্টা, দেব-ধান্য, শাক, কপি, ইত্যাদি ফসলের পক্ষে এই লোণা-মাটি বিশেষ উপকারী। যে স্থানের মৃত্তিকায় চুণের পরিমাণ স্বভাবতঃই প্রচুর, সেই স্থানে চুণের ব্যবহার আবশ্যক নাই। মৃত্তিকাতে স্বভাবতঃ চুণের পরিমাণ প্রচুর আছে কি না ইহা একটী সহজ পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যাইতে পারে। যে মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হইবে উহা রৌদ্রে শুকাইয়া উহাকে লেবুর রসের বা সির্কার মধ্যে ফেলিয়া দিলে যদি স্ফুট-বিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত মৃত্তিকাতে প্রচুর, অর্থাৎ, শতকরা একভাগের অধিক

চুণ আছে বুঝা যাইবে। যবক্ষার উৎপাদন ৯৮° ফারেন্ হিট্ উত্তাপেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্বর হইয়া থাকে; কিন্তু ৪৫° হইতে ১৩০° ফারেন্ হিট উত্তাপ পর্য্যন্ত কিছু না কিছু যবক্ষার উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নিম্ন বঙ্গদেশে এক হাত গভীর মৃত্তিকার মধ্যে কি শীত কি গ্রীষ্মে ৬৫° হইতে ১০০° ফারেন্-হিট্ উত্তাপের সীমা কখনই অতিক্রম করে না। ভাঁটির উপরের চালা বা ছাদ যদি তিন-চারি হাত মাত্র উচ্চ হয়, এবং ভাঁটির চতুর্দ্দিক অনুচ্চ দেউলের দ্বারা সংরক্ষিত থাকে, তাহা হইলে ভাঁটির মধ্যে অধিক বায়ু সঞ্চালিত না হইবার কারণ, দিবারাত্রি উষ্ণতা প্রায় ৭০° হইতে ১০০°, এই সীমার মধ্যে সংরক্ষিত করিতে পারা যায়।

খাঁটি সোরা।—লোণা-মাটি হইতে বারুদ প্রস্তুতের উপযুক্ত সোরাও প্রস্তুত হইতে পারে। এই সোরাও সাররূপে আশু-ধান্য গোধুম, ইক্ষু, ভুট্টা, বাঁধা-কপি, তুঁত, শাক, ইত্যাদি ফসলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিঘাপ্রতি অর্দ্ধমণ হইতে তিনমন পর্য্যন্ত সোরা ব্যবহার করা যাইতে পারে। গাছগুলি যখন অন্ততঃ অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ হইয়া উঠিয়াছে দেখা যাইবে তখনই সোরা জমিতে ছিটা-ইতে হইবে। নিতান্ত চারা গাছের নিম্নে সোরা পড়িলে কখন কখন গাছ জ্বলিয়া যায়। সোরা সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে হয় জলের সহিত নতুবা চূর্ণ মৃত্তিকার সহিত, মিশ্রিত করিয়া, তবে জমিতে ছিটান উচিত। ক্রমান্বয়ে একই জমিতে প্রতি বৎসর কেবল সোরা-সার ব্যবহার করিলে জমি নিস্তেজ হইয়া যায়। এ কারণ সোরা সার প্রত্যেক বৎসর ব্যবহার করিতে হইলে হাড়ের গুঁড়ার সহিত ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হাড়ের গুঁড়া সহজে মৃত্তিকা মধ্যে গলিত হয় না,—সোরা সহজেই গলিয়া যায়, এবং

মৃত্তিকা মধ্যগত সারবান পদার্থ সকলকেও গলাইয়া লয়। গলিত অবস্থায় উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এককালীন মৃত্তিকার মধ্যগত অনেকটা সারবান পদার্থ গলিত হইয়া গিয়া শেষে মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অসার হইয়া পড়ে। হাড়ের গুঁড়ার মিশ্রণ দ্বারা এই অনিষ্ট রোধ হইয়া থাকে। সোরা-সার নিতান্ত সহজে গলিয়া যায় বলিয়া ইহা বর্ষাকালে ব্যবহার করা উচিত নহে। বর্ষাকালে এই সার সহজে ধৌত হইয়া চলিয়া গিয়া জমিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে যেখানে ভাদুই ফসল লাগান হয় সেখানে এই সার চৈত্র-বৈশাখ মাসে ব্যবহার করা চলিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসেই এই সার তৃণজাতীয় রবিশস্যের জন্য ব্যবহার করা যুক্তি-সঙ্গত।

সোরা-প্রস্তুত।—লোণা-মাটি প্রস্তুতের পক্ষে কোন বাধা নাই বটে কিন্তু সোরা প্রস্তুত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন চলিতে পারে না। মল-মূত্র প্রোথিত করিবার জন্য নগরের বহির্ভাগে যে সকল ক্ষেত্র মিউনিসিপালিটী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট থাকে ঐ সকলে প্রোথন-কালে চূণ ব্যবহৃত হইলে অনায়াসে উহারা সোরা প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মল-মূত্র ও চুণ মিশ্রিত মৃত্তিকা খনন করিয়া লইয়া উহাদ্বারা কতকগুলি স্তূপ করিয়া লইতে হয়। এই স্তূপগুলি দুই হাত মাত্র উচ্চ ও শ্লথ মৃত্তিকা গঠিত হওয়া আবশ্যক, কেননা স্তূপ গঠনের উদ্দেশ্য যেন মৃত্তিকার মধ্যে অবাধে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। স্তূপগুলির চতুষ্পার্শ্বে মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীর এবং উপরে একটী চালা থাকিলে মৃত্তিকার মধ্যে অধিক পরিমাণে সোরা জন্মিয়া থাকে। বৃষ্টি-পাত দ্বারাও স্তূপ-গুলির মৃত্তিকা কিয়ৎপরিমাণে ধৌত হইয়া যাওয়া সম্ভব; তবে

অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অধিক বৃষ্টি হওয়ার সম্ভব প্রায় নাই। চৈত্র মাসে সোরা প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হইয়া দেড় মাস কাল পর্য্যন্ত কার্য্য চলিতে পারে। স্তূপগুলির মৃত্তিকা এবং উহাদের চতুষ্পার্শ্বের বৃষ্টি দ্বারা ধৌত মৃত্তিকা হইতে (অর্থাৎ, লোনা-মাটি হইতে) সোরা প্রস্তুত করিতে হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনে যেরূপ পাণীয় জল একটী কলসীর উপর আর একটী কলসী রাখিয়া পরিস্রুত করিয়া লওয়া হয়, সেইরূপ বন্দোবস্তে তিন তিনটী করিয়া কলসী সজ্জিত করিয়া লোণা-মাটি হইতে সোরা মিশ্রিত পরিষ্কার জল বাহির করিয়া লওয়া হয়। উপরিস্থিত দুইটী কলসীর নিম্নে দুইটী ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়। মধ্যের কলসীটীর নিম্নে এক স্তর খড় বিছাইয়া, উহার উপর নীল-সিটির ক্ষার একস্তর বিস্তৃত করিয়া দিয়া, উপরে শ্লথ ভাবে লোণা-মাটি দ্বারা কলসীটী পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। সর্ব্বোপরিস্থ কলসীটীর মধ্যে পরিষ্কার জল পূর্ণ করিয়া দিয়া উহার নিম্নস্থ ছিদ্রটী দুই এক টুক্‌রা খড় দ্বারা কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতে হয়। বিন্দু বিন্দু পরিষ্কার জল লোণা-মাটির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া ক্রমশঃ সর্ব্ব-নিম্নস্থ কলসীর মধ্যে সোরা-সংযুক্ত হইয়া পতিত হয়। সর্ব্ব-নিম্ন কলসী গুলির জল মধ্যে মধ্যে ঢালিয়া লইয়া অগ্নি সহযোগে উহাকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া দিয়া, জল-সংযুক্ত যবক্ষার বিশ্লিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। রৌদ্র-সহযোগে জল বাষ্পাকারে পরিণত হইতে অনেক সময় লাগে বলিয়া, অগ্নির উপর লৌহ কটাহে করিয়া জল সিদ্ধ করিযা, যেমন জলের মধ্যে কিছু সোরার দানা জমিয়া যায় অমনই ঝাঁজরি দ্বারা উহা ছাঁকিয়া লইয়া, ঐ কটাহ মধ্যেই ক্রমাগত সোরা-মিশ্রিত জল মধ্যে মধ্যে ঢালিয়া যাইতে হয়। এইরূপে রাত্রি দিন সোরা-প্রস্তুত কার্য্য চলিয়া থাকে।

কটাহ গুলির ব্যাস প্রায় দুই ফুটের ন্যূন ও গভীরত্ব ন্যূনাধিক নয় ইঞ্চি হইয়া থাকে। জল সিদ্ধ হইতে হইতে দেখা যাইবে প্রথমে উহার উপর গাদ উত্থিত হইতেছে। এই গাদ মধ্যে মধ্যে ঝাঁজরি দ্বারা ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। ক্রমশঃ জল গাঢ় হইলে উহার নিম্নে সোরা জমিতে আরম্ভ করে। এই সোরা ছাঁকিয়া লইয়া কটাহে পুনরায় কিছু সোরা-সংযুক্ত জল মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ৩০ হইতে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চুলা জ্বালাইয়া কার্য্য করিতে পারিলে প্রত্যেক কটাহ হইতে চারি হইতে আটসের পর্য্যন্ত সোরা প্রস্তুত হয়। এই সোরা এক কালীন বিলাতী সোরার ন্যায় পরিষ্কার কখনই হয় না; কিন্তু এই অবস্থাতেই ইহা হইতে এদেশে দেশী-বারুদ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং এই অবস্থাতেই এই সোরা বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে। মধ্যস্থিত কলসী হইতে যে জল নির্গত হয় উহার আস্বাদন এককালীন পরিষ্কার জলের ন্যায় অনুমিত হইলে, ঐ জল আর ফুটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না।

পুলিসের অনুমতি-ক্রমে পূর্ব্ব-কথিত নিয়মে প্রস্তুত সোরা জমির সারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যবহার করিবার সময় ইহা মৃত্তিকা অথবা জল সহযোগেই যখন ব্যবহার করা উচিত, তখন লোণা-মাটি অথবা সোরা-মিশ্রিত জলাকারেই জমির সার ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এ কারণ সোরা প্রস্তুত অপেক্ষা লোণা-মাটির ভাঁটি মাত্র প্রস্তুত করিয়া ঐ মাটি সারের জন্য ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রত্যেক কৃষকের আয়ত্ত-ভুক্ত। বিঘা প্রতি ২০.২৫ ঝুড়ি লোণা-মাটি ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এবং সোরা ব্যবহার দ্বারা যে সকল ক্ষতি হওয়া সম্ভব এইমাটি সাররূপে ব্যবহার দ্বারা সেরূপ কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। লোণা-মাটি কাহাকে কহে? ইহার ব্যবহার দ্বারা কি উপকার হয়?

২। লোণা-মাটি প্রস্তুত করিতে হইলে জমিতে কি কি উপাদান থাকা আবশ্যক এবং জমি কিরূপ অবস্থাগত হওয়া আবশ্যক?

৩। লোণা-মাটির ভাঁটি কাহাকে কহে?

৪। লোণা-মাটি বা সোরা কোন্ কোন্ ফসলের জন্য বিশেষ উপযোগী?

৫। লোণা-মাটি ও সোরা এই দুইটী সারের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ তারতম্য আছে তাহা বর্ণনা কর।

৬। সোরা-সারের ব্যবহার দ্বারা জমির বা ফসলের কোন ক্ষতি হইতে পারে কি না?

৭। সোরা প্রয়োগের নিয়ম ও পরিমাণ নির্দ্দেশ কর।

৮। আমন-ধান্যের সোরা সার প্রয়োগ দ্বারা প্রায় ক্ষতি হয় কেন?

৯। সোরা-প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জন্তুদিগের মল-মূত্র ও অস্থি-মাংসের ব্যবহার।

মূত্র।—এ দেশের কৃষকদিগের জ্ঞান আছে, মূত্র সাররূপে ব্যবহার করিলে গাছ মরিয়া যায়। বস্তুতঃ জলের সহিত না মিশাইয়া যদি খাঁটি মূত্র কোন গাছের তলে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ গাছ মরিয়া যাওয়াই সম্ভব। মূত্র অতি তেজস্কর সার। ইহা অন্ততঃ দশগুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে ব্যবহার করা উচিত। যদি জল মিশাইয়া এই সার ব্যবহার করা সুবিধা না হয়, তাহা হইলে যে জমিতে কোন ফসল নাই এমন জমিতে উহা ছিটাইয়া দেওয়া, অথবা যে ধানের বা পাটের জমিতে কিছু জল দাঁড়াইয়া আছে সেইরূপ জমিতে ঢালিয়া দেওয়া, ভাল। তৃণ-জাতীয় অথবা শাক-জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে সোরা-সার ও মূত্র-সার বিশেষ উপাযোগী। ধান্ত, গোধুম, যব, জই, ভুট্টা, দে-ধান, মড়ুয়া, ইক্ষু; তুঁত, পালমশাক, পাট, বাঁধাকপি, ইত্যাদি ফসলের জন্যই মূত্রাদি যবক্ষারজান ঘটিত সার ব্যবহার করা উচিত। মিউনিসিপালিটীর গো-শালা গুলির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এই বহুমূল্য সার অনায়াসে কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে ব্যবহারে আনা যাইতে পারে। প্রত্যেক কৃষকও অনায়াসে মূত্রের অপচয় না করিয়া সাররূপে ইহা ব্যবহার করিতে পারে। মূত্র পচাইয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। টাট্‌কা অবস্থাতে ইহা জমিতে প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা হইতে অধিক উপকার পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ পর্য্যন্ত মূত্র সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গোময়।—গোময় পচাইয়া ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়। গোময় গো-শালা হইতে অন্ততঃ ১০০ হাত অন্তরে পচান উচিত। রৌদ্রের আভা ও বৃষ্টির জল যাহাতে না লাগে তজ্জন্য গোবর-গাদার উপর চালা থাকা আবশ্যক। বৃষ্টির জলে গোবরের অনেক সারাংশ ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। সূর্য্যের কিরণ দ্বারা গোময় গাদার মধ্যে থাকিয়া যেন শুকাইয়া না যায় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আবার অধিক জল মিশ্রিত করিলেও গোময় নিয়মিত ভাবে পচিতে পারে না। নাতি-শুষ্ক নাতি-সিক্ত এইরূপ ভাবে রাখিয়া গোবর-গাদাকে মধ্যে মধ্যে পদদলিত করিয়া ওলট্-পালট্ করিয়া দিতে হয়। এরূপ করাতে গোবরের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া উহার মধ্যে যবক্ষার উৎপাদনের সুবিধা ঘটে। গোবর গাদার মধ্যে ছাই ফেলাতে বিশেষ উপকার দর্শে। ছাই অতি চমৎকার সার, এবং গোবর গাদার সহিত মিশ্রিত করাতে উহার মধ্যে যবক্ষার জন্মিবার কিছু অধিক সুবিধা হয়। গোবর গাদার মধ্যে গো-শালার খড় প্রভৃতি আবর্জ্জনা ফেলাতেও উপকার আছে। খড় মিশ্রিত গোবরের মধ্যে সহজে বায়ু প্রবেশ করিয়া যবক্ষারজান ঘটিত সার-পদার্থের উদ্ভবের সুবিধা করিয়া দেয়।

পুরাতন সার।—গোবর যত পুরাতন হয় ততই ভাল এ বিশ্বাস ভুল। পাঁচ ছয়মাস কাল ইহা পচাইয়া ব্যবহার করিলেই ইহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে। নিতান্ত টাট্‌কা অবস্থায় গোবরের মধ্যে তাদৃশ সারবান পদার্থ থাকে না, উপরন্তু টাট্‌কা গোবরের ব্যবহার দ্বারা ফসলে কীট জন্মিয়া থাকে। ৩।৪ বৎসরের পুরাতন সারে সারবান পদার্থ অধিক থাকে না। চৈত্র বৈশাখ মাসেই জমিতে গোময়-সার ব্যবহারের প্রশস্ত সময়।

নাদি-সার।—গোময় অপেক্ষাও ঘোড়া, ছাগল ও মেষের নাদি তেজস্কর সার। এসকল অপেক্ষা পক্ষীর বিষ্ঠা ও পলুপোকার নাদি আরও উৎকৃষ্ট সার। ঘোড়ার নাদিও পচাইয়া ব্যবহার করা উচিত। ছাগল ও মেষ জমিতে বিঘা প্রতি ১০০টী এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া চরাইয়া লইলে জমি বিশেষ উর্ব্বর হয়। এই সকল ছাগ ও মেষকে ছোলা, মটর, বা কলাই ও ভুসি জমির উপরই রাখিয়া খাইতে দিলে সার আরও তেজস্কর হয়। বলকারক সামগ্রী গো-মহিষকেও খাইতে দিলে উহাদের মল-মূত্র অপেক্ষাকৃত অধিক সারবান হইয়া থাকে। জমি ভাগ করিয়া চাষ করিতে পারিলে, ক্রমান্বয়ে জমির এক-ষষ্ঠাংশ প্রতি বৎসর পতিত রাখিয়া উহারই উপর গো-মহিষ চরাইয়া, উহাদের বলকারক আহার দান করিয়া, পতিত জমি সারবান করিয়া লইতে পারা যায়। ময়মনসিংহের কৃষকদিগের মধ্যে এই সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে

পরিমাণ।—ধান, পাট, ইত্যাদি সাধারণ ফসলের জন্য বিঘা প্রতি ৪০/ বা ৫০/ মণ পচা গোবর-সার ব্যবহার করা উচিত। আলু, ইক্ষু, তামাক, কপি, প্রভৃতি বহুমূল্য ফসলের জন্য বিঘা প্রতি ১৫০। ২০০ মণ পচা গোবর সার ব্যবহার করা উচিত। বীজ বপনের পূর্ব্বে সার ছিটাইয়া দিয়া জমিতে লাঙ্গল-মৈ দিয়া পরে বীজ বপন করিতে হয়। ঘোড়ার নাদি পচিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে ব্যবহার করা উচিত। গোময়ের অর্দ্ধেক পরিমাণ ঘোড়ার নাদি ব্যবহার করিলেও চলে।

অস্থি-মাংস।—মল-মূত্র অপেক্ষা অস্থি, মাংস ও রক্ত অনেক ভাল সার। কেশ, পুচ্ছ, শৃঙ্গ, নখর এ সমস্তও উত্তম সার। এ সমস্ত নষ্ট না করিয়া মাটিতে প্রোথিত করিয়া প্রোথন-ভূমি ফল-

বৃক্ষ জন্মাইবার জন্য ব্যবহার করা উচিত। এ সমস্ত সামগ্রী সাধারণ কৃষকদিগের ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু গ্রামের বহির্ভাগে গো-ভাগাড়ে জন্তুদিগের মৃত দেহাদি ফেলিয়া রাখাতে নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। এ সকল পুতিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত এবং প্রোথন-ভূমিতে বৃক্ষ রোপণের বন্দোবস্ত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। দশ-পনের খানি গ্রাম লইয়া এক একটী গ্রাম্য সমিতি করিয়া দুই একজন ডোম বা চামার নিযুক্ত করিয়া জন্তুদিগের মৃত দেহ সকল জমির মধ্যে প্রোথিত করিয়া ঐ জমিতে ফলগাছ জন্মাইবার বন্দোবস্ত হইলে স্বাস্থ্যোন্নতি ও সারাগম উভয় কার্য্যই যুগপৎ সাধিত হইতে পারে।

অস্থি-সার।—রক্ত মাংস সারের জন্য ব্যবহার করাতে কৃষকদের মনে যাদৃশ বিঘ্ন হওয়া সম্ভব, অস্থির ব্যবহারে তাদৃশ বিঘ্ন হওয়া উচিত নহে। অস্থি বিষয়ে তাহাদের এইটী বুঝা আবশ্যক যে পুরাতন অস্থি প্রস্তর বা লোষ্ট্র সদৃশ পরিষ্কার সামগ্রী। ইহার স্পর্শনে বা ব্যবহারে কখনই কোন রোগ হইতে পারে না। বস্তুতঃ অস্থি হইতে প্রস্তুত ছুরির বাঁট, ছড়ির হাতল, এ সকল সামগ্রী সকলেই আদর করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। কঙ্কাল অবস্থায় অস্থি ব্যবহারে বিঘ্ন জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যখন ছুরির বাঁট ইত্যাদি অবস্থায় ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন অস্থি-চূর্ণ সাররূপে কেনই বা ব্যবহৃত না হইবে? অস্থি চূর্ণ করিবার পূর্ব্বে উহা সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে কোমল পদার্থ গুলি বাহির করিয়া লওয়া হয়। সিদ্ধ করিয়া ভঙ্গ-প্রবণ অবস্থায় পরিণত করিয়া পরে উহাকে চূর্ণ করাতে উহার সমস্ত দোষ ও অপবিত্রতা কাটিয়া যায়। এরূপ অস্থি-চূর্ণ প্রস্তর-চূর্ণ হইতে কিছুই বিভিন্ন নহে, এবং ইহা সাধারণতঃ কৃষকদের ব্যবহার করা

উচিত। কলে সিদ্ধ ও চূর্ণ করা অস্থি কলিকাতায়, বালিতে, ও ও মগরায় ২ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়।

অস্থিসারের ফল।—অস্থি-সার ব্যবহারের দ্বারা আশু-ফল অতি সামান্যই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এক বিঘা জমিতে একমন অস্থির গুঁড়া ছিটাইয়া দিলে পাঁচ-সাত বৎসরের জন্য উহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা হয়, এবং এত কাল ধরিয়া কিছু কিছু ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। গোময়, সোরা বা খোল সাররূপে ব্যবহার করিলে অধিক আশু উপকার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ গুলি অস্থি-সারের ন্যায় স্থায়ী সার নহে।

বিশেষ উপকার।—যদি অস্থি-সার ব্যবহারের প্রতি অনিচ্ছা নিতান্ত অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলেও কৃষকগণ একপ্রকারে অস্থি ব্যবহার করিয়া উপকার পাইতে পারে। নেপালীরা কমলা-লেবু প্রভৃতি ভাল ভাল ফল-গাছ রোপণ করিবার সময় গর্ত্তের মধ্যে কতকগুলা হাড় ফেলিয়া দিয়া তবে গাছ রোপণ করে। তাহাদের বিশ্বাস ইহা দ্বারা চিরকালের মত ঐ গাছের ফল মিষ্ট হইয়া থাকে। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। অস্থি-সারের বিশেষ কার্য্য,—(১) গাছের ফুল ও ফল জন্মাইবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা; (২) গাছ বা ফলকে শীঘ্র পাকাইয়া দেওয়া; (৩) ফলের, স্কন্দের বা মূলের মিষ্টতা বৃদ্ধি করা এবং (৪) মূল জাতীয় ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ইক্ষু ও বীট চাষে অস্থি-সারের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কেননা এই দুইটী ফসল শর্করা উৎপাদনের জন্য জন্মান হয়।

পরিমাণ।—ধান, সর্ষপ, প্রভৃতি সাধারণ কৃষি-শস্যের জন্য বিঘা প্রতি এক মণ অস্থি-চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। ইক্ষু, আলু,

বীট্, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ফসলের জন্য বিঘা প্রতি ৩/মণ অস্থি-চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।

অস্থি চূর্ণ করণের সহজ উপায়।—কোন ক্ষার-পদার্থের সহিত মিলাইয়া অস্থিকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া নরম করিয়া লইয়া পরে ঢেঁকিতে করিয়া কুটিয়া লইলে অতি উত্তম অস্থি-সার প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ইহা কলে প্রস্তুত সিদ্ধ অস্থি-চূর্ণের ন্যায় পরিষ্কার সামগ্রী নহে। অস্থিদগ্ধ করিয়া উহার অঙ্গার অথবা ভস্ম সাররূপে ব্যবহার করাতেও কোনরূপ পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে না। অস্থি-চূর্ণ, অস্থি-ভস্ম, অস্থির অঙ্গার এবং কঙ্কাল অবস্থাগত অস্থি সমস্তই উত্তম ও স্থায়ী সার। উপরি উক্ত চারিটী উদ্দেশ্য বুঝিয়া অস্থিসার ব্যবহার করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। মূত্র সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে কিরূপে ব্যবহার করা উচিত?

২। খাঁটি মূত্র সাররূপে কিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে?

৩। মূত্র পচাইয়া ব্যবহার করা উচিত অথবা টাট্কা অবস্থায়?

৪। কোন্ কোন্ ফসলের পক্ষে মূত্র বিশেষ উপযোগী সার?

৫। বিঘা প্রতি কত মূত্র ব্যহার করা যাইতে পারে?

৬। গোময় কিরূপে রক্ষা করিতে হয়?

৭। গোময় পচাইয়া ব্যবহার করা ভাল অথবা টাট্কা ব্যবহার করা ভাল? গোময় কতকাল ধরিয়া পচাইলে ফল ভাল পাওয়া যায়?

৮। গোবর-গাদার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্য ফেলিয়া দিলে সারের উন্নতি হয়?

৯। ঘোড়া, ছাগল, মেষ ও পলু-পোকার নাদি এবং পক্ষীর বিষ্ঠা গোবর-সার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট সার?

১০। ছাগ ও মেষের নাদি সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত?

১১। ঘোড়ার নাদি সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে কি পরিমাণে ও কি উপায়ে ব্যবহার করা উচিত?

১২। অস্থি, মাংস, রক্ত, কেশ, পুচ্ছ, শৃঙ্গ ও নখর মল-মূত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট সার?

১৩। গ্রামের জন্তু মরিলে মৃতদেহ কি করা উচিত?

১৪। অস্থি সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে কি কি প্রথার কোন্ কোন্ ফসলের জন্য কি পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে?

১৫। অস্থি-সার ব্যবহার দ্বারা ফসলের কি কি বিশেষ উপকার দর্শে?

১৬। বিনা কলে অস্থি-গুঁড়া করিতে হইলে কি উপায়ে গুঁড়া করা যাইতে পারে?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ইক্ষু ও শর্করা।

শর্করার উৎপত্তি।—ইক্ষু হইতেই যে কেবল শর্করা জন্মে এমত নহে। বঙ্গদেশে শর্করার আর একটী প্রধান উৎপত্তির উপাদান খর্জ্জুর-রস। তালের রস হইতেই তালের মিছরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বীট-মুল হইতেই ইউরোপ খণ্ডে শর্করা উৎপাদন করা হয়। উত্তর আমেরিকায় মেপ্‌ল্ বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিয়া ও তৎসন্নিকটস্থ দ্বীপ-পুঞ্জে, জব-দ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, চীন ও অষ্ট্রেলিয়ায়, ইক্ষু হইতে, শর্করা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রায় ভারতবর্ষ হইতেই অন্য সকল দেশে ইক্ষুর চাষ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রায় অন্য সকল দেশেই ভালরূপ ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। ইউরোপীয় ও আমেরিক কৃষকগণ বিজ্ঞানালোক দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইক্ষুর চাষে এবং শর্করা প্রস্তুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই, এই উন্নতির একমাত্র কারণ।

শ্রেষ্ঠ জাতীয় ইক্ষু।—ইক্ষু নানা জাতীয়। বঙ্গদেশে প্রচলিত ইক্ষুর মধ্যে শ্যামসাড়া ও খড়ি জাতীয় ইক্ষুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত ইক্ষু খাইতে অতি সুমিষ্ট এবং ইহা হইতে অতি সুন্দর ও সুস্বাদু গুড় প্রস্তুত হয়; কিন্তু খড়ি ইক্ষু জন্মাইতে ব্যয় কম পড়ে অথচ উহা হইতে গুড় প্রায় সমান পরিমাণই হইয়া থাকে। খড়ি ইক্ষুর আর একটী প্রধান গুণ এই, ইহা একবার জমিতে লাগাইতে

পারিলে, একই গোড়া হইতে চারি পাঁচ বৎসর অথবা ততোধিক কাল ধরিয়া গাছ বাহির হইয়া, পুনঃপুনঃ কলম লাগানর খরচ বাঁচা-ইয়া দেয়। অবশ্য প্রত্যেক বৎসর চাষ-আবাদ এবং সার-প্রয়োগ দরকার। খড়ি-আকের আর একটী গুণ এই, ইহা অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানেও উত্তম জন্মে, আবার ১০।১৫ দিবস ধরিয়া ইহার গোড়ায় যদি দুই এক হাত জল দাঁড়াইয়া যায় তাহা হইলেও গাছগুলি মরে না। এরূপ অবস্থায় শ্যামসাড়া প্রায় মরিয়া যায়। শ্যামসাড়ায় অধিক জল-সেচন আবশ্যক, অথচ ইহার গোড়ায় জল দাঁড়ানতেও ক্ষতি হয়।

হাপর-প্রস্তুত।—নিম্ন বঙ্গদেশে ইক্ষু লাগাইবার প্রশস্ত সময় ফাল্গুন মাস। আলু উঠাইবার পরে ইক্ষু লাগানই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল নিয়ম। ইক্ষু-দণ্ডের উপরিভাগের দুই হাত পরিমাণ অংশ বাছিয়া বাছিয়া কাটিয়া লইয়া উহা হইতেই কলম বা টিকলি বাহির করা উচিত। এই অংশের সর্ব্বোপরিস্থ প্রান্তের চারি পাঁচ অঙ্গুলি পরি-মাণ ইক্ষু-দণ্ড বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্টাংশ অর্দ্ধহস্ত করিয়া কাটিয়া কলম সংগ্রহ করিতে হয়। স্থূল, সুপক ও নীরোগ ইক্ষু-দণ্ড বীজের, অর্থাৎ কলমের জন্য ব্যবহার করা উচিত। কলমগুলি একটী হাপর, অর্থাৎ গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া, উহাদের "ট্যাক্", অর্থাৎ অঙ্কুর বেশ বড় হইয়া বাহির হইলে, শিকড় ও অঙ্কুর যুক্ত কলমগুলি জমিতে সারি বাঁধিয়া প্রোথিত করিয়া দিতে হয়। হাপরের মধ্যে প্রথমে সিক্ত খড় ও ক্ষার বিস্তৃত করিয়া দিয়া উহার উপর এক স্তর কলম সাজাইয়া দিতে হয়; পরে উহার উপর আর এক স্তর সিক্ত খড় ও ক্ষার বিস্তৃত করিয়া দিয়া পুনরায় এক স্তর কলম সাজাইয়া দিতে হয়। এইরূপ করিয়া সাজাইয়া দিয়া সর্ব্বোপরি মৃত্তিকার আবরণ দিয়া

রাখিলে ৭।৮ দিবসের মধ্যে কলমগুলিতে শিকড় ও অঙ্কুর বাহির হয়। যদি দুই-এক মাস কলমগুলি সঞ্চিত রাখিয়া পরে প্রোথিত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, কলমগুলি খড় ও ছাইয়ের উপর একস্তর মাত্র দণ্ডায়মানাবস্থায় স্থাপিত করিয়া উহার উপর খড় মাত্র চাপাইয়া দিতে হয়। খড়ের উপর মাটির আবরণ দিলে অতি শীঘ্র ট্যাক্ বাহির হইয়া ক্রমশঃ কলমগুলি পচিয়া যায়। এ কারণ কলম কিছু দিন রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে মৃত্তিকার আবরণ দেওয়া নিষেধ। তবে খড়ের আবরণ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে যখনই এইরূপ বোধ হইবে তখনই উহার উপর জল সেচন আবশ্যক। বৃক্ষের নিম্নে, অর্থাৎ ছায়া-স্থানে, এবং জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থলে হাপর প্রস্তুত করিয়া লইলে আবরণ সিক্ত রাখিবার জন্য প্রত্যহ জল দিবার আবশ্যক হয় না, কিন্তু অনাবৃত ও শুষ্ক স্থানে হাপর প্রস্তুত করিতে হইলে প্রত্যহ খড়ের উপর জল-সেচনের আবশ্যক করে।
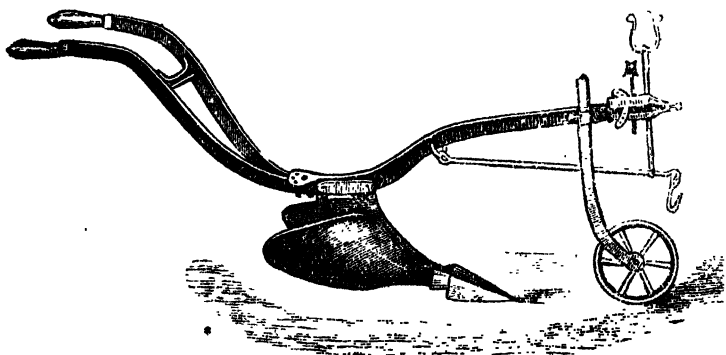
৩২শ চিত্র। দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল।

কলম লাগান।—জমি ভাল করিয়া গভীর ভাবে চাষ দিয়া কোদালি বা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা "ভিলি" বা প্রণালী প্রস্তুত

করিয়া লইয়া কলম প্রোথিত করা আবশ্যক। ইউরোপীয় ও আমেরিক কৃষকগণ দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল দ্বারা ছয় ফুট অন্তর ভিলি প্রস্তুত করিয়া এক একটী ভিলির মধ্যে দুই শ্রেণী করিয়া কলম লাগাইয়া থাকেন। এ নিয়ম অতি উত্তম। ইক্ষুতে কীটের উৎপাত অধিক হয় বলিয়া, এবং "ধসা ধরা" "বোঞা লাগা" প্রভৃতি রোগও ইক্ষুতে অধিক হয় বলিয়া, কলম লাগাইবার সময় শেঁকোবিষ চূর্ণ করিয়া, রেড়ির খোল, ক্ষার, চুণ প্রভৃতি অন্য কয়েকটী সামগ্রী শেঁকোবিষের ৮০০ গুণ লইয়া, উহার সহিত ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া দিয়া, তুঁতিয়ার জলে ডোবান কলমগুলি এই মিশ্রিত গোলার মধ্যে ডুবাইয়া ডুবাইয়া লইয়া পরে ব্যবহার করা উচিত। মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া গেলে ভিলির মধ্যে জল দিয়া কলম লাগাইয়া যাইতে হয়। এদেশে এক বা দেড় হাত অন্তর প্রণালী করিয়া এক একটী প্রণালীতে এক এক সারি কলম লাগান হয়। ৪ ফুট প্রণালীর মধ্যে লম্বালম্বী ৩ খানি কলম লাগান উচিত। যদি ছয় ফুট অন্তর দুই সারি করিয়া ইক্ষুর কলম লাগান হয় তাহা হইলে সারি দুইটী এক হাত অন্তরে থাকা কর্ত্তব্য। বিঘা প্রতি ৩,০০০। ৪,০০০ কলম আবশ্যক। প্রণালীর মধ্যে জল দিয়া কলম লাগাইয়া তখনই উহার উপর তিন ইঞ্চি আন্দাজ শুষ্ক মৃত্তিকা চাপাইয়া দিয়া যাইতে হয়। যাহা সুন্দর অঙ্কুরিত হইয়াছে এরূপ কলম লাগাইলে দশ-বার দিবসের মধ্যে গাছগুলির সারি দেখা যাইবে। এই সময় অতিবাহিত হইলে এবং ইতি মধ্যে বৃষ্টি না হইলে, একবার ভাল করিয়া জমি ভিজাইয়া জল-সেচন করা উচিত। জল-সেচনের পরে একবার নিড়ান আবশ্যক, নতুবা জমির মাথা আঁটিয়া গিয়া গাছগুলি ঝাড়িয়া বাহির হইতে পারে না।

সার-প্রয়োগ।—প্রথম সার দেওয়া প্রথম জল-সেচনের

পূর্ব্বে অথবা পরে হওয়া আবশ্যক। ঝিলের মাটি বা অন্য কোন রূপ কর্দ্দমময় সার-মাটি ব্যবহার করিতে হইলে কলম লাগাইবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঝিলের মাটি বিঘাপ্রতি ৩০ গাড়ি ব্যবহার করা যাইতে পারে। সোরা সার-রূপে ব্যবহার করিতে হইলে গাছগুলি একহাত পরিমাণ উচ্চ হইলে পরে ব্যবহার করা উচিত। সোরা বিঘাপ্রতি ১ বা ১।৷০ মণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ধইঞ্চা অথবা বর্ব্বটী লাগাইয়া, উহা কাঁচা অবস্থাতেই কাটিয়া ফেলিয়া জমির মধ্যে লাঙ্গল দ্বারা মিশাইয়া দিতে পারিলে, উর্ব্বর মৃত্তিকাতে সোরা ভিন্ন আর কোন সারের বড় একটা আব-শ্যক করে না। তবে কলম লাগাইবার পূর্ব্বে বিঘাপ্রতি ২।৩ মণ চুণ ছিটাইতে পারিলে ফল আরও ভাল হয়, কেননা চুণের সহ-যোগে ধইঞ্চা বা বর্ব্বটী গাছের সার ভাল করিয়া পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া থাকে, এবং চুণের দ্বারা কীটের উৎপাতও কম হয়। সাধা-রণতঃ খোল, এবং বিশেষতঃ রেড়ির খোল, ইক্ষুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ সার। বিঘাপ্রতি ৫।৭ মণ, এমন কি ১০।১৫ মণ পর্য্যন্ত খোল ব্যবহার চলিতে পারে। ইউরোপীয় ও আমেরিক কৃষকগণ ইক্ষু চাষে অস্থি-চূর্ণ সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই দ্রব্যও কলম লাগাইবার পূর্ব্বে ছিটাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বিঘাপ্রতি ৩।৪ মণ অস্থি-চূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোময় ব্যবহার করিতে হইলে বিঘা-প্রতি ২০০ মণ আন্দাজ ব্যবহার করা উচিত। ইহাও কলম লাগাইবার পূর্ব্বে জমিতে ছিটাইয়া দিয়া লাঙ্গল দ্বারা জমির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়।

জল-সেচন।—জল-সেচন সহ কলম বসান, সার-প্রয়োগ, এবং আর একবার জল-সেচন ও নিড়ান শেষ হইয়া গেলে,

অবস্থাভেদে ও ইক্ষুর জাতিভেদে আরও তিন, চারি বা ততোধিক বার জল-সেচন আবশ্যক হইতে পারে। জল দিয়া কলম লাগাইতে পারিলে খড়ি ইক্ষুতে প্রায় আর একবারমাত্র জল-সেচন আবশ্যক হয়। তবে চৈত্র-বৈশাখ মাসে যদি আদৌ বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে খড়ি ইক্ষুতেও দুই তিনবার জমি ডুবাইয়া বা ভিজাইয়া জল-সেচন আবশ্যক করে। শ্যামসাড়া ও বোম্বাই ইক্ষুতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রায় চারিবার জল-সেচনের আবশ্যক হয়। তবে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থানের জমি স্বভাবতঃ এত সিক্ত যে তথায় শ্যামসাড়া ইক্ষুতেও জল-সেচনের আবশ্যক হয় না। কার্ত্তিক মাসের পরে বৃষ্টির অবস্থা বুঝিয়া শ্যামসাড়া ও বোম্বাই ইক্ষুতে আরও দুই তিনবার জল-সেচন করা আবশ্যক হইতে পারে।

মাটি দেওয়া।—এক একবার জল-সেচনের পরে এক একবার মৃত্তিকা শিথিল করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়, নতুবা মৃত্তিকার মাথা আঁটিয়া গিয়া, অর্থাৎ উহার উপর 'সর' বা কঠিন একটী স্তর, পড়িয়া গিয়া, মৃত্তিকা হইতে অঙ্কুর নির্গমণের ও মৃত্তিকা মধ্যে বায়ু প্রবেশের ব্যাঘাত জন্মে। যদি একবার মাত্র জল-সেচনই যথেষ্ট হইল দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ জল-সেচনের এক সপ্তাহের মধ্যেই ইক্ষুর গোড়ায় মাটি চাপান চলিতে পারে। ইহা দ্বারা গোড়ার মাটিও শিথিল করা হইবে, নিড়ান বা আগাছা উৎপাটনের কার্য্যও হইবে, বৃষ্টির জল নির্গমণের প্রণালী প্রস্তুতও হইবে এবং বৃষ্টির জল যাহাতে গাছের গোড়ায় না লাগে তাহারও ব্যবস্থা হইবে। যদি বর্ষার পূর্ব্বে দুইবার জল-সেচন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার জল-সেচনের পরে আর একবার মাটি চাপান চলিতে পারে। এই এক

বা দুইবার মাটি চাপানর পূর্ব্বে এক বা দুইবারে খোলের সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পাতাবাঁধা।—বর্ষা পড়িয়া গেলে জমি হইতে যাহাতে সহজে জল নির্গমণ হইয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বর্ষাকালে ইক্ষুর জমির প্রধান কার্য্য, পাতাবাঁধাই। বঙ্গ দেশেরই কোন কোন স্থানে ইক্ষু-দণ্ডগুলি পত্রের আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে, আর কুত্রাপি এই নিয়ম প্রচলিত নাই। এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবার কারণ ইক্ষুদণ্ডগুলি কীট ও শৃগাল হইতে রক্ষিত হইয়া অপেক্ষাকৃত সতেজে বাড়িয়া যায়। অনাবৃত দণ্ডের "পাব" বা খণ্ডগুলি কীট-দষ্ট ও খর্ব্বাকার হইয়া থাকে। এক একটী ঝাড়ে আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে দুইবার পাতাবাঁধা আবশ্যক হয়। বর্ষাকালের শেষ-ভাগে বায়ুবেগে অনেক ইক্ষুদণ্ড ভূমিসাৎ হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ছয় ফুট অন্তর যদি দুই সারি করিয়া ইক্ষু লাগান যায় তাহা হইলে পাতাবাঁধিবার সময় খুঁটি ও বাতা দ্বারা ইক্ষুদণ্ডগুলি সরল ভাবে বাঁধিয়া দিয়া যাইতে পারিলে উহারা ভূমিসাৎ হইয়া না পড়িয়া ঋজুভাবেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিলাতে ইক্ষু-দণ্ডে পাতাবাঁধিবার নিয়ম নাই; বরং শুষ্ক ও অর্দ্ধ শুষ্ক পত্র ছিঁড়িয়া দিবার নিয়ম আছে।

আক-কাটা।—বর্ষাবসানে যখন জমি শুষ্ক হইয়া যাইবে, যখন গাছের অগ্রভাগের পত্রগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিবে, যখন ইক্ষুদণ্ড আস্বাদন করিয়া সম্পূর্ণ সুমিষ্ট হইয়াছে বুঝা যাইবে, তখন আক্-মাড়াই ও গুড় প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। ভাল করিয়া শীত না পড়িলে গুড় প্রস্তুত আরম্ভ করা উচিত

নহে। ভাল করিয়া শীত পড়িবার পূর্ব্বে যদি দেখা যায় জমি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে অথচ গাছের অগ্রভাগের পাতা শুকাইতে আরম্ভ করে নাই, তখন জমিতে জল-সেচন করিয়া, কোপাইয়া, গাছ যাহাতে আরও বাড়িয়া যায় তাহার উদ্যোগ করা ভাল। শীতাবসানে গ্রীষ্ম পড়িয়া গেলেও ভাল গুড় প্রস্তুত হয় না; এ কারণ নিম্ন বঙ্গে ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বেই গুড় প্রস্তুত কার্য্য শেষ করা ভাল। যদি পৌষ মাসেও দেখা যায় গাছগুলির আগার পাতা শুকায় নাই, অথচ বৃষ্টি হইয়া মৃত্তিকা সিক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন আক্ কাটা কার্য্য ১০।১৫ দিবসের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিলে গুড়ের "ফলন" কিছু অধিক হয়। কিন্তু মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথমে বৃষ্টি হইলে আক্-কাটা বন্ধ রাখিতে নাই, কেননা গ্রীষ্ম পড়িয়া গেলে গুড় ভাল হয় না। আক্গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটা উচিত। বরং চাপান মাটি ভাঙ্গিয়া জমিতে সমান করিয়া দিয়া, কোদালি দ্বারা মৃত্তিকার মধ্যস্থ দুই চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ইক্ষুও কাটিয়া বাহির করা উচিত। এক বিঘা আক কাটিতে ও "ঝুড়িতে" অর্থাৎ আগা বাদ দিয়া পরিষ্কার করিয়া মাড়াইয়ের উপযুক্ত করিয়া লইতে ২০ জন লোক লাগে। খড়ি আক্ কাটিবার ও ঝুড়িবার পরে জমিতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা কীট ও ধসা ইত্যাদি উদ্ভিদণু জনিত রোগের বীজ নষ্ট হইয়া গিয়া, মৃত্তিকার মধ্য হইতে নীরোগভাবে অঙ্কুর সকল পরে বাহির হইয়া থাকে। শ্যামসাড়া ইত্যাদি ইক্ষুও যদি প্রথম বৎসরে ভাল হইয়া না জন্মে, তাহা হইলে দ্বিতীয় বৎসর ঐ একই জমিতে চাষ-আবাদ করিতে পারিলে উহা হইতে উত্তম ফল পাওয়া যায়। খড়ি-আক প্রথম বৎসরে উত্তম জন্মিলেও দ্বিতীয় বৎসরে তদপেক্ষাও উত্তন জন্মে, তবে চাষ-আবাদ, সার-প্রয়োগ, ইত্যাদি অবশ্য আবশ্যক।

আক্ মাড়াই।—আক্ মাড়াই কল্ দুই, তিন বা চারি রোলারের হইয়া থাকে। দুই ও তিন রোলারের লৌহ নির্ম্মিত আক্-মাড়া কল বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বলদের দ্বারা এই কল চালান হয়, এবং একজন মানুষ সর্ব্বদা রোলারের মধ্যে আক্ খাওয়াইতে থাকে। যে রস আক্ হইতে নির্গত হয় উহা একটী পাত্র মধ্যে পড়িতে থাকে। পাত্রটী ভরিয়া আসিলেই আর একটী পাত্র ঐ স্থানে দিয়া, পূর্ব্বোক্ত পাত্রের রস কাল বিলম্ব না করিয়া জ্বাল দিয়া গুড়ে পরিণত করিতে হয়।

রস পরিষ্কার করা।—প্রশস্ত অথচ অনতি-গভীর কটাহে রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হয়। এদেশে রসকে চুণ খাওয়াইয়া গরম করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া পরে পরিষ্কার রস হইতে গুড় প্রস্তুত করার নিয়ম প্রচলিত নাই, কিন্তু ইহা প্রচলিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। গভীর পাত্রে (যথা, কেরোসিন্‌টিনে) রস ঢালিয়া উহা চুলার উপর রাখিয়া, তাপমান যন্ত্র দ্বারা যখন দেখা যাইবে রস ১২৫° ফারেন্‌হিট্ উত্তাপে আসিয়াছে তখন চুণের জল ছিটান আরম্ভ করিতে হইবে। চুণেরজল ছিটাইতে ছিটাইতে দেখিতে হইবে রসের অম্লতা সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে কি না। আকের রস স্বভাবতঃ কিছু অম্ল। মাড়াই হইবার সময় হইতে ফুটাইবার জন্য চুলার উপর পাত্রের মধ্যে ছাঁকিয়া নিক্ষেপ করা পর্য্যন্ত যেটুকু সময় অতিবাহিত হয়, ঐ টুকু সময়ের মধ্যেই রস আরও অম্ল হইয়া উঠে। রসের এই অম্লতা প্রযুক্ত গুড়ে অনেক মাত্ হইয়া থাকে। অম্লতা প্রযুক্ত যে মাতটী জন্মে উহা নিবারণের উপায় চুণের জল দ্বারা অম্লতা কাটাইয়া দেওয়া। ১২৫° হইতে ১৪৫° ফারেন্‌হিট্ উত্তাপেই রস আলোড়ন সহকারে চুণ মিশ্রণ দ্বারা

সুন্দররূপে অম্লতা কাটিয়া থাকে। নীল লিটমস্ কাগজ-খণ্ড * রসের মধ্যে ডুবাইলে যতক্ষণ লাল হইয়া যাইবে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে রস এখনও অম্ল আছে। যখন নীল বর্ণের কাগজ খণ্ডে লালের আভামাত্রও দেখা যাইবে না তখন জানিতে হইবে সম্পূর্ণ চুণ খাওয়ান হইয়াছে। কিন্তু পাছে চুণের মাত্রা কিছু অধিক হইয়া গিয়া থাকে, এ কারণ একসের জলের মধ্যে ৫০ ফোঁটা ফস্ফরিক্ এসিড্ নামক আরক বোতলে রাখিয়া মিশ্রিত করিয়া, ঐ জল অল্প অল্প করিয়া আলোড়ন সহকারে রসে মিশ্রিত করিয়া দিয়া দেখিতে হইবে নীল কাগজ রসে ডুবাইলে যেন ঈষৎ লালের আভা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে রসের উত্তাপ যাহাতে ২০০° ফারেন্ হিট্ পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায় এরূপ ভাবে চুলার মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে হইবে। ২০০° উত্তাপ হইলেই দেখা যাইবে ভাসমান গাদের নিম্নেকার রস স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, এবং যত ময়লা জটা বাঁধিয়া পরিষ্কার রসের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে রসের পাত্র চুলা হইতে নামাইয়া, ভাসমান গাদ ফেলিয়া দিয়া, দুই এক ঘণ্টা রসকে স্থির হইতে দিতে হয়। দুই-এক ঘণ্টা রস স্থির হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট ময়লা সমস্ত পাত্রের নিম্নে জমাট হইয়া থাকিবে। অধিকাংশ রস কাচের সাইফন্ নল দ্বারা টানিয়া লইয়া সর্ব্বনিম্নস্থ গাদ-সমেত রস ডবল ফ্লানেলের কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া, সমস্ত রসটী জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হয়। এই গুড় অতি পরিষ্কার ও সার-পূর্ণ হইয়া থাকে।

* লিট্ মস্-কাগজ ক্রয় না করিয়া লাল কপির পাতা বা রক্ত জবাফুলের পাপ্ড়ির রস বাহির করিয়া কাগজে মাখাইয়া রং করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিয়া লওয়া চলে।

শর্করা-প্রস্তুত।—গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে গুড়ের কলসী বা পিপার নিম্নে ছিদ্র করিয়া দিয়া, মাত্ বাহির করিয়া লইয়া, গরম জলের সহিত অবশিষ্ট সার-গুড় মিশ্রিত করিয়া দিয়া, উহার সহিত কিছু চুণ মিশাইয়া, ফ্লানেলের কাপড়ের মধ্য দিয়া এবং অস্থির কয়লার ফিল্টারের মধ্য দিয়া, চালিত করিয়া লইয়া, শেষে রসটী তাম্র পাত্রে ফুটাইতে হয়। ফুটাইতে ফুটাইতে রস যখন ঘন হইয়া আইসে তখন উহাকে লৌহের কুঁদার মধ্যে পাতিত করিতে হয়। এই সকল কুঁদার নিম্নভাগ সূক্ষ্ম ও সছিদ্র। এই ছিদ্র পথে যাহা কিছু মাত্ থাকে উহা বাহির হইয়া যায়, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা পরিষ্কার শর্করা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। কোন্ কোন্ পদার্থ হইতে শর্করা প্রস্তুত করা হয়?

২। ইক্ষুর চাষ কোন্ দেশে ভাল হইয়া থাকে?

৩। বঙ্গদেশে কোন্ কোন্ জাতীয় ইক্ষু জন্মাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে?

৪। খড়ি-আক্ জন্মাইবার সাপক্ষে কতকগুলিন হেতু নির্দ্দেশ কর।

৫। ইক্ষুর কলমে কি উপায়ে ট্যাঁক্ বাহির করিতে হয়?

৬। ইক্ষুর কলম একমাস কাল রক্ষা করিতে হইলে কি উপায়ে রক্ষা করিতে হয়?

৭। ইক্ষুর কলম শোধন করিয়া লইতে হইলে উহাদের কি করা আবশ্যক?

৮। কিরূপ প্রণালীতে ইক্ষু লাগান উচিত? এদেশে কি প্রণালীতে ইক্ষু লাগান হইয়া থাকে?

৯। একবিঘা জমি লাগাইতে হইলে কত আকের কলম আবশ্যক?

১০। ইক্ষু-দণ্ডের কোন্ অংশটী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কলম সংগ্রহ হইয়া থাকে?

১১। জমিতে কলম লাগাইবার পূর্ব্বে জমির কি কি পাইট্ আবশ্যক?

১২। কলম লাগাইবার সময়ে কি প্রণালীতে উহা লাগান আবশ্যক? কোন্ সময়ে কলম লাগান আবশ্যক?

১৩। ইক্ষু-ক্ষেত্রে জল দিবার নিয়ম কি? শ্যামসাড়া ও খড়ি ইক্ষুর মধ্যে জল-সেচন সম্বন্ধে কি প্রভেদ করা আবশ্যক?

১৪। জল-সেচনের পরে কোন্ পাইট্টী অত্যাবশ্যক? ইহার হেতু কি?

১৫। কি পর্য্যায়ে ইক্ষু লাগাইলে জমির ও ফসলের উৎকর্ষ-সাধন হয়?

১৬। ইক্ষুর জমিতে কোন্ সময়ে কি পরিমাণে, কোন সার দেওয়া উচিত?

১৭। বর্ষা শেষ হইয়া গেলে ইক্ষুর জমিতে কি পাইট আবশ্যক? বর্ষার সময়ে কি কি পাইট্ অবেশ্যক?

১৮। পাতা-বাঁধাই দ্বারা ইক্ষুর কি উপকার হয়?

১৯। ইক্ষু-দণ্ড পাকিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ, কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে, ইহা জানিবার উপায় কি?

২০। গুড় প্রস্তুতের কোন্টী প্রশস্ত সময়?

২১। আক্ কাটা হইয়া গেলে খড়ি আকের জমিতে কি করা আবশ্যক?

২২। আক্ মাড়াই বর্ণনা কর।

২৩। চুণ খাওয়াইয়া রস কিরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয় তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর।

২৪। রস অম্ল হইলে গুড়ে কি দোষ ঘটে?

২৫। গুড় প্রস্তুতের প্রকৃষ্ট নিয়ম বর্ণনা কর।

২৬। গুড় হইতে শর্করা প্রস্তুতের নিয়ম বর্ণনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কৃষি-পর্য্যায়।

প্রথম উদ্দেশ্য।—কৃষি-পর্য্যায় প্রথার, অর্থাৎ জমি ভাগ করিয়া চাষ করার কথা, ইতিপূর্ব্বে নানাস্থানে উল্লেখ করা গিয়াছে। যদি কাহারও ১০০ বিঘা জমি চাষ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহার উচিত, ১০ বিঘা জমি রাস্তা ও আইলের জন্য বাদ দেওয়া, ৫ বিঘা জমি পুষ্করিণী, শাঁকো, জল দিবার প্রণালী ও জল নির্গমণের প্রণালী জন্য বাদ দেওয়া, এবং আর ৫ বিঘা বাসগৃহ, গুদাম, সারের গাদার চালা, গো-শালা, ও খামারের জন্য বাদ দেওয়া। অবশিষ্ট ৮০ বিঘা জমি পাঁচ বৎসরের পর্য্যায়ে চাষ করিতে হইলে প্রতি বৎসরে ১৬ বিঘা জমি পতিত রাখা ভাল। এই জমি গো-চারণ কার্য্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এক বৎসর এক পঞ্চম ভাগ জমি, অর্থাৎ

১৬ বিঘা জমি, পতিত রাখিয়া, পর বৎসর আর এক পঞ্চম ভাগ, অর্থাৎ অপর একখণ্ড ১৬ বিঘা পরিমাণ জমি পতিত রাখিয়া, ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরে সমস্ত জমি এক বৎসর বিনা ফসলে পতিত রাখিয়া উহার উপরে গো-মহিষকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া, উহাকে উর্ব্বর করিয়া লইতে হয়। এরূপ ভাবে কার্য্য করিলে সারের খরচ প্রায় বাঁচিয়া যায়। গো-মহিষকে খাওয়াইবার জন্য খোল বাহির হইতে ক্রয় করিয়া আনা উচিত। ইহা দ্বারা জমির উর্ব্বরতা হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।—কৃষি-পর্য্যায়ের আর এক উদ্দেশ্য, একই জমির উপর উপর্য্যুপরি দুইবার একই প্রকারের ফসল না লাগাইয়া, বিভিন্ন জাতীয় ফসল লাগান। যে জমিতে এ বৎসর ধান্য লাগান হইল, পর বৎসর সে জমিতে ধান না লাগাইয়া পাট লাগান উচিত। তৎ-পর-বৎসর ঐ জমিতে ধান না লাগাইয়া যদি আক বা অড়হর লাগান হয় তাহা হইলে আরও ভাল। এক বৎসর অন্তর যদি একই জমিতে একবার করিয়া ধান, বা পাট, বা অড়হর, বা আক্ লাগান হয়, তাহা হইলে উহাকে দুই বৎসরের পর্য্যায় কহে। দুই বৎসর অন্তর যদি একই জমিতে একবার করিয়া এই সকল ফসল লাগান হয়, তাহা হইলে উহাকে তিন বৎসরের পর্য্যায় কহে। তিন বৎসর অন্তর একবার করিয়া একই জমিতে এই সকল ফসল জন্মাইলে উহাকে চারি বৎসরের পর্য্যায় কহে। চারি বৎসর অন্তর এই সকল যদি একই জমিতে একবার করিয়া জন্মান হয়, ইহাকে পাঁচ বৎসরের পর্য্যায় কহে। চারি বৎসর অন্তর একবার করিয়া একখণ্ড জমি যদি পতিত রাখা হয়, তাহাকেও পাঁচ বৎসরের পর্য্যায় কহে। এইরূপ ছয় বৎসরের, সাত বৎসরের ও আট-বৎসরের পর্য্যায়ও হইতে

পারে। একই জমিতে পুনঃপুনঃ একই রকম ফসল জন্মাইলে জমি ঐ ফসলের পক্ষে ক্রমশঃ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে এবং ঐ ফসলে যে সকল ব্যাধি হইয়া বা কীট লাগিয়া ক্ষতি হয়, ঐ সকল ব্যাধি ও কীট ক্রমশঃ উক্ত জমিতে বাড়িতে থাকে। উর্ব্বর দো-আঁশ জমি পতিত ফেলিয়া না রাখিয়া, সার প্রয়োগ দ্বারা প্রতি বৎসরেই চাষ করা ভাল।

তৃতীয় উদ্দেশ্য।—কৃষি-পর্য্যায়ের আর একটী উদ্দেশ্য, মধ্যে মধ্যে অড়হর, ধইঞ্চা, নীল, শন, কলাই, মুগ, ছোলা, চীনারবাদাম, ইত্যাদি সুঁটি-প্রদ বা কলাই জাতীয় ফসল জন্মাইয়া জমির তেজঃ বৃদ্ধি করিয়া লওয়া। যদি কাহারও এমন উদ্দেশ্য থাকে কেবল ইক্ষু বা আলু জন্মাইয়া বিশেষ লাভবান হইব, তথাপি তাঁহার কৃষি-পর্য্যায় অবলম্বন করিয়া, চারি পাঁচটী ফসল জন্মাইয়া ইক্ষু বা আলুর আবাদ রক্ষা করা আবশ্যক হইবে, নতুবা কীট ও ব্যাধি দ্বারা কেবল আলু বা ইক্ষু জন্মান কয়েক বৎসরের মধ্যে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। আলু ও ইক্ষু জন্মাইতে এত অধিক সার আবশ্যক হয়, এবং এই সকল ফসল জমিকে এত নিস্তেজ করিয়া ফেলে, যে মধ্যে মধ্যে ধইঞ্চা, অড়হর, বর্ব্বটী প্রভৃতি সুঁটি-প্রদ ফসল জন্মাইয়া জমিকে সারবান করিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সারে আলু বা ইক্ষু জন্মানতে বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। আনুসঙ্গিক ভাবে এ সকল ফসল জন্মা-ইবার কারণ, ইক্ষুর বা আলুর আবাদকে, চাষের জমি না বলিয়া আবাদ বলা চলিতে পারে। ধান, পাট, ইত্যাদি যে সকল ফসল সাধারণতঃ কৃষক গণ জন্মাইয়া থাকে উহাদের দ্বারা জমির বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, এ কারণ বিশেষ ফসল-পর্য্যায় অবলম্বন না করিয়াও কৃষকগণ পর্য্যায়ের অভাবে তাদৃশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফসল-পর্য্যায়ের একটী সুন্দর উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

ক

উচ্চ ও বালুকা-প্রধান অথবা দোআঁশ মৃত্তিকার উপযোগী পাঁচ বৎসরের পর্য্যায়।

	(১ম খণ্ড ভূমি)	(২য় খণ্ড ভূমি)	(৩য় খণ্ড ভূমি)	(৪র্থ খণ্ড ভূমি)	(৫ম খণ্ড ভূমি)
(১ম বৎসর)	আশু-ধান্য (বৈশাখ হইতে ভাদ্র) এবং কলাই ও সর্ষপ (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)	পাট (বৈশাখ-আশ্বিন) এবং মুগ ও তিল (কার্ত্তিক-চৈত্র)।	আশু-ধান্য (বৈশাখ-আশ্বিন) এবং আলু (কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন)	ইক্ষু (ফাল্গুন হইতে ফাল্গুন)	আশু-ধান্য (বৈশাখ আশ্বিন) এবং কলাই (কার্ত্তিক-চৈত্র)
(২য় বৎসর)	আশু-ধান্য (বৈশাখ আশ্বিন) এবং কলাই (কার্ত্তিক-চৈত্র)	আশু-ধান্য (বৈশাখ ভাদ্র) এবং কলাই ও সর্ষপ (কাঃ-চৈত্র)	পাট (বৈশাখ-আশ্বিন) এবং মুগ ও তিল (কার্ত্তিক-চৈত্র।)	আশু-ধান্য (বৈশাখ-আশ্বিন) এবং আলু (কার্ত্তিক-ফাল্গুন।)	ইক্ষু (ফাল্গুন হইতে ফাল্গুন)।
(৩য় বৎসর)	ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন)।	আশু-ধান্য (বৈশাখ-আশ্বিন) এবং কলাই (কার্ত্তিক-চৈত্র।)	আশু-ধান্য (বৈশাখ ভাদ্র) এবং কলাই ও সর্ষপ (কার্ত্তিক-চৈত্র	পাট (বৈশাখ-আশ্বিন) এবং মুগ ও তিল (কার্ত্তিক-চৈত্র।)	আশু-ধান্য (বৈশাখ-আশ্বিন) এবং আলু (কার্ত্তিক-ফাল্গুন।)

(৪র্থ বৎসর)	আশু-ধান্য(বৈশাখ-আশ্বিন)এবং আলু (কার্ত্তিক-ফাল্গুন।	ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন।)	আশু-ধান্য বৈশাখ-আশ্বিন)এবং কলাই (কার্ত্তিক-চৈত্র।)	আশু-ধান্য(বৈশাখ-ভাদ্র) এবং কলাই ও সর্ষপ (কার্ত্তিক-চৈত্র)।	পাট বৈশাখ-আশ্বিন) এবং মুগ ও তিল (কার্ত্তিক-চৈত্র)।
(৫ম বৎসর)	পাট(বৈশাখ-আশ্বিন) এবং মুগ ও তিল (কার্ত্তিক-চৈত্র)।	আশু ধান্য(বৈশাখ-আশ্বিন)এবং আলু (কার্ত্তিক-চৈত্র।)	ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন)।	আশু-ধান্য (বৈশাখ-আশ্বিন)এবং কলাই (কার্ত্তিক-চৈত্র)।	আশু-ধান্য(বৈশাখ-ভাদ্র) এবং কলাই ও সর্ষপ (কার্ত্তিক-চৈত্র)।

খ। নিম্ন ও কর্দ্দম-প্রধান মৃত্তিকার উপযোগী ছয় বৎসরের পর্য্যায়।

	(১ম খণ্ড ভূমি)	(২য় খণ্ড ভূমি)	(৩য় খণ্ড ভূমি)	(৪র্থ খণ্ড ভূমি)	(৫ম খণ্ড ভূমি)	(৬ষ্ঠ খণ্ড ভূমি)
(১ম বৎসর)	আমন-ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ), তরমুজ, ফুটি, ঝিঙ্গা মাঃ (বৈঃ)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ—পৌষ)।	পাট (বৈশাখ-আশ্বিন), খেসারি ও মুসুর (কার্ত্তিক-ফাল্গুন)।	আমন ধান্য(জ্যৈঃ-পৌষ)অথবা জলী ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন)।	আমন-ধান্য (জ্যৈষ্ঠ পৌষ।)	পতিত
(২য় বৎসর)	পতিত	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ) তরমুজ, ফুটি, ও ঝিঙ্গা (মাঘ-বৈশাখ)।	আমন-ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)।	পাট (বৈশাখ-আশ্বিন), গম ও মসিনা (কাঃ-চৈত্র)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ পৌষ) অথবা জলী ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)।
(৩য় বৎসর)	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)	পতিত	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ), তরমুজ, উচ্ছে, ঝিঙ্গা (মাঃ-বৈঃ)	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ) পৌষ)।	পাট (বৈশাখ-আশ্বিন) গমও মসিনা বা খেসারি ও মুসুরি (কার্ত্তিক-চৈত্র)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ) বা জলী-ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন)।

(৪র্থ বৎসর)	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)। অথবা জলী ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)	পতিত	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ) তরমুজ, উচ্ছে, ইত্যাদি (মাঘ-বৈশাখ)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)।	পাট (বৈশাখ আশ্বিন) গম, খেসারি, মসিনা, ইঃ (কাঃ-চৈঃ)
(৫ম বৎসর)	পাট (বৈশাখ-আশ্বিন), গম, খেসারি, মুসুরি, মসিনা, ইঃ, (কার্ত্তিক-ফাল্গুন)	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ) অথবা জলী ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন)	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)	পতিত	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ) তরমুজ ও তরকারী (মাঘ-বৈশাখ)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)।
(৬ষ্ঠ বৎসর)	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)।	পাট (বৈশাখ-আশ্বিন), গম, মুসুরি মসিনা (কার্ত্তিক চৈত্র)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ) অথবা জলী ইক্ষু (ফাল্গুন-ফাল্গুন)।	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)।	পতিত	আমন ধান্য (জ্যৈষ্ঠ পৌষ) এবং তরি তরকারি-(মাঃ-বৈশাখ)

গ।

উর্ব্বর উচ্চ, বালুকা-প্রধান অথবা দো-আঁশ মৃত্তিকার উপযোগী বিশেষ বিশেষ পর্য্যায়।

(১) এক বৎসরে তিনটী ফসল।

১ম ফসল। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত অধিক সার-প্রয়োগ দ্বারা আলু।

২য় ফসল। আলুর পরেই চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বিনাসারে অপক্ব অবস্থায় পাড়িবার জন্য ভুট্টা। অথবা ধনিচা।

৩য় ফসল। ভুট্টার পরে একমাস চাষ আবাদ করিয়া, সার দিয়া, রোপা আশু-ধান্য। ভুট্টার পরিবর্ত্তে যদি ধনিচা লাগাইয়া চষিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বিনা-সারে আশু-ধান্য রোপা যাইতে পারে।

[চৈত্র বৈশাখে যে যে স্থানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয় সেই সেই স্থানে এই পর্য্যায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।]

(২) তিন বৎসরে ছয়টী ফসল।

১ম ফসল। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত আলু।

২য় ফসল। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কাঁচা পাড়িবার জন্য ভুট্টা।

৩য় ফসল। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ধনিচা।

৪র্থ ফসল। কার্ত্তিক হইতে, ফাল্গুন পর্য্যন্ত আলু।

৫ম ফসল। ফাল্গুন হইতে মাঘ ইক্ষু।

৬ষ্ঠ ফসল। চৈত্র হইতে আশ্বিন ধনিচা।

[এই পর্য্যায় অবলম্বন করিতে হইলে ধনিচার বীজ ভুট্টা গাছে মাটি চাপাইবার পরেই ছিটান উচিত।]

(৩) দুই বৎসরে তিনটী ফসল।

১ম বৎসর, ১ম ফসল। ধনিচা জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র।
„ ২য় ফসল। আলু বা কপি কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন।
২য় বৎসর, ৩য় ফসল। ইক্ষু ফাল্গুন হইতে মাঘ।

পর্য্যায়ের উপযোগিতা।—বৃহৎ নগরের সন্নিকটে অধিক মূলধন লইয়া কার্য্য করিতে পারিলে, আলু, কপি, চিবাইয়া খাইবার উপযুক্ত শ্যামসাঁড়া বা বোম্বাই আক্, এবং সাদা ও সুমিষ্ট দানা যুক্ত জোয়ান-পুরের ভুট্টা কাঁচা অবস্থায় পাড়িবার জন্য লাগাইলে, বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। কাঁচা অবস্থায় মকাগুলি বিক্রয় করিয়া ভুট্টার ডাঁটাগুলি সাইলেজ বা পিষ্ট-উদ্ভিজ্জ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া লইয়া, মাঘ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত গোরুকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া দুগ্ধ বিক্রয়ের ব্যবসায় চালাইতে পারিলে আরও লাভবান হওয়া যায়। অন্য কয়েক মাস খোল, বিচালি, ঘাস, ইত্যাদি ক্রয় করিয়া গোরুকে খাওয়াইলে, গোবর সার মাত্র ব্যবহার দ্বারা মৃত্তিকার উর্ব্বরতা রক্ষিত হইবে। সাধারণ কৃষকদিগের পক্ষে ধান, পাট, কলাই, ইত্যাদি ফসল লাগানই উচিত। উহাদের জন্য ক ও খ চিহ্নিত পর্য্যায় দুইটী বিশেষ উপযোগী। ফসল ও মৃত্তিকা ভেদে সহস্র সহস্র প্রকার কৃষি পর্য্যায় বর্ণণা করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্থলে পাঁচটী মাত্র পর্য্যায় উপরে বিবৃত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। কৃষি-পর্য্যায়ের উদ্দেশ্য গুলি বর্ণনা কর।

২। ১০০ বিঘা জমি চাষ করিতে হইলে কিরূপে জমি বিভাগ করিয়া কার্য্য করা যাইতে পারে, একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। দুই বৎসরের পর্য্যায়, তিন বৎসরের পর্য্যায়, চারি বৎসরের পর্য্যায়, ইত্যাদি কথার অর্থ কি ?

৪। জমি পতিত ফেলিয়া রাখায় লাভ কি? কিরূপ জমি মধ্যে মধ্যে পতিত রাখায় লাভ আছে ?

৫। ধনিচা লাগাইবার পরে কোন্ কোন্ ফসল লাগান উচিত ?

৬। কোন্ কোন্ ফসল জন্মাইলে জমি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া যায় ? কোন্ কোন্ ফসল জন্মাইলে জমির বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না ? কোন্ কোন্ ফসল দ্বারা জমির ক্ষতি না হইয়া আরও উন্নতি হয় ?

৭। যদি কেহ ইক্ষু অথবা আলুর আবাদ করিতে চাহেন তাঁহার কি নিয়মে কার্য্য করা আবশ্যক ?

৮। উচ্চ ও বালুকা-প্রধান অথবা দো-আঁশ মৃত্তিকার উপযোগী একটী ফসল-পর্য্যায় বর্ণনা কর।

৯। নিম্ন ও কর্দ্দম প্রধান মৃত্তিকার উপযোগী একটী ফসল-পর্য্যায় বর্ণনা কর।

১০। উর্ব্বর, উচ্চ, বালুকা-প্রধান অথবা দো-আঁশ মৃত্তিকার উপযোগী এবং ধনী ব্যক্তির অবলম্বনীয় একটী ফসল-পর্য্যায় বর্ণনা কর।

১১। বৃহৎ নগরের সন্নিকটে কোন ধনী ব্যক্তি মূল্যবান কয়েকটী ফসল লাগাইয়া লাভবান হইবার মানস করেন। তাঁহার অবলম্বনীয় একটী ফসল-পর্য্যায় বর্ণনা কর।

১২। এক বৎসরের মধ্যে তিনটী ফসল লইবার কোন উপায় আছে কি না ?

১৩। কাঁচা মকা বিক্রয় করাতে কৃষি-পর্য্যায়ের কিরূপ সুবিধা হয় বর্ণনা কর।

ষোড়শ অধ্যায়।

গবাদির আহার ও সেবা।

উদ্দেশ্য স্থির।—শকট-বহন, ভূমি কর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে, এবং দুগ্ধ ও ঘৃত লাভার্থ, এদেশে গো ও মহিষ পালিত হয়। গো ও মহিষ জাতির উন্নতি করিতে হইলে এই দুই প্রকার উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া উহাদের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক। যেরূপ ভাবে জন্তু দিগের পালন করিলে উহাদের বল ও কার্য্য ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, ঠিক্ সেইরূপ ভাবে পালন করিলে দুগ্ধবতী গাভী অথবা মহিষীর দুগ্ধদানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া থাকে। বল ও কার্য্যক্ষমতা যেরূপ জনক ও প্রসূতি হইতে বৎসে অনুগামী হয়, দুগ্ধদান ক্ষমতাও ঠিক্ সেইরূপ হইয়া থাকে। এ কারণ হলও শকট বহনের উপযোগী গো-মহিষ, দুগ্ধ-দোহনার্থ গো-মহিষের সহিত একত্র পালিত না করিয়া, সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে পালিত করা কর্ত্তব্য। উহাদের পৃথক্‌ভাবে আহারাদির ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ একই ব্যক্তির পক্ষে দুই প্রকার জন্তু পালন না করিয়া একই উদ্দেশে একই প্রকার জন্তুর পালন বিধেয়। ইহা দ্বারা যে উদ্দেশ্যে জন্তু পালিত হইতেছে ঐ উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণুভাবে সাধিত হইতে থাকে; অর্থাৎ, দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী কাল-সহকারে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দিতে থাকে, এবং কার্য্যকারী বৃষাদি কাল-সহকারে উত্তরোত্তর অধিক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইতে থাকে।

দুগ্ধবতী গাভী ও উহার উপযুক্ত বৃষ।—দুগ্ধবতী গাভীর বা মহিষের একটী জাতি সৃজন করিতে হইলে প্রথমতঃ কয়েকটী সুলক্ষণ দেখিয়া কয়েকটী গাভী ও মহিষী ও একটী বৃষ বা মহিষ ক্রয় করা আবশ্যক। এ গুলির গ্রীবা ক্ষীণ, পশ্চাৎভাগ বিশাল, পা-গুলিন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম, গাত্র মসৃণ, লাঙ্গুল বহুপুচ্ছ বিশিষ্ট ও মৃত্তিকা-স্পর্শী হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদের প্রকৃতি শান্ত, গতি মন্থর এবং পানাহারের তীক্ষ্ণ প্রবৃত্তি হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় কোন একটী জাতি হইতেই প্রথম গাভীগুলি নির্ব্বাচিত হওয়া ভাল, কেননা বিদেশীয় বা বিভিন্ন জল-বায়ু সহিষ্ণু গাভী নূতন স্থানে আনীত হইলে প্রায় পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। স্থানীয় জন্তুর উন্নতি-সাধন যত অল্পায়াস-সাধ্য বিদেশীয় জন্তুর উন্নতিসাধন তাদৃশ নহে। তবে অনেক কাল ধরিয়া কোন বিদেশীয় জাতি কোন স্থানে বাস করিবার কারণ যদি উহাদের ঐ স্থানের জল-বায়ু সহ্য হইয়া গিয়া স্থানীয় জাতিদের ন্যায়ই রৌদ্র ও বৃষ্টি ভোগ করিয়াও পীড়াগ্রস্ত হয় না এমন দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ জাতীয় গাভী অধিক দুগ্ধ দান করিলে উহারই কয়েকটী নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। যে আকারের গাভী লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে, বৃষও সেই আকারের হওয়া কর্ত্তব্য। বৃহদাকারের বৃষ ব্যবহার দ্বারা প্রসবকালে গাভীর অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে। দেখিতে ক্ষীণ অথচ ৩।৪ সের দুগ্ধ দেয় এই প্রকার ক্ষুদ্রাকারের দেশী গাভী লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা ভাল।

পালন-নিয়ম।—এরূপ ক্ষুদ্র কয়েকটী দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া, উহাদের এমনভাবে পালিত করিতে হইবে যাহাতে উহাদের দুগ্ধ দিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়িইয়া যাইতে

থাকে। দুগ্ধবতী জন্তুর জল, বায়ু, ও রৌদ্র সহ্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এ কারণ এ জাতীয় জন্তুগুলির জন্য পরিষ্কার গৃহ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় ইহাদের মাঠে রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু দিবাভাগে রৌদ্রতাপের আতিশয্য হইলে ইহাদের বৃক্ষতলে বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক, এবং রাত্রিকালে গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া যাহাতে মশকের দংশনে উহারা কষ্ট না পায় এঁ কারণ ক্ষণেককাল ধরিয়া গৃহাভ্যন্তরে ধুনার বা ঘুঁটের ধূম করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। গোশালা এমন পরিষ্কার রাখিতে হয় যেন উহাতে প্রবেশ মাত্র এমন বোধ না হয় যে গৃহটী মানুষের বাসের অনুপযুক্ত। যে গৃহে মানুষে শীতে, অথবা গ্রীষ্মে, অথবা টানা বাতাসে, অথবা বৃষ্টির ছাটে, অথবা দুর্গন্ধে, অথবা মৃত্তিকার সিক্ততার কারণ, কষ্ট পায়, সেরূপ গৃহে দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষকে রাখা উচিত নহে। যে সকল গো-মহিষ শকট বা হল বহনের জন্য রক্ষিত হয় উহাদের রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত ইত্যাদি ভোগ করাইয়া কষ্ট-সহিষ্ণু করা ভাল, কিন্তু বলিষ্ঠ ও কষ্ট-সহিষ্ণু করিতে গেলে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষীর দুগ্ধ কমিয়া যায়।

দুগ্ধ প্রদায়িণী শক্তির বৃদ্ধি।—গবাদি জন্তুর দুগ্ধ প্রদায়িণী শক্তি বাড়াইবার জন্য কয়েকটী বিশেষ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

১ম,—গাভীর প্রথম বৎস জন্মিবার পর হইতেই উহাকে দশ এগার মাস পর্য্যন্ত দোহন করা উচিত। দ্বিতীয় বৎস জন্মিবার একমাস মাত্র পূর্ব্বে দোহন রহিত করা উচিত। ইহা দ্বারা গাভীর শেষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ, প্রসবের একমাস পূর্ব্বে পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিবার অভ্যাস থাকিয়া যায়।

২য়,—বৎসের মায়া করিয়া অথবা আলস্য হেতু আংশিক পরিমাণে দুগ্ধ দোহন করা কখনই উচিত নহে। যতদূর সম্ভব টানিয়া দুগ্ধ দোহন করা উচিত। ইহাতে গাভীর দুগ্ধ দানের ক্ষমতা বিশেষ বাড়িয়া

যায়। ভাগ করিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়া পরে বাছুরকে মাতার নিকটে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে গাভীর বাঁটের ছিদ্রগুলি পরিষ্কার থাকে এবং পালানে দুগ্ধ জমিবার আশক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

৩য়,—প্রত্যহ এক বা দুইবার অপেক্ষা তিন বা চারিবার দুগ্ধ দোহন করিলে, গাভীর দুগ্ধ দানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। অন্ততঃ দুই সন্ধ্যা দুগ্ধ-দোহন না করিলে গাভীর দুগ্ধ দানের আসক্তি হ্রাস হইয়া আইসে।

৪র্থ,—প্রত্যহ একই সময়ে ও একই লোকের দ্বারা দোহন কার্য্য করান কর্ত্তব্য। লোক পরিবর্ত্তন ও সময় পরিবর্ত্তন দ্বারা দুগ্ধ দিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যায়।

৫ম,—প্রত্যেকবার দিবসের মধ্যে অথবা অন্ততঃ একবার দুগ্ধ দোহনের পরে 'পালানের' গাত্রে রেড়ির তৈল মালিশ করিয়া দিলে জন্তুদিগের দুগ্ধ দিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। বাঁটে যেন রেড়ির তৈল না স্পর্শ করে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

৬ষ্ঠ,—দুগ্ধ দোহন কালে জন্তুদিগকে কিছু সুখাদ্য সামগ্রী আহার করিতে দেওয়া উচিত,—যথা, কলাইয়ের ভুষি, খৈল, লবণ, গুড়, ইত্যাদি। দুগ্ধ দিবার জন্যই গৃহ-স্বামী এই সকল সুখাদ্য সামগ্রী খাইতে দেন, ইহা জানিতে পারিয়া, জন্তুগণ যত্ন সহকারে ও নির্বিবাদে দুগ্ধ দান করে।

৭ম,—দুগ্ধের পরিমাণ ও মিষ্টতা বৃদ্ধি করিবার উপযোগী খাদ্য গাভী বা মহিষীকে দেওয়া উচিত। খাদ্য সম্বন্ধে এই কয়েক প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে :—

(ক) যেখানে যথেষ্ট চরাইবার মাঠ আছে ও যেখানে মাঠে অপর্য্যাপ্ত ঘাস জন্মিয়া থাকে, সেখানে প্রত্যহ দুইসের মাস কলাই

সিদ্ধ করিয়া, একসের জুয়ার বা দেব-ধান্তের ছাতু ও পাঁচসের ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধবতী গাভীকে খাইতে দিলে উহার দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে; অথবা, কেবল মাত্র দুইসের ছোলার ডাল সমস্ত দিবস জলে ভিজাইয়া সন্ধ্যার সময় খাইতে দিলেও গোরুর দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে।

(খ) অতি প্রত্যুষে, অর্থাৎ, রাত্রি দুই তিনটার সময় হইতে, গোরুকে চরাইতে পারিলে গোরুর দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। দিবসেও নিয়মিত দুই তিন ঘণ্টা চরান আবশ্যক।

(গ) কুলের পল্লব ও পত্র কুচাইয়া কাটিয়া উহার সহিত দুই-একসের কার্পাসের বীজ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলেও দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। এ স্থলেও গরুকে নিয়মিত চরান আবশ্যক।

(ঘ) কাঁটানোটে গাছ, কাঁচা বেল মাস-কলাই ও খুদ একত্রে সিদ্ধ করিয়া সমস্ত দিবস মাঠে চরিবার পরে সন্ধ্যার সময় গোরুকে খাইতে দিলে উহার দুধ বাড়ে।

(ঙ) যেখানে চরিবার বড় সুযোগ নাই সেস্থানে প্রত্যহ দুইটা করিয়া 'ছানি' দিতে পারিলে গোরুর দুগ্ধ বাড়ে। প্রত্যেক বার একসের করিয়া খৈল জলে ভিজাইয়া দিয়া, উহার সহিত এক মুঠা লবণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া উহা পাঁচসের কাটা বিচালি বা ভুসার সহিত মিলাইয়া দিলেই 'ছানি' দেওয়া হইল। অর্দ্ধসের খৈলের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধসের গুড় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চ্ম্ম্—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার অথবা পরিস্কৃত জল পানের ব্যবস্থা গো-শালার মধ্যে থাকা বিশেষ আবশ্যক। দশ সের শুষ্ক খাদ্যের সহিত একমণ জল যোগান আবশ্যক। কিন্তু আহার্য্য সামগ্রীগুলি জল-পূর্ণ হইলে একটা বেশী

গোরু একমণ জল খাইতে পারে না। সকল গোরু সকল ঋতুতে সমান পরিমাণে আহার ও জলপান করে না। বৃহদাকারের গোরু প্রত্যহ একমণেরও অধিক আহার করে। বঙ্গদেশের গোরু সাধারণতঃ অর্দ্ধমণ মাত্র আহার করিয়া থাকে। কিন্তু শুষ্ক আহার দিতে হইলে প্রত্যহ দশ বারসের মাত্র দিলেই যথেষ্ট হয়, অর্থাৎ, প্রাতঃকালে ৫ সের খড় বা ভুসি একসের খৈল ও গুড় এবং সন্ধ্যার সময় আর ৫ সের খড় বা ভুসা, ও আর একসের খৈল ও গুড় প্রত্যেক বার অর্দ্ধমণ বা পঁচিশ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

গাভীর যত্ন।—গোরুর দুগ্ধ শুকাইয়া গেলে উহাকে মাঠে রাখিয়া সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ একটী মাত্র 'ছানি' দেওয়া উচিত। ঐ ছানির জন্য অর্দ্ধসের মাত্র খৈল বা কার্পাসের বীজ ও দুই তিন-সের মাত্র খড় বা ভুসা ব্যবহার করা উচিত। প্রসবের পূর্ব্বে গাভী কিছু কৃষ হইয়া যায় তাহাতে ক্ষতি নাই; মোটা হইলে ক্ষতি আছে। প্রসব হইতে আর তিন চারিদিন মাত্র বিলম্ব আছে যখন এরূপ বোধ হইবে, তখন প্রত্যহ অর্দ্ধসের যবসিদ্ধ, একপোয়া গুড়, অর্দ্ধ-পোয়া সর্ষপ বা মসিনার তৈল ও অর্দ্ধ ছটাক লবণ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা প্রসবান্তে গোরুর দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। প্রসবান্তে ৪।৫ দিবস জন্তুদের জলীয় পদার্থ আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। খড় (২।৩ আঁটি মাত্র), গমের ভুসি, (অর্দ্ধসের), গুড় (একপোয়া), মেথি (এক ছটাক), আদ্রক বা শুঁট (অর্দ্ধপোয়া), তৈল (অর্দ্ধপোয়া), এই সকল সামগ্রী ৪।৫ দিবস খাইতে দিয়া পরে খুদ ও কলাই সিদ্ধ, দুগ্ধ ও গুড়ের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। পরে ৫।৭ আঁটি খড়ের সহিত প্রত্যহ একপোয়া

গুড়, একসের কলাই ও অর্দ্ধসের চালের খুদ ব্যবহার করা ভাল। প্রসবের পরে তিন সপ্তাহ ধরিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া উহা গাভী বা মহিষীকেই খাইতে দেওয়া উচিত, কেননা এই সময়ের দুগ্ধ পান করিলে মানুষের উদরাময় পীড়া হওয়া সম্ভব। বাছুর খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহা দোহন করিয়া গরুকেই গুড়, কলাই ও খুদের সহিত জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতেও গোরুর দুধ বাড়ে। প্রত্যেক বারে দুগ্ধ দোহনের পরে বাছুরকে গাভীর সহিত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বাছুর বাঁটের ছিদ্র পরিষ্কার রাখিয়া ঠুন্‌কা রোগ হইতে দেয় না। প্রসবান্তে ২১ দিবস পরে প্রায় দুগ্ধের পরিমাণ স্বভাবতঃই বাড়িয়া থাকে। এই সময়ে দোহনাদি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত লোককে কখনই পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। এ সময়ে গোরুকে স্থানান্তরিত করিলেও দুধ না বাড়িয়া বরং কমিয়া যায়। যদি গোরু স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রসবের দুই মাস পূর্ব্বে অথবা প্রসবের এক সপ্তাহ পরে কিন্তু তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে করা উচিত। তিন সপ্তাহ গত হইলে (ক), (খ), (গ), (ঘ), ও (ঙ) নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের মধ্যে একটীর ব্যবস্থা করা উচিত। তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে পূর্ণ-পরিমাণে (অর্থাৎ, দেশী গোরুর জন্য ১৪ আঁটি ও পশ্চিমে বড় গোরুর জন্য ২০ আঁটি) খড় খাইতে দেওয়া উচিত।

বাছুরের যত্ন।—বাছুরকে প্রসবের এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রসূতি হইতে পৃথক্ করিয়া দুগ্ধ পান করাইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বাছুর ভিন্ন গোরুর দুধ দোহা যায় না, এ নিয়ম বিলাতে আর নাই। এক সপ্তাহের মধ্যে বাছুরকে সরাইয়া ফেলা হয় বলিয়া, গোরুর বিনা বাছুরে দুগ্ধ দিবার অভ্যাস জন্মিয়া যায়। কিন্তু একবারে কাল

পর্য্যন্ত দোহিত দুগ্ধ বাছুর যত পান করিতে পারিবে ততই দেওয়া উচিত। দোহনের পরে প্রত্যহ কিছুক্ষণ বাছুরকে বাঁট্ টানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এক মাসের মধ্যেই বাছুর ঘাস খুঁটিয়া খাইতে শিখিবে। কিন্তু তখনও তক্র বা ঘোল অথবা ভাতের মাড় বা ফেন, মসিনার খোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া বাছুরকে খাইতে দেওয়া উচিত। তিনমাস গত হইলে বাছুরকে ঘাস, ভুসা, খোল, ভাতের মাড় এই সকল সামগ্রী একত্র করিয়া দুইসের ছানি সন্ধ্যায় সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। ছয়মাস কাল এইরূপে রাখিয়া পরে বাছুরদের কেবল মাঠে চরিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বকনের প্রথম বাছুর জন্মান উচিত।

মহিষ, বলদ ও বৃষের যত্ন।—মহিষ যে সে প্রকারের ঘাস পাতা খাইয়া, এমন কি অশ্ব-শালার অপরিষ্কার খড় ইত্যাদি খাইয়া, কার্য্যক্ষম থাকিয়া যায়। কিন্তু ইহাদেরও সন্ধ্যার সময় ভুসা ও খোল মিশ্রিত অর্দ্ধমণ আন্দাজ ছানি দেওয়া উচিত। বৃষদের বিশেষ যত্নের কিছুই আবশ্যক করে না। উহাদের বলদের সহিত রাখিয়া বলদকে যে খাদ্য দেওয়া যায় ঐ খাদ্যই দেওয়া উচিত। তবে নিতান্ত স্থূলকায় হইলে বৃষদেরও কিছু কায করাইয়া লওয়া উচিত। হল ও শকট বহনকারী বলদদের কষ্ট-সহিষ্ণু করা আবশ্যক বটে, কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে উহাদের প্রায় গাভীরই ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ, উহাদেরও সন্ধ্যার সময় অন্ততঃ একটা ভুসা বা খড় ও খৈল বা কার্পাস বীজ মিশ্রিত ছানি দেওয়া উচিত। যদি চরিবার মাঠ অধিক না থাকে তাহা হইলে ইহাঁদেরও দুইবার ছানি দেওয়া আবশ্যক। বলদগণ যখন কোন কায না করে তখন উহাদের কেবল মাঠে চরিতে দেওয়া উচিত, খোল, ভুসি বা ছানি দেওয়া উচিত নহে।

আহারের পরিবর্ত্তন।—সকল প্রকার জন্তুকেই যতদূর সাধ্য প্রত্যহ একই প্রকার আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আহারের পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে গোরুর বিচালি ও খৈল খাওয়া অভ্যাস উহাকে এককালীন ঘাস না দিয়া, ঘাসের সহিত খৈল ও বিচালি মিশাইয়া দিয়া ক্রমশঃ ঘাস খাওয়ান অভ্যাস করা ভাল। আহারের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হেতু কেবল দুগ্ধ কমিয়া যায় এরূপ নহে, অনেক সময় এই কারণে পেট ফুলিয়া অথবা অন্য কোন সাংঘাতিক পীড়া জন্মিয়া গো-মহিষ মারা যায়। যেমন গো-শালায় সর্ব্বদা পরিষ্কার পানীয় জল রাখা কর্ত্তব্য, সেইরূপ কয়েকটী বৃহৎ খণ্ড সৈন্ধব লবণও রাখা উচিত। এই লবণ লেহন করাতে অনেক পীড়া নিবারিত হয়।

আহারের পরিমাণ।—যে গোরুর বা মহিষের ওজন দশ-মণ, উহাকে প্রত্যহ (ওজনের দশ-ভাগের একভাগ, অর্থাৎ) একমণ আহার করিতে দেওয়া উচিত, কিন্তু এরূপ গোরুর বা মহিষের উচিত প্রত্যহ অর্দ্ধমণ (অর্থাৎ, শরীরের ওজনের বিশ ভাগের একভাগ) দুগ্ধ দান করা। সকল জন্তু সম্বন্ধেই শরীরের ওজন ও আহারের মধ্যে যে এই অনুপাতটী থাকা উচিত ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সামান্য এদিক্ ওদিক্ হইলে কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু যে গোরুর প্রত্যহ অর্দ্ধমণ আহার করা উচিত, উহাকে দশসের খাইতে দিলে উহার শরীর নিশ্চয়ই শীর্ণ হইয়া যাইবে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ গোরুরই আহারাভাবে এই অবস্থা।

গো-শালার বন্দোবস্ত।—নিতান্ত বর্ষা ও শীতের সময় বলদদেরও গো-শালার মধ্যে রাখা উচিত। এক একটী গাভী বা

বলদের জন্য ৫ ফুট প্রস্থ, ১০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট উচ্চ স্থান আবশ্যক। পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই শ্রেণী করিয়া রাখিতে পারিলে ২০ ফুট প্রস্থ ও ৫০ ফুট দীর্ঘ গো-শালায় ২০টী গাভী বা বলদ থাকিতে পারে। মধ্যবর্ত্তী নালার মধ্যে উভয় শ্রেণীরই মূত্র আসিয়া পড়িয়া, বাহিরে গিয়া একটী পাকা গর্ত্তে জমিতে পারে, এবং তথা হইতে ঐ মূত্র ক্ষেত্রে সারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী নালাটী চারি অঙ্গুলি মাত্র গভীর হওয়া আবশ্যক, অধিক গভীর হইলে জন্তুগণ উহার মধ্যে পড়িয়া গিয়া কষ্ট পাইতে পারে। প্রত্যহ মল-মূত্র স্থানান্তরিত করিয়া গো-শালা ধৌত ও পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখা নিতান্ত আবশ্যক। বৃষ ও গো-বৎস গুলির জন্য পৃথক্ দুইটী কুঠরী থাকা কর্ত্তব্য।

খোল-ভুসি।—গাভীর পক্ষে তিসি, তিল অথবা চীনাবাদামের খোল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বলদ ও বৃষের পক্ষে সর্ষপের খোল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কলাই, ছোলা, ভুষি, গম, যব, এ সকল জিনিষ যদি খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাদের কোন একটী সামগ্রীর দুই সেরের পরিবর্ত্তে এক সের খোল বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, যে গোরুকে দুই সের খোল খাইতে দেওয়া হয়, উহাকে একসের খোল ও দুইসের ছোলা অথবা একসের খোল ও দুইসের গমের ভুসি অথবা কলাই বা যব খাইতে দিলে চলে। প্রায় খোল খাওয়ানতে খরচ কম পড়ে এইরূপ দেখা যায়। তবে স্থান-বিশেষে তিসির বা তিলের খোলের দাম ৪।৫ টাকায় মন। এরূপ স্থানে একসের খোলের পরিবর্ত্তে একসের ভুসিও একসের কলাই, অথবা দুইসের যব, অথবা একসের যব ও একসের ছোলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছোলা, গম, যব, ইত্যাদি ছাতু করিয়াই খাইতে দেওয়া উচিত। কলাই সিদ্ধ করিয়াই

খাইতে দেওয়া উচিত। ভাত খাইতে দেওয়াতে গবাদি জন্তুর বিশেষ উপকার দর্শে না, এবং অধিক ভাত খাইতে দিলে অনেক সময় গোরুর ব্যারাম হয়। ভাতের মাড় ভাত অপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য। খোল জলে ভিজাইয়া খড়ের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত।

মাখন প্রস্তুত।—অনেকগুলিন গোরু পালন করিলে প্রত্যহ দুগ্ধ বিক্রয়ের সুবিধা না হইতে পারে। এ কারণ গো-পালন করিতে হইলে দধি প্রস্তুত ও মাখন উঠানর বন্দোবস্ত থাকা কর্ত্তব্য। দধি মন্থন করিয়া মাখন উঠানর বন্দোবস্ত এদেশে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। টাট্‌কা দুগ্ধ মন্থন করিয়াও স্থান বিশেষে মাখন উঠান হয়। এই মাখন খাইতে অধিক সুস্বাদ বটে, কিন্তু ইহা অধিক দিবস রাখিলে পচিয়া যায়। মোটের উপর দধি হইতে মাখন উঠানই এদেশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিয়ম। দুগ্ধ অবস্থায় যদি সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় না হইয়া যায়, তবে দধি অবস্থায় উহাকে আর দুই দিবস বিক্রয়ার্থে রাখা চলে। তাহার পরে মাখন ও ঘোল প্রস্তুত করিয়া আরও কয়েক দিবস ধরিয়া উৎপন্ন দ্রব্য রাখা চলে। তবে মাখন অথবা ঘৃতই পাকা-মাল, আর কয়েকটী কাঁচা-মাল, অর্থাৎ উৎপন্ন হইবামাত্র উহাদিগকে বিক্রয় করা আবশ্যক। এ কারণ মাখন প্রস্তুতের শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা এদেশীয় গোপদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক।

নবনীত।—দুগ্ধ, ননী, সর ও দধি এই চারি সামগ্রী হইতেই মাখন প্রস্তুত হইতে পারে। কাঁচা, টাট্‌কা, খাঁটি দুগ্ধ যদি বোতলে বা অন্য কোন আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া উহাকে ধীরে ধীরে আলোড়িত করা যায় তাহা হইলে উহা হইতে ক্রমশঃ মাখনের দানা পৃথক হইয়া থাকে। এই সকল দানা কাপড়ে করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া পরে

পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া লইলে মাখন প্রস্তুত হয়। এই মাখন পরিমাণে কম হয়, অর্থাৎ ২৫।৩০ সের দুগ্ধ হইতে একসের মাত্র মাখন হয়। এই মাখন খাইতে অতি সুন্দর কিন্তু ইহা শীঘ্র পচিয়া যায়। কেবল পরিষ্কার জলে যদি মাখনের দানা না ধুইয়া লবণ মিশ্রিত জলে ধোয়া হয়, তাহা হইলে মাখন দুই পাঁচ দিবস না পচিয়া গিয়া ভাল অবস্থায় থাকে। নবনীত বা ননী হইতে মাখন তুলিতে হইলে অধিক শীতের প্রয়োজন। শীতকালে টাট্‌কা, কাঁচা দুগ্ধের উপরে যে এক পুরু সারের মত পড়ে উহা বস্তুতঃ সর নহে, উহাই নবনীত। উহাই দুগ্ধের মাখন বা ঘৃত-ভাগ। দুগ্ধের মধ্যস্থ মাখন বা ঘৃতাংশ অল্পবিস্তর মিলিত-ভাবে থাকে; অর্থাৎ, গ্রীষ্মকালে অধিক মিলিত ভাবে এবং শীতকালে কতকটা পৃথক্ ভাবে। দুগ্ধের পাত্রের চতুর্দ্দিকে বরফ রাখিলেও ঘৃতাংশ পৃথক্ হইয়া গিয়া ক্রমশঃ উপরে ভাসিয়া আইসে। সম্পূর্ণভাবে এবং অতি সত্বর কাঁচা দুগ্ধ হইতে নবনীত পৃথক্ করিয়া লইবার জন্য এক প্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। এই কলের উপরস্থিত আধারে ছাঁকা, টাট্‌কা, কাঁচা দুধ রাখিয়া, আধারের ছিপি খুলিয়া দিয়া, কলের হাতল দ্রুত ঘুরাইলে, দুগ্ধের লঘু মাখনের অংশ বা নবনীত, আধারের নিম্নস্থ ঘুর্ণায়মান পাত্রের মধ্যস্থলে জমা হয়, এবং নবনীত বিচ্যুত দুগ্ধ পাত্রের বহির্ভাগে জমা হয়। আধার হইতে ঘুর্ণায়মান পাত্রে যেমন দুগ্ধ পড়িতে পড়িতে পাত্রটী ছাপিয়া আইসে তেমনই একটী ছিদ্র ও প্রণালী পথে মধ্যস্থলের নবনীত অস্ত বাহির হইয়া যাইতে থাকে এবং অপর একটী ছিদ্র ও প্রণালী পথে বহির্ভাগস্থ মাখন বিচ্যুত দুগ্ধ বাহির হইতে থাকে। নবনীত-বিচ্যুতি-যন্ত্র (Cream Separator) নানা প্রকারের ও নানা আকারের প্রস্তুত হইতেছে। গ্লোব্ অথবা লিলিপাট্ যন্ত্র এদেশে আনিতে ১০০
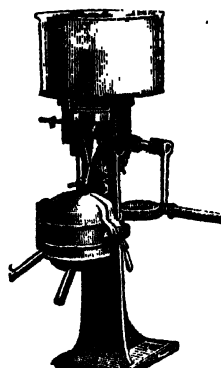
৩৩শ চিত্র। নবনীত-বিচ্যুতিষ-ন্ত্র।

১৫০৲ টাকার অধিক খরচ হয় না। ইহা অতি ক্ষুদ্র আকারের যন্ত্র। কিন্তু ইহা দ্বারাও ঘণ্টায় দুই তিন মন দুগ্ধ নবনীত বিচ্যুত করিয়া লইতে পারা যায়। নবনীত বিচ্যুত দুগ্ধ স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে পুষ্টিকারক খাদ্য। তিসি অথবা তিলের খোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে ইহা বাছুরের পক্ষে অতি উপযুক্ত খাদ্য হইয়া দাঁড়ায়। নবনীত উঠাইয়া লইয়া এবং উপরন্তু উহাতে জল ঢালিয়া কলিকাতার গোয়ালারা সর্ব্বদাই দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে। কলের দ্বারা নবনীত বিচ্যুত করিয়া লইয়া যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে উহা কলিকাতার বাজারের দুগ্ধ অপেক্ষা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। যাহা হউক, নবনীত পৃথক্ করিয়া লইয়া উহা দুই দিবস পচাইয়া অথবা সদ্যঃ সদ্যঃই উহা হইতে মাখন প্রস্তুত করা যায়। দশমন দুগ্ধ হইতে এক মন আন্দাজ নবনীত বাহির হইয়া থাকে। একটী দশ গ্যালন্ নবনীত-মন্থন-যন্ত্র দ্বারা এই এক মন নবনীত এক কালীন মন্থন
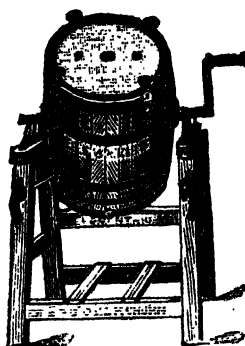
৩৪শ চিত্র। নবনীত-মন্থন-যন্ত্র।

করিয়া উহা হইতে মাখনের দানা বাহির করিয়া লইয়া, ঐ দানাগুলি ছাঁকিয়া পৃথক করিয়া লইয়া, মাখন বণ্টন যন্ত্রে ফেলিয়া দানাগুলিন

৩৫শ চিত্র। মাখন-বণ্টন-যন্ত্র।

বাটিয়া বাটিয়া, উহা হইতে জল বাহির করিয়া দিয়া, মাখনের তাল প্রস্তুত করিতে হয়। দশমন দুগ্ধ হইতে অর্দ্ধমন হইতে পঁচিশসের পর্য্যন্ত মাখন বাহির হইয়া থাকে। ভাল করিয়া পরিষ্কার জল দ্বারা

ধৌত করিয়া পরে কিছু লবণ মিশ্রিত করিয়া মাখন বাটিতে থাকিলে উহা হইতে অতিরিক্ত জল অতি সহজেই বাহির হইয়া যায়। নবনীত দুগ্ধ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া উহাকে পাথরের খোরায় অথবা কড়ির বুয়েমের মধ্যে শীতল স্থানে রাখিতে হয়। দুই দিবসের অথবা দুই বেলার নবনীত যদি এক বুয়েমে বা খোরায় রাখা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দুইবারের নবনীত একটী কাষ্ঠের হাতা দ্বারা ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়। কি নবনীত পৃথক্ করা, কি উহা মন্থন করা, কি মাখনের দানা বাটা, এ তিন কার্য্যই শীতকালে ভালরূপে চলিতে পারে, গ্রীষ্মকালে বরফের সাহায্য বিনা চলিতে পারে না। ৬০°।৭০° ফারেন্‌হিট্ অপেক্ষা অধিক উত্তাপে বিলাতী নিয়মে মাখন প্রস্তুত ভাল হয় না। নবনীত মন্থন-যন্ত্র মিনিটে ৪০ বার আন্দাজ ঘুরাইতে হয়। এই হারে তিন ঘণ্টা কাল যন্ত্রটী ঘুরাইতে পারিলে ঠিক্ হইয়া মাখনের দানা বাঁধিয়া যাইবে। দানা বাঁধিয়া গেলে কলের মুখ খুলিয়া দিয়া ছাঁকনীর সাহায্যে ঘোলটী বাহির করিয়া দিয়া, ছাঁকনীর মধ্যে যে দানাগুলি আসিয়া পড়ে ঐ গুলিন যন্ত্রের মধ্যে পুনরায় নিক্ষেপ করিয়া, যন্ত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া দিয়া, উহার মধ্যে পরিষ্কার জল অর্দ্ধা-অর্দ্ধী রকম ভরিয়া দিয়া, পুনরায় যন্ত্রটী কয়েকবার ঘুরাইতে হয়। পরে যন্ত্রের মুখ খুলিয়া ছাঁকনীর সাহায্যে জল বাহির করিয়া দিয়া, পুনরায় দুই একবার জল দ্বারা উপরি উক্ত নিয়মে দানাগুলি ধৌত করিয়া লইয়া যখন দেখা যাইবে পরিষ্কার জল যন্ত্রের মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, তখন দুইখানি কাষ্ঠের হাতার সাহায্যে মাখনের দানা সমস্ত বাহির করিয়া লইয়া মাখন-বণ্টন-যন্ত্রে ফেলিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া মাখনের তাল বাঁধিতে হয়। মাখন-বণ্টন-যন্ত্রে প্রত্যেক চারিদের

আন্দাজ মাখমের জন্য তিন ছটাক লবণ ব্যবহার করিলে জল সম্পূর্ণ বাহির হইয়া যায় এবং মাখনও অনেক দিবস ধরিয়া অবিকৃত অবস্থায় থাকে। নবনীত দুই এক দিবস না জমাইয়া যদি সদ্যঃসদ্যঃ মন্থন করা যায় তাহা হইলেও মাখনের দানা বাঁধে বটে, কিন্তু এ মাখন শীঘ্রই পচিয়া যায়। মাখন-বণ্টন-যন্ত্রের পরিবর্ত্তে একটী বড় পাথরের খোরা হইলেও কায চলে, ভাল করিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া পরে লবণের জলে হাত ডুবাইয়া খোরার মধ্যস্থিত মাখনের দানা হাত দিয়া উত্তম করিয়া ঘসিতে থাকিলে উহা হইতে জল কাটিয়া যায় এবং হাত দিয়াও মাখনের তাল বাঁধা চলে। নবনীত-মন্থন যন্ত্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত। নমুনা দেখিয়া এ যন্ত্র অনায়াসে এদেশে প্রস্তুত করিয়া লওয়া চলে। কেবল নবনীত-বিচ্যুতি-যন্ত্র বিলাত হইতে আম্‌দানি করা আবশ্যক। টি. ই. টম্‌সান্ কোম্পানী প্রভৃতি কয়েকটী কলিকাতাস্থ সাহেবদিগের কুঠিতে এই যন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

সর।—সর হইতে মাখন প্রস্তুতের নিয়ম এদেশেও প্রচলিত আছে। সরের মাখন ও ঘৃত অতি উপাদেয় সামগ্রী। অধিক পরিমাণ সর পাইতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে কার্য্য করা উচিত :—

খোন্দল অর্থাৎ গভীর কড়ার মধ্যে টাট্‌কা দুগ্ধ রাখিয়া উহা ৯।১০ ঘণ্টা কাল শীতল চুলার উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। পরে কড়া না স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে চুলা জ্বালাইয়া দিতে হয়। দুগ্ধ উত্তপ্ত হইয়া যখন ফুট ধরিতে আরম্ভ করে তখনই ধীরে ধীরে চুলা নিবাইয়া দিয়া, যতক্ষণ না দুগ্ধ এককালীন শীতল হইয়া যায় ততক্ষণ কড়া স্পর্শ না করিয়া চুলার উপরেই বসাইয়া রাখিতে হয়। পরে চুলার উপর হইতে নামাইয়া আরও ৯।১০ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া

সরটী উঠাইয়া লইয়া উহা দুই এক দিবস পচাইয়া যেমন পচান নবনীত মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত করার নিয়ম আছে ঠিক্ সেই নিয়মে এই পচান সর হইতেও মাখন প্রস্তুত করা যায়।

দধি।—কোন স্থানের দধি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত; কোন কোন লোক উত্তম দধি বসাইতে পারে বলিয়া জানিত; কিন্তু কিরূপে দধি পাতিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দধি হয় ইহা যদি সকলের জানা থাকে তাহা হইলে যে সে স্থানে যে সে লোকে উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিতে পারে। দধি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে স্বতন্ত্র সাঁজো প্রস্তুত করিতে হয়। সাঁজো মাখন তোলা দুধ হইতে প্রস্তুত করা উচিত,—খাঁটি দুধ হইতে নহে। দুগ্ধের মধ্যে নানা জাতীয় আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্ জন্মিয়া দুগ্ধের বিকৃতি ঘটায়। দুগ্ধের মাখনের ভাগে, অর্থাৎ নবনীতে, এক জাতীয় উদ্ভিদণু সহজে জন্মে। অবশিষ্ট দুগ্ধে যে অন্য একপ্রকার উদ্ভিদণু জন্মে উহাই দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া দধি করিয়া দেয়। যদি দুগ্ধে দধি মিশাইয়া নানাপ্রকার উদ্ভিদণু উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুগ্ধ হইতে দধির পরিণতি কার্য্যও চলিবে, আরও অন্যান্য প্রকার বিকৃতির কার্য্যও চলিবে। সাঁজো প্রস্তুতের উদ্দেশ্য কেবল দধি-প্রস্তুতকারী উদ্ভিদণুর উৎপাদন। এজন্য এই কার্যে নবনীত বিচ্যুত দুগ্ধের ব্যবহার বিশেষ আবশ্যক। নবনীত বিচ্যুত দুগ্ধেও কিন্তু নানাপ্রকার উদ্ভিদণু থাকা সম্ভব। এ কারণ, এই দুগ্ধ লইয়া ১৬৫° বা ১৭০° ফারেন্ হিট্ উত্তাপ অবধি গরম করিয়া অণু সকল একপ্রকার মারিয়া ফেলিয়া, পরে ইহার মধ্যে যে সে দধির একটু জল-ভাগ মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। পরে উহা নিতান্ত শীতল স্থানে (অর্থাৎ ৬০°।৬৫° ফারেন্ হিট্ উত্তাপে) রাখিয়া দিয়া ৫।৭ ঘণ্টা কাল পরে,

তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত সাঁজো বা বীজরূপে ব্যবহার করা চলিতে পারে। এই সাঁজো খাঁটি দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া দিয়া দধি পাতিতে হয়। দধি পাতিবার সময় দুগ্ধ গরম করিয়া বা ফুটাইয়া লইয়া পরে যতদূর সম্ভব ৯৫° ফারেন্ হিট্ উত্তাপে আনিয়া সাঁজো মিশাইতে হয়। যদি ৫।৬ ঘণ্টা কাল এই ৯৫ ডিগ্রি উত্তাপে সাঁজো মিশ্রিত দুগ্ধ রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে দধি অতি চমৎকার শক্ত হইয়া বসিয়া যায়। সাঁজো শীতল স্থলে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক বলিয়া শীতকালে অনেক স্থানে ভাল দধি পাওয়া যায়। তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা উত্তাপের পরিমাণ সমস্ত ঠিক্ করিয়া লইয়া উপরিউক্ত উপায়ে কার্য্য করিতে পারিলে সকলেই উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিতে পারে। দধি মন্থন করিয়া মাখন উঠাইবার সময়ে শীতকালে গরম জল ও গ্রীষ্মকালে শীতল জল ছিটান আবশ্যক, নতুবা দানা ভাল হইয়া উঠে না। দধি হইতে মাখনের পরিমাণ কিছু অধিক হয়, এবং মোটের উপর দধি হইতে মাখন করাই এদেশের পক্ষে ভাল নিয়ম।

ষোড়শ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। কি কি উদ্দেশে গবাদি জন্তু পালিত হইয়া থাকে ?

২। হল-চালন ও শকট-বাহন কার্য্যের জন্য কিরূপ গো-মহিষ আবশ্যক ?

৩। দুগ্ধ দিবার জন্য কিরূপ লক্ষণের গোরু পালন আবশ্যক ?

৪। উভয় উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে এরূপে গো-পালন সম্ভব কি না ?

৫। বিদেশীয় গোরু পালন সম্বন্ধে তোমার মত কি?

৬। দেশী গোরুর জন্য কিরূপ বৃষ আবশ্যক?

৭। দুগ্ধ দিবার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কি কি নিয়মে গো-পালন আবশ্যক?

৮। লাঙ্গল-গাড়ি ভাল টানিতে পারিবে এ উদ্দেশে গো-পালন করিতে হইলে কি নিয়মে পালন আবশ্যক?

৯। বিভিন্ন বয়সের গোরু বাছুরকে কোন্ অবস্থায় কত খোল খাওয়ান যাইতে পারে তাহার একটী তালিকা দাও।

১০। বঙ্গদেশের গোরুকে সাধারণতঃ কি পরিমাণ খড়, ঘাস, জল, ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত?

১১। গাভীর ওজন, উহার আহারের ওজন, ও উহার দুগ্ধের ওজন, ইহাদের মধ্যে কোন একটা অনুপাত থাকা উচিত কি না? কি অনুপাত ভাল মনে কর?

১২। প্রসবের পূর্ব্বে একমাস ও প্রসবের পরে একমাস গাভীকে কিরূপ খাইতে দেওয়া উচিত বর্ণনা করিয়া যাও।

১৩। দুগ্ধ দোহন সম্বন্ধে প্রসব কাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত কি নিয়ম পালন করা উচিত বর্ণনা কর।

১৪। প্রসবকাল হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত বাছুরকে কি নিয়মে পালন করিতে হয় বর্ণনা কর।

১৫। মহিষ পুষিয়া লাভ কি?

১৬। বৃষকে কিরূপে যত্ন করা আবশ্যক?

১৭। আহারের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কি নিয়ম পালন করা উচিত?

১৮। গো-শালার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

১৯। নবনীত, সর ও দধি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় বর্ণনা কর।

২০। মাখন কোন্ কোন্ সামগ্রী হইতে কিরূপে প্রস্তুত করা যাইতে পারে ?

২১। বিলাতী নিয়মে মাখন প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর।

২২। মাখন, সর ও দধি প্রস্তুত করিতে হইলে তাপমান যন্ত্রের ব্যবহারের উপযোগিতা বুঝাইয়া দাও।

২৩। সাঁজো প্রস্তুতের সুনিয়ম ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

২৪। কত দুগ্ধ হইতে একসের নবনীত ও একসের মাখন প্রস্তুত করা যাইতে পারে ?

২৫। কোন মাখন অনেক দিবস অবিকৃত অবস্থায় থাকে, কোন মাখন শীঘ্র পচিয়া যায়, ইহার হেতু কি ?

সপ্তদশ অধ্যায়।

ক্ষুরা-রোগ।

রোগের স্বভাব।—গবাদি জন্তুর যত প্রকার রোগ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ক্ষুরা-রোগ সর্ব্বাপেক্ষা সহজে আরোগ্য করিতে পারা যায়, অথচ এই রোগের ন্যায় অন্য কোন রোগ এত সাধারণতঃ ঘটিতে দেখা যায় না। বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে অথবা মলমূত্র ও কর্দ্দম পূর্ণ গোষ্ঠে একত্রে অনেক গোরু-বাছুর থাকিলে উহাদের

পায়ে ঘা হইয়া থাকে, এবং এই ঘা চাটিয়া উহাদের মুখেও ঘা হয়। এই রোগ একটী আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্ হইতে জন্মিয়া থাকে। এই উদ্ভিদ্ ক্ষত স্থানে জন্মিয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত দূষিত এবং শরীর শীর্ণ করিয়া দেয়। ক্ষুরা রোগে অনেক গো-বৎস মারা যায়, কিন্তু বয়স্ক জন্তু কয়েক মাস রোগ ভোগ করিয়া প্রায় আরোগ্য লাভ করে। দুগ্ধবতী গাভীর এই রোগ হইলে দুগ্ধ এক কালীন কমিয়া যায়।

প্রথম কর্ত্তব্য।—রোগটী নিতান্ত সংক্রামক বলিয়া, যে স্থানে থাকিয়া যেমনই একটী জন্তুর পায়ে বা মুখে এই রোগ লক্ষিত হইবে, সেই মাত্র অন্য জন্তু গুলিকে ঐ স্থান হইতে অন্তরিত করিয়া উচ্চতর কোন স্থানে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। যে জন্তুটীর পায়ে বা মুখে ঘা দেখা দিয়াছে ঐ জন্তুকে পূর্ব্ব স্থানেই রাখিয়া দিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

চিকিৎসা।—ক্ষুরা রোগের চিকিৎসা অতি সহজ। ক্ষত-স্থান গুলি ধৌত করিয়া কোন অণুনাশক পদার্থ লেপন করিয়া দেওয়াই চিকিৎসার মূল-প্রণালী। ক্ষত স্থান ধৌত করিবার জন্য গরম কার্বলিক সাবানের জল ব্যবহার করিলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। পায়ের ঘা ধৌত করিয়া উহার উপর কার্বলিক এসিড্ মিশ্রিত নারিকেল তৈল লেপন করিয়া দেওয়া উচিত। ৪০ ভাগ নারিকেল তৈলের সহিত এক ভাগ খাঁটি কার্বলিক এসিড্ মিশ্রিত করিয়া দিয়া উহা গরম করিয়া লইয়া ঔষধটী গরম অবস্থাতেই লেপন করিতে হয়। যদি কার্বলিক এসিড্ সংগ্রহ করা দুরূহ হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধসের নারিকেল তৈলের সহিত অর্দ্ধ ছটাক কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লইয়া গরম অবস্থাতে উহা পায়ের ধৌত ঘায়ের উপর লেপন করিয়া দিলে উপকার পাওয়া যাইবে। মুখ ধৌত করিয়া দিবার

জন্য প্রত্যহ ফিট্‌কারির জল ব্যবহার করা উচিত। এক ছটাক জলে ২০ গ্রেণ চূর্ণ ফিট্‌কারি মিশ্রিত করিয়া দিয়া উহা মুখের ঘায়ের উপর কেবল মাত্র লেপন করিয়া দিলেও উপকার দর্শে। এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া প্রত্যহ এক বার করিয়া ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া দিয়া উহার উপর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অণুনাশক পদার্থ লেপন করিয়া দিলেই ক্ষুরা রোগ সারিয়া যাইবে।

পথ্য।—ক্ষুরা রোগ হইলে জন্তু দিগের অন্ত্র মধ্যে যাহাতে মল আবদ্ধ না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। গমের ভূসি অত্যুষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মণ্ডের ন্যায় করিয়া লইয়া ক্ষুরা রোগ-গ্রস্ত জন্তুদিগকে খাইতে দেওয়া উচিত। লবণ মিশ্রিত ভাতের মাড় (ফেন) খাইতে দেওয়াতেও বিশেষ উপকার দর্শে।

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। ক্ষুরা-রোগের হেতু ও স্বভাব নির্দ্দেশ কর।

২। গোষ্ঠে ক্ষুরা-রোগ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ কি করা কর্ত্তব্য?

৩। ক্ষুরা-রোগের চিকিৎসা প্রণালী বর্ণনা কর।

৪। ক্ষুরা-রোগ হইলে গবাদি জন্তুকে কি খাইতে দেওয়া উচিত?

অষ্টাদশ অধ্যায়

গো-মড়কের সময় ব্যবস্থা।

দুইটী প্রধান গো-মড়ক।—যে সংক্রামক রোগটীর কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে উহা বড় মারাত্মক নহে। সহস্র সহস্র গবাদি জন্তু প্রতি বৎসর যে সকল সংক্রামক রোগ দ্বারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, উহাদের মধ্যে প্রধান দুইটী। একটীর নাম গো-বসন্ত অন্যটীর নাম গলা-ফুলা রোগ। এই দুই রোগের প্রতিকারের জন্য ইউরোপে টিকা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এবং এদেশেও টিকা দিবার ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। গলা-ফুলা রোগ হইলে ঘোড়া ও গোরু প্রায়ই মরিয়া যায়। গো-বসন্তে প্রতি বৎসর অনেক গোরু-বাছুর ও আর আর জন্তু আক্রান্ত হয়, এবং এই রোগের দ্বারাই প্রতি বৎসর অধিকাংশ গোরু-বাছুর মারা পড়ে। এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে অনেক জন্তু আরোগ্য লাভও করিয়া থাকে। গো-বসন্ত বা গলা-ফুলা রোগে আক্রান্ত হইয়া যে জন্তুটী আরোগ্য লাভ করে, উহার আর কখন ঐ রোগ হয় না, ইহা একটী সাধারণ নিয়ম। এ কারণ কোন কোন দেশে এরূপ জন্তুর মূল্য অধিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এদেশেও বলদ বা গাভী কিনিবার সময় ঐ বলদ বা গাভীর গো-বসন্ত ও গলা-ফুলা রোগ হইয়া গিয়াছে কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত।

নিবারণোপায়।—জন্তুদিগের টিকা দিবার ব্যবস্থা এদেশের

কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। গো-মড়ক উপস্থিত হইলে নীরোগ জন্তুদিগের স্থানান্তরিত করা এবং উহাদের টিকা দেওয়া গো-মড়ক নিবারণের প্রধান উপায়।

হেতু।—প্রায় দেখা যায় জলে নিমজ্জিত ঘাস-পাতা খাইয়াই গো-মড়ক উপস্থিত হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমির জল নামিয়া গেলে জন্তুগণ ঐ ডোবা জমির ঘাস খাইয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এরূপ জমিতে গো-মহিষ চরান কখনই উচিত নহে। পাট-পচান জল অথবা অন্য কোন প্রকার কদর্য্য জল পান করিয়াও এই সকল সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এ কারণ, জন্তুদিগের পানীয় জলের দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রোগ দেখা দিলেই নীরোগ জন্তুদের স্থানান্তরিত করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত।

স্থানান্তরিত করিবার নিয়ম।—অনিয়মে জন্তুদিগের স্থানান্তরিত করিবার কারণ অনেক সময়ে গো-মড়ক প্রশমিত না হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়িয়া পড়ে। স্থানান্তরিত করিবার প্রকৃত নিয়ম প্রত্যেক কৃষকের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগাক্রান্ত জন্তুকে স্থানান্তরিত করা কখনই উচিত নহে। ঐ গুলিকে স্থানান্তরিত করিলে মলমূত্র দ্বারা গো-মড়কের বীজ নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এ কারণ রোগাক্রান্ত জন্তুটীকে বা জন্তুগুলিকে কখনই স্থানান্তরিত করা উচিত নহে, একই স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া উহাদের শুশ্রূষা করা উচিত, এবং উহাদের মলমূত্র ও ভুক্তাবশিষ্ট তৃণ-পত্রাদি প্রত্যহ প্রোথিত করিয়া ফেলা অথবা জ্বালাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। **যে জন্তুগুলির রোগ হয় নাই** ঐ গুলির গাত্র তুঁতিয়ার জল দ্বারা ধৌত বা লেপিত করিয়া দিয়া, উহাদের অর্দ্ধ ছটাক হিরা-কষ

ও ৫০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া তবে স্থানান্তরিত করিতে হয়। অর্থাৎ, উহাদের ভিতর ও বাহির অম্ল-নাশক পদার্থ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া অন্যত্রে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। স্থানান্তরিত করিবার সময় যেন নীরোগ জন্তুদের নিম্ন ভূমি হইতে উচ্চ ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়, এবং পরেও আহার ও পানীয় জল উহারা যাহাতে পরিষ্কার অবস্থায় প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে যেন লক্ষ্য রাখা হয়। আহারের সহিত বলকারক পদার্থ, অর্থাৎ, খোল ও ভুসি, প্রত্যহ দেওয়া কর্ত্তব্য। লবণ ও গুড় ব্যবহারেও বিশেষ উপকার দর্শে।

যদি কোন জন্তুর **রোগ হইয়াছে কি না এরূপ ঠিক বুঝা না যায়;** অর্থাৎ, যদি কোন জন্তু ভাল করিয়া খাইতেছে না মনে হয়, এবং উহার মল নিতান্ত কঠিন অথবা এককালীন আবদ্ধ দেখা যায়, অথবা উহার রোমন্থনে আশক্তি নাই এরূপ যদি মনে হয়, তাহা হইলে উহাকে রোগাক্রান্ত জন্তু হইতে কিছু অন্তরে রাখিয়া উহার শুশ্রূষা করা আবশ্যক। গুড়, লবণ, খোল ও ভুসির সহিত হিরাকষ ও কুইনাইন মিশাইয়া গোলা প্রস্তুত করিয়া উহাকে খাওয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উহার যাহাতে শীত না লাগে অথবা উহার গাত্রের উপর দিয়া যাহাতে টানা-বাতাস না চলিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। জলে ডোবা জমির ঘাস ও অপরিষ্কার জল যেন ইহাকে খাইতে দেওয়া না হয়। মল আবদ্ধ থাকিলে মসিনার তৈল অর্দ্ধসের খাওয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে জন্তুগুলিকে এইরূপে সন্দেহের উপর রাখিয়া সুশ্রূষা করা হইবে, উহার মধ্যে যেটী নীরোগ সাব্যস্ত হইবে সেইটীকে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব কথিত নিয়মে তুঁতিয়ার জল দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে স্থানান্তরিত করা উচিত। একভাগ তুঁতিয়া চূর্ণ ২০০ ভাগ গরম

জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন বা ধাবণ কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত। তুঁতিয়া, হিরাকষ, কুইনাইন, লবণ ও গুড় অম্ল-নাশক পদার্থ। গুড়, ভুসি ও খোল বলকারক পদার্থ। বলকারক ও অম্লনাশক পদার্থ ব্যবহার দ্বারা সকল সংক্রামক রোগেরই প্রশমন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশমণের প্রধান উপায়, নীরোগ জন্তুদিগকে উচ্চস্থানে স্থানান্তরিত করিয়া উহাদিগকে উচ্চস্থানের ঘাস খাইতে ও পরিষ্কার জল পান করিতে দেওয়া।

যে গুলি রোগে পড়িয়াছে উহাদের প্রত্যেককে একসের করিয়া মসিনার তৈল খাওয়াইয়া দিয়া, পরে কাঁচা দুর্ব্বা-ঘাস এবং অত্যুষ্ণ জলে গমের ভুসি ফেলিয়া উহার সহিত লবণ মিশাইয়া দিয়া, জাবটী ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, খাইতে দেওয়া উচিত। পীড়িত গোরুকে টানা-বাতাসে বা নিতান্ত শীতল স্থানে রাখা উচিত নহে; আবৃত স্থানে, আবশ্যক হইলে আগুন জ্বালাইয়া, রাখিতে হয়। গো-বসন্তে ঔষধ বড় খাটে না। তবে নিম্নলিখিত ঔষধটী উপকারক বলিয়া খ্যাত আছে।

ধুতুরার বীজ—৫টা
কর্পূর—একতোলা
সোরা—একতোলা
গুড়—একপোয়া
তিসির খোল—একপোয়া

এই কয়েকটী সামগ্রী একত্র করিয়া গোলা প্রস্তুত করিয়া, দুই-বারে খাওয়াইয়া দিতে হয়।

গলা-ফুলা রোগ হইবামাত্র, অর্থাৎ গলা ফুলিবার পূর্ব্বেই যখন জন্তুগুলির মুখ হইতে কেবল লালা নির্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে,

এমন সময়ে, গোরুর জিহ্বার নিম্নে যে শিরাটী কাল হইয়া ফুলিয়া রহিয়াছে মনে হইবে সেইটীর মধ্যে একটী ধারাল গুণ-ছুঁচ প্রবেশ করাইয়া দিয়া দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রক্ত বাহির করিয়া দিয়াই ক্ষত স্থানে লবণ ঘসিয়া দেওয়া উচিত।

গো-বসন্তের ও গলা-ফুলা রোগের চিকিৎসা দ্বারা বড় ফল হয় না। যে জন্তুটা বাঁচিবার প্রায় সেইটাই বাঁচিয়া যায়; তবে যে চিকিৎসা দুইটার ব্যবস্থা দেওয়া গেল প্রথম হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে উপকার দর্শে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। প্রধান দুইটী গো-মড়কের নাম কি? ইহাদের প্রধান হেতু কি?

২। গো-মড়ক উপস্থিত হইলে কি কি উপায় অবলম্বন দ্বারা নীরোগ গোরুর মড়ক হইতে পারে না?

৩। গো-মড়কের সময় কি নিয়মে জন্তুদিগের স্থানান্তরিত করা উচিত?

৪। গো-বসন্তের ও গলা-ফুলা-রোগের চিকিৎসা কিছু আছে কি না?

সরল কৃষি-বিজ্ঞান।

চতুর্থ ভাগ।

[নর্ম্যাল-বিদ্যালয় ও কৃষি-বিদ্যালয়ের উপযোগী।]

ঊনবিংশ অধ্যায়।

কৃষি-কার্য্য।

আবাদ।—কৃষিকার্য্য নানাবিধ নিয়মে পরিচালিত হইতে পারে। অনেকে একটী মাত্র মূল্যবান ফসল জন্মাইয়া লাভবান হইবার আশায় উহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। সাহেবেরা এদেশে যে নীল, চা, কফি, ইত্যাদির চাষ করিয়া থাকেন, এসকল আবাদের, অর্থাৎ এক ফসলী চাষের, উদাহরণ। অহিফেন, ইক্ষু, কদলী, মরিচ, তামাক, তুঁত ইত্যাদি ফসলও এই নিয়মে জন্মান হইয়া থাকে। এই নিয়মে চাষ করাতে প্রথমতঃ কয়েক বৎসর লাভ হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু শেষে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। এই সকল ফসল বারম্বার একই জমিতে জন্মাইলে ক্রমশঃ এই জমি এই ফসলটীর জন্য অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে; অর্থাৎ, ফসলগুলির উপযোগী কয়েকটী বিশেষ উপাদান মৃত্তিকা হইতে বাহির হইয়া গিয়া মৃত্তিকা ক্রমশঃ এই সকল ফসলের জন্য অনুপযুক্ত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ফসলগুলির বিশেষ বিশেষ শত্রু, কীট, উদ্ভিজ্জরোগ, ইত্যাদি, ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়া ইহাদের জন্মান দুষ্কর হইয়া উঠে।

সব্‌জী-বাগান।—অনেকে বিলাতী সবজীয় চাষ করিয়া লাভবান হইবার আশায় কেবল এই সকল ফসলের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। অধিক যত্ন, অধিক সার-প্রয়োগ, অধিক ব্যয় করিয়া বড় বড় নগরের অনতিদূরে কার্য্য করিতে পারিলে সব্‌জী-বাগ দ্বারা বিশেষ লাভ হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু ইহা ঠিক্ কৃষি-কার্য্য নহে। বাগানের কার্য্যে যত যত্ন ও ব্যয় আবশ্যক তাদৃশ কৃষিকার্য্যে আবশ্যক হয় না, একারণ কৃষিকার্য্য সাধারণ কৃষকের উপযোগী, কিন্তু সব্‌জী-বাগের কার্য্য উহাদের উপযোগী নহে। কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্য পাকা মাল উৎপন্ন করা। এরূপ মাল কয়েকমাস বা বৎসরাবধি রাখিয়া বিক্রয় করা চলে। বেগুন, পটল, কপি, গাজর, বিট্, সেলেরি, সালাদ্, ইত্যাদি ফসল যত দিন রাখা যায় ততই বিকৃত হইয়া ক্রমশঃ পচিয়া যায়। বড় বড় নগরের নিকট চাষের কার্য্য করিতে হইলে সব্‌জী-বাগ করাই বিহিত। তবে বৃহদাকারের সবজী-বাগের সহিত গোরু, ছাগল বা মেষ পুষিতে পারিলে লাভ আরও অধিক হয়। যে সকল শাক-পাতা বিক্রয় হইতেছে না, ঐ সকল জন্তুদিগকে খাইতে দেওয়া চলে। জন্তুদিগের পালন করিবার জন্য ভুট্টা, মিষ্ট-জুয়ার, রিয়ানা ঘাস, ম্যানুগোল্ড, অড়হরিয়া-সীম, লুসার্ণ, ইত্যাদি ফসল পৃথক করিয়া জন্মানও আবশ্যক। রেল্‌পথে সহর হইতে ৩।৪ ঘণ্টার রাস্তা হইলেও, সবজী-বাগ ও জন্তু পালনের কার্য্য চলিতে পারে। এ কার্য্য করিতে হইলে সহরে দোকান থাকা আবশ্যক। যাহারা সহরে সবজীর বড় বড় দোকান করিয়া থাকে, তাহাদেরই আত্মীয়-স্বজন সহরের নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামে সবজীর বাগান করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে নিজেরাই বাগানের সামগ্রী মাথায় করিয়া বা গোরুর গাড়ি করিয়া সহরের

কোন নির্দ্দিষ্ট বাজারে লইয়া আসিয়া নিজেদেরই ছোট ছোট দোকানে বিক্রয় করিয়া থাকে। এ সকল ব্যক্তি সুলভ মূল্যেও যদি অপরের বাগানের শাক, সবজী, ফল, প্রভৃতি কিনিতে পায় তথাপি উহা না কিনিয়া নিজেদের বা আত্মীয়-স্বজনদের বাগানের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। সবজী-বাগান চালাইতে হইলেই নিজেদের দোকান থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ফলের বাগান প্রস্তুত করা অনেক সহিষ্ণুতার কর্ম্ম। অন্ততঃ পাঁচ বৎসর ধরিয়া গাছ রক্ষা করিয়া পরে ক্রমশঃ ফলভোগ হইতে পারে। তবে সকল ফলের জন্য এত দিবস অপেক্ষা করিতে হয় না। কলা, টেঁপারি, আনারস, পেঁপিয়া, ষ্ট্রবেরি, ও জাভা-প্লাম্, এই কয়েকটী ফলের চাষ রীতিমত করিতে পারিলে, দুই একবৎসরের মধ্যেই ফল বিক্রয় আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু সবজীর ন্যায় এ সকলও নিতান্ত কাঁচা মাল। সহরে দোকান না থাকিলে বড় রকমের ফলের বাগান চালানতে লোকসান হইবার সম্ভাবনা। ফলের বাগান রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলে সহর হইতে ৫০ বা ১০০ ক্রোশ অন্তরে হইলেও চলিতে পারে। যে সকল ফল দুই এক বৎসরের মধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করে ঐ সকলের গাছ জমি বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া লাগান উচিত। যে জমিতে দুই বৎসর উত্তম কলা ফলিল সে জমিতে সার দিয়াও তৃতীয় বৎসরে তেমন কলা ফলে না। অন্যান্য ফলের বিষয়েও এই কথা বলা যাইতে পারে। ফলের বাগান করিতে হইলে অবিক্রীত ফল জ্যাম, জেলি অথবা আরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বোতল, টিন বা বুয়েমের মধ্যে পাকা মাল রূপে ধীরে-সুস্থে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক। লেবু, জাম, আনারস, প্রভৃতি যে সকল ফলের রস নিতান্ত পাতলা,

উহাদের আরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বোতলে ভরিয়া রাখিবার উপায় অতি সহজ। বোতলের মধ্যে একমুঠা গুঁড়া কাঠের কয়লা ফেলিয়া দিয়া, পরে ছাঁকা রস প্রায় ভরিয়া দিয়া, বোতলের উপরে যে টুকু স্থান অবশিষ্ট থাকিবে উহা আর কিছু গুঁড়া কয়লার দ্বারা সম্পূর্ণ ভরিয়া দিয়া, যখন বোতলের মধ্যস্থিত রসের মধ্যে বিম্ব আর দেখা যাইবে না তখন ছিপি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। শীতল অন্ধকার-ময় স্থানে বোতল গুলি ছয়মাস কাল রাখিয়া, পরে আরক ব্লটিং কাগজ বা ডবল ফ্ল্যানেল দ্বারা ছাঁকিয়া অন্য বোতলে রাখিলে উহা অবিকৃতভাবে থাকিয়া যাইবে। বোতলগুলি ধৌত করিয়া, কিছু সিক্ত থাকিতে থাকিতে উহাদের মধ্যে গন্ধকের ধুম প্রবেশ করাইয়া দিয়া পরে রস বা আরক ভরা আবশ্যক। গন্ধকের ধূমের সহিত সিক্ত বোতলের সংস্পর্শ হইলে, বোতলের গাত্রে এক প্রকার অণু-নাশক পদার্থ জন্মিয়া যায়। এই সামান্য পরিমাণ অণু-নাশক পদার্থ দ্বারা আরকের বিকৃতি রুদ্ধ হয়। সিক্ত বা তরল সামগ্রী সমুদায় যে বিকৃত হইয়া ক্রমশঃ পচিয়া যায় ইহার কারণ উহাদের মধ্যে জীবিত অণু সকলের অবস্থান ও বৃদ্ধি। এ সকল সামগ্রী অণু-বিযুক্ত ভাবে রাখিতে পারিলে ইহারা বিকৃত হইতে পারে না। ফলের আরক সকলের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সুরা-সার জন্মিয়া থাকে। এই সুরা-সারও অণু-নাশক পদার্থ। লবণ, কাঠের কয়লা, শর্করা, তৈল, সোহাগা, এ সমস্তও অণু-নাশক বা অণু-রোধক পদার্থ। এ গুলি রস ও অন্যান্য সামগ্রী রক্ষার জন্য ব্যবহার করা চলিতে পারে। ১৭০।১৭৫ ডিগ্রি ফারেনহিট্ উত্তাপে উপর্য্যুপরি তিন দিবস অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল মাত্র বোতল গুলির ছিপি খুলিয়া রাখিয়া পরে বন্ধ করিয়া দিলে, আরক আরও নিঃসন্দেহে অবিকৃত ভাবে থাকিয়া যাইবে।

অধিক উত্তাপ দ্বারা অণু সকল আরও নিঃসন্দেহ ভাবে মরিয়া যায় বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আরকেরও বিকৃতি ঘটিয়া উহা বিস্বাদ হইয়া যায়। ফল হইতে জ্যাম্ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় খোসা-শুদ্ধ ফলই ফুটন্ত চিনির রসে ফেলিয়া প্রস্তুত করা নিয়ম আছে। টেঁপারি, মেস্তা, ষ্ট্রবেরি ও জাভা-প্লাম্ হইতে উত্তম জ্যাম্ প্রস্তুত হয়। জেলি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে জল দ্বারা ফল সিদ্ধ করিয়া উহাকে ছাঁকিয়া লইয়া, ইহাতে কিছু সাইট্রিক এসিড্ (জলে গুলিয়া) অথবা লেবুর রস মিশাইয়া দিয়া, পরে ছাঁকা রস চিনির সহিত মিশাইয়া জ্বাল দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ফলের মিষ্টতা ও অম্লতা বুঝিয়া চিনি ও এসিডের পরিমাণ স্থির করিতে হয়। এ জন্য জ্যাম্ ও জেলি প্রস্তুত করিবার জন্য কিছু অভিজ্ঞতা আবশ্যক। মর্ত্তমান কলা হইতে অতি সুন্দর জেলি প্রস্তুত হয়। পাকা কলা ছাড়াইয়া, চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া, ওজন করিয়া যত হইবে, ঠিক তত ওজনের জল দিয়া উহা এক ঘণ্টা ধরিয়া আগুনের উপর বসাইয়া সিদ্ধ করিতে হয়। পরে পাত্রটী আগুনের উপর হইতে নামাইয়া যখন কিছু শীতল হইয়া যাইবে, তখন উহার মধ্যস্থ কলা-সিদ্ধ শক্ত কাপড়ে ফেলিয়া ছাঁকিতে হয়। বেলের পানা প্রস্তুত করিতে হইলে যে ভাবে ছাঁকা আবশ্যক ঐ ভাবে কলা-সিদ্ধ ছাঁকিতে হয়। ছাঁকিবার পরে যে সিটেটা কাপড়ের মধ্যে থাকিয়া যায় উহা পাত্লা করিয়া রৌদ্রে বিছাইয়া শুকাইয়া রাখিয়া পরে অনেক শুষ্ক সিটে জমা হইলে উহা যাঁতায় পিষিয়া ও চালুনীদ্বারা ছাঁকিয়া বানানা-মীল বা কলার ছাতু প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ছাঁকা কলার রসে যত ওজনের কলা ব্যবহার হইয়াছে তত ওজনের চিনি মিশাইয়া, অভি-রুচি অনুসারে লেবুর রস অথবা সাইট্রিক্ এসিড্ জলে গুলিয়া

মিশাইয়া, উহাকে পুনরায় একঘণ্টা জ্বাল দিতে হইবে। পরে জেলি গরম থাকিতে থাকিতে অম্ল-বিযুক্ত বোতল বা টিনের মধ্যে ভরিয়া দিয়া, উপরিভাগ পার্চমেণ্ট কাগজের টুক্‌রা দ্বারা আবৃত করিয়া দিয়া, টিন বা বোতল বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এদেশে আমের ও কাঁঠালের রস যেরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া রক্ষিত করিবার উপায় প্রচলিত আছে উহা উত্তম।

জুম্‌-চাষ।—গারো, খাসিয়া ও রাজমহল পাহাড়ের অরণ্যবাসী পাহাড়িয়ারা পাহাড়ের যেখানে সেখানে কিছু পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি গর্ত্ত খুঁড়িয়া এই সকল গর্ত্তের মধ্যে এককালীন নানাপ্রকার বীজ বপন করিয়া থাকে। ইহারা গোরু, লাঙ্গল বা কৃষিকার্য্যের উপযোগী অন্য কোন যন্ত্র বা সার ব্যবহার না করিয়া এইরূপ সামান্য উপায়ে কৃষিকার্য্য সম্পাদিত করিয়া থাকে। এরূপ বর্ব্বর প্রথা কখনই অনুকরণীয় নহে। সাঁওতাল জাতি ইহা অপেক্ষা কিছু উন্নত নিয়মে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা গোরু ও লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং বহু পরিশ্রম সহকারে প্রস্তর সমস্ত ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত ও ভূমি সমতল করিয়া চাষ করে। কিন্তু ইহারাও নানাপ্রকার বীজ এক সঙ্গে বপন করিয়া থাকে। অড়হর, ভুট্টা, জুয়ার, মেস্তা পাট, মেস্তা, বর্ব্বটী, এই সকল ফসল একত্রে লাগাইয়া, যখন যেটী প্রস্তুত হইয়া আইসে, তখন সেইটীকে পৃথক্ করিয়া কাটিয়া লয়। কার্পাস, অড়হর ও রেড়িও সাঁওতাল ও বেহারী লোকে একত্র বুনিয়া থাকে। একটী ফসল উচ্চ হইয়া গিয়া অপর ফসল গুলিকে দাবিয়া রাখে। যেটী উচ্চ হইয়া যায় সেটীও তেমন ফলবান হয় না। গম, যব, ছোলা, সর্ষপ, মসিনা, ইত্যাদি রবি ফসল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রেই একত্রে মিশাইয়া

লাগান হয়। বস্তুতঃ মিশ্র ফসল সম্বন্ধে যতগুলি পরীক্ষা এদেশে হইয়াছে সমস্তরই ফল প্রায় মিশ্র ফসলের বিপক্ষবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্ষপ বুনিয়া দিয়া ঐ জমিতেই যদি ১০।১৫ দিবস বাদে মটর বোনা হয় তাহা হইলে ফল একরূপ মন্দ হয় না। সর্ষপ গাছগুলি প্রথমে বাড়িয়া যায়, পরে মটর গাছগুলি লতাইয়া সর্ষপ গাছকে অবলম্বন করিয়া সুচারুরূপে বাড়িতে থাকে। এইটী ব্যতীত আর কোন মিশ্র ফসল জন্মাইয়া যে কৃষকেরা লাভবান হয় এমন কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পাঁচ রকম ফসল এক সঙ্গে ঘন হইয়া বাড়িয়া যাইতেছে, গাছগুলি ছোট থাকিতে ইহা অতি সুন্দর দেখায়, কিন্তু ক্রমশঃ স্থানাভাবে, রৌদ্র ও বায়ুর অভাবে, বিভিন্ন প্রকার ফসলের জন্য যে সকল বিভিন্ন প্রকার পাইট আবশ্যক ঐ সকল পাইটের অভাবে, শস্য অতি সামান্য জন্মে। এদেশ হইতে মিশ্র ফসল জন্মাইবার প্রথা এককালীন উঠিয়া যাওয়াই ভাল। এই প্রথা বস্তুতঃ পৃথিবীর আদিম নিবাসীদের বর্ব্বর কৃষি-প্রথার অবসান মাত্র।

সাধারণ কৃষি-কার্য্য।—সাধারণ কৃষি-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে কোন একটী বিশেষ কৃষি-পর্য্যায় অবলম্বন করা বিধেয়। মৃত্তিকাভেদে, ও জমির অবস্থানভেদে, স্থানীয় শস্য সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কৃষি-পর্য্যায় স্থির করা আবশ্যক। যেস্থানে গোরু, ঘোড়া, ইত্যাদি জন্তুর মল-মূত্র সহজেই সংগ্রহ করিতে পারা যায় সেস্থানে জমির উৎকর্ষসাধণার্থ শন, ধইঞ্চা প্রভৃতি সামান্য মূল্যের ফসল লাগান বৃথা। সার যাহাতে না কিনিতে হয়, খরচ যাহাতে অধিক না হয়, জমি যাহাতে নিস্তেজ হইয়া না যায়, ফসল যাহাতে সহজে বিক্রয় হয়, এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কৃষি-কার্য্য পরিচালন

করা কর্ত্তব্য। কৃষি-কার্য্য "সকের" জিনিষ নহে, ইহা মানুষের উপজীবিকার উপায়, ইহা লাভালাভের কথা। অনেক টাকা খরচ করিয়া সার কিনিয়া, মজুর খাটাইয়া, বহুমূল্য বীজ সকল ক্রয় করিয়া, উত্তম ফল দেখান কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্য নহে। কিসে সার আদৌ না ক্রয় করিয়া চলে, কিরূপে কার্য্য করিলে মজুর-খরচ কম হয়, কিরূপে বীজ না কিনিয়া ঘরের বীজ রক্ষা করা যায়, এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কৃষকের আবশ্যক। বলদকে ভাল করিয়া খোল খাওয়াইলে উহাদের দ্বারা কাযও অধিক পাওয়া যাইবে অথচ জমিরও উন্নতি হইবে, একারণ সার ক্রয়ের পরিবর্ত্তে কৃষকের কর্ত্তব্য বলদকে সারবান খোল খাওয়ান। ধইঞ্চা প্রভৃতি ফসল জন্মানরও এই উদ্দেশ্য। কি গ্রীষ্ম, কি শীত দুই কালেই কলাই জাতীয় ফসল লাগাইলে জমি নিস্তেজ হইয়া যায় না, এই জ্ঞানটী সকল কৃষকেরই থাকা কর্ত্তব্য। সাধারণ কৃষিকার্য্য করিতে হইলে দুই ঋতুতেই কিছু কিছু কলাই জাতীয় ফসল জন্মান উচিত। রবি শস্যের সহিত কলাই জাতীয় ফসল লাগানর প্রথা এদেশে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্ষাকালের উপযুক্তও কতকগুলি কলাই জাতীয় ফসল আছে। এ গুলি কৃষকদের জানিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। কুলথ কলাই, বর্ব্বটী, ঘোড়ামুগ, ভৃঙ্গী, অড়হরীয়া সীম, চীনারবাদাম, অড়হর, ধইঞ্চা, শন, নীল এই কয়েকটী ফসল বর্ষাকালে জন্মাইতে পারা যায়। এ সকল ফসল জন্মানতে খরচ অতি যৎসামান্য হইয়া থাকে। চৈত্র, বৈশাখ মাসে দুই তিন বার লাঙ্গল-মৈ দিয়া, পরে বীজ ছিটাইয়া আর একবার লাঙ্গল-মৈ দিয়া শেষে ফসল পাকিলে কাটিয়া লইতে হয়। বর্ব্বটী, চীনারবাদাম, নীল, অড়হর ও শনে একটা নিড়ান বা মাটী চাপান আবশ্যক, অপর কয়টী ফসলের জন্য তাহাও আবশ্যক নাই। ধান, পাট, কলাই, মুগ,

ছোলা, মুসুরি, খেঁসারি, মসিনা, সর্ষপ, তিল, গম, যব, যই, মেস্তা-পাট, এ সকল ফসল জন্মাইতেও খরচ নিতান্ত কম হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে গুলি কলাই জাতীয় নহে সে গুলির দ্বারাও জমির তেজঃ অধিক হ্রাস হয় না। এ কারণ এই সকল ফসলই সাধারণ কৃষিকার্য্যের উপযোগী। আক্, আলু, বেগুন, লঙ্কা তামাক, তুঁত, এ সকল ফসল জন্মাইতে অধিক ব্যয় ও যত্ন আবশ্যক। সকল কৃষকে এ সকল জন্মাইয়া উঠিতে পারে না। তবে অল্প পরিমাণে এ সকল ফসল লাগাইলে বাহিরের মজুর না খাটাইয়াও চলিতে পারে। যে সময় আক লাগান হয় সে সময়ে কৃষকের প্রায় আর কোনই কার্য্য থাকে না; যে সময়ে লঙ্কা নাড়িয়া পুতিতে হয় সে সময়ে প্রায় ধান্য রোপণ শেষ হইয়া আইসে; যে সময়ে বেগুন গাছ নাড়িয়া পুতিত হয় সে সময়ে ধান্য রোপণ আরম্ভ হয় না; তামাক নাড়িয়া পোতা আগুধান্য কাটিবার পূর্ব্বেই সমাধা হইয়া যায়, এবং আমন ধান্য কাটা শেষ হইলে তামাকের ডগা ভাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই সকল কারণে কিছু কিছু এই সমস্ত ফসল লাগান দ্বারা কৃষক সম্বৎসর খাটিয়া অধিক লাভবান হইতে পারে। এ সকল ফসল লাগানতে অধিক যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক হইলেও ইহাদের সাধারণ কৃষিকার্য্যের আনুসঙ্গিক ভাবে জন্মান যাইতে পারে। সাধারণ-কৃষি-কার্য্য বিশেষ বিশেষ নিয়মে পরিচালিত হইতে পারে। খালের ধারের ক্ষেত্রে জল আনাইয়া বিনা-সারে ধান, পাট, গম, আলু, আক্, ইত্যাদি যে সকল ফসল সুবৃষ্টি না হইলে অথবা জল দিবার ব্যবস্থা না থাকিলে ভাল জন্মে না, ঐ সকল উত্তম জন্মান যায়। পাহাড়ের ধারের অনুর্ব্বর জমিতে কেবল গোরু ছাগলের খাইবার উপযুক্ত ঘাস ও অন্যান্য ফসল জন্মাইয়া গোরু ছাগল মাত্র পালন

করাই ভাল। যেসকল পাহাড়ের ধারের জমি উর্ব্বর উহাতে যদি বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, তাহা হইলে জমি থাকে-থাকে সমতল করিয়া ও আইল্ বাঁধিয়া লইয়া ধান, কলাই, গম, ছোলা, প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উপযোগী ফসল লাগান যাইতে পারে। কোন কোন ভূভাগের জমি এত নিস্তেজ ও বালুকাময়, যে সে সকল জমিতে কেবল উট্বন্দী নিয়মে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ, দুইতিন বৎসর ঐ সকল জমি চাষ করিয়া পরে কৃষকগণ দুইতিন বৎসরের জন্য উহা পতিত ফেলিয়া রাখে। নিতান্ত আঁঠিয়াল্ মাটি হইলেও ৫।৬ বৎসর অন্তর এক বৎসর করিয়া জমি পতিত রাখাতে উপকার আছে। কেবল উর্ব্বর দো-আঁশ জমি পতিত ফেলিয়া রাখায় লাভ নাই,—উহা প্রতি বৎসরেই চাষ করা উচিত, এবং সার বা খালের জল দ্বারা ও কলাই জাতীয় ফসল মধ্যে মধ্যে লাগাইয়া জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করা আবশ্যক। সাধারণ কৃষিকার্য্য করিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখা কৃষকদের বিশেষ কর্ত্তব্য। বায়ুতে সারবান পদার্থ আছে। মৃত্তিকার মধ্যে সহজে যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য। রৌদ্রও অধিকাংশ ফসলের জীবন। রৌদ্র ও বায়ু যাহাতে গাছের চারিদিকে ও মৃত্তিকার মধ্যে খেলিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিতে গেলে দুইটী প্রথা অবলম্বন করা আবশ্যক। লাইন্ ধরিয়া শস্য জন্মাইতে পারিলে, হাতে চালান "হো" বা চক্র-নিড়ানী ব্যবহার দ্বারা অনায়াসে জমি আল্গা রাখা যাইতে পারে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরে যতবার "হো" চালান যায় ততই ফসলের জোর হয় ও শস্য অধিক জন্মে। সার দেওয়াতে যেমন ফসলের তেজঃ হয়, "হো" চালানতেও সেইরূপ তেজঃ হয়। হো-চালানর প্রথা এদেশে প্রচলিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে "দাওড়া" ও "ডুণ্ডিয়া" নামক দুইপ্রাকার চক্র-বিহীন হো-য়ের ব্যবহার আছে। গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র গুলিতে প্ল্যানেট্ জুনিয়ার-হো নামক চক্র-নিড়ানীর ব্যবহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতেছে। এই যন্ত্রের মূল্য অধিক বলিয়া কৃষকদিগের মধ্যে ইহা যে ব্যবহৃত হইবে এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু এইরূপ হো এদেশে ৮।১০ টাকা খরচে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। বায়ু ও রৌদ্র যাহাতে ফসলে অধিক লাগে তাহার আর একটী উপায় বীজ অল্প ব্যবহার করা, অর্থাৎ গাছগুলি ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া জন্মান। ধান গাছের এক একটী মাত্র বীজ এক ফুট বা পনের ইঞ্চি অন্তর লাগান উচিত। পাটগাছ নয় ইঞ্চি অন্তর জন্মান উচিত। ইক্ষু প্রত্যেক ছয় ফুট জমিতে দুইটীমাত্র সারি লাগাইয়া অতি উত্তম ফল পাওয়া যাইতেছে। এরূপ ভাবে ফসল জন্মাইলে বায়ু ও রৌদ্রও অধিক লাগিবে এবং হো চালাইবারও সুবিধা ঘটিবে। এ দেশের কৃষকদিগের এই উন্নতিটী অবলম্বন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবে। যে সকল ক্ষেত্র নিতান্ত উর্ব্বর ঐ সকল ক্ষেত্রে ৩।৪ বৎসর উপর্য্যুপরি ধান, পাট, এমন কি আলু লাগাইয়াও উত্তম ফল পাওয়া যায়। সুন্দর-বনে যে সকল জমি আবাদ হইতেছে উহাতে প্রতি বৎসর অতি সুন্দর ধান জন্মিতেছে। ক্রমশঃ জমি নিস্তেজ হইয়া আসিলে এ সকল ক্ষেত্রেও কৃষি-পর্য্যায় অবলম্বন না করিলে চলিবে না। সাহেব দিগের চা-বাগানে এখন আর পূর্ব্বেকার মত চা জন্মিতেছে না, উপরন্তু কীট ও রোগ প্রবেশ করিয়া অনেক ক্ষতি করিতেছে। অনেককাল ধরিয়া একই জমিতেই এক ফসল জন্মানতে এইরূপ ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম হইতেই জমির অবস্থা, বৃষ্টিপাতাদির অবস্থা, এই স্থানীই ফসলের অবস্থা সমস্ত পর্য্যালোচনা

করিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ানুসারে কার্য্য করিলে পরে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

ঐশ্বরিক নিয়ম।—সাধারণ কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইলে পঞ্জিকার উপর নির্ভর না করিয়া পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করা বিশেষ আবশ্যক। পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট দিবসে হল-চালন, বীজ-বপন ইত্যাদি করিতে গিয়া কৃষকগণ স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতাদি ঋতুর পরিবর্ত্তণ উপেক্ষা করিয়া থাকে। সকল জেলা বা সকল গ্রামের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় না। একই বৎসরে এক জেলায় অতিবৃষ্টি ও অপর জেলায় অনাবৃষ্টি হইতে দেখা যায়। একই দিবসে এক গ্রামে সুন্দর বৃষ্টি হইয়া গেল নিকটবর্ত্তী অপর আর একটী গ্রামে বৃষ্টি হইল না, ইহা প্রতি বৎসরেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃষ্টিপাতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তিথি-নক্ষত্রের উপর নির্ভর করা নিতান্ত ভ্রম। পরমেশ্বর অসময়ে বৃষ্টি দিলেন, এ বৃষ্টি কোনই কার্য্যে আসিবে না, এইরূপ মনে করিয়া কৃষকগণ প্রায়ই তিথি-নক্ষত্রের অপেক্ষায় থাকিয়া বৃষ্টিপাত অবহেলা করিয়া থাকে। অসময়ে বৃষ্টিপাত হইলেও ক্ষেত্রের কোন না কোন কার্য্য করা বিধেয়। বৃষ্টি হইয়া ভূমি যদি কর্ষণোপযোগী হয় তবে ভূমি কর্ষণ না করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হওয়া সম্ভব। সমস্ত ভূমি ভালরূপ আবাদ হইয়া যাইবার পরে যদি পুনরায় সুবৃষ্টি হয় তবে এবারেও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চীনা, বর্ব্বটী, চীনার-বাদাম, ইত্যাদি যে সকল ফসল এক পস্লা ভালরূপ জল হইলেই নিঃসন্দেহে বোনা যাইতে পারে এরূপ কয়েকটী ফসলের বীজ বপন করা উচিত। মাঘ ও ফাল্গুন মাসের বৃষ্টি জমি প্রস্তুত করিবার জন্যই ব্যবহার করা উচিত। চৈত্রে যদি উত্তম বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে, ও উড়িষ্যায় আশু-ধানা,

পাট, মেস্তাপাট, ভুট্টা এ সকল ফসলের বীজও লাগান যাইতে পারে। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া থাকে এ কারণ এ সকল ফসলের বীজ চৈত্র মাসে লাগান উচিত নহে। যিনি চৈত্রে সু-বৃষ্টি দান করিয়াছেন, তিনি বৈশাখেও সুবৃষ্টি দান করিয়া ফসল বাঁচাইয়া রাখিবার পন্থা করিয়া দিবেন, এইরূপ বিশ্বাসে, যে সকল ফসল অতি সামান্য বৃষ্টিতে পরিপোষিত হইয়া থাকে চৈত্রে ঐ সকল ফসল সুবৃষ্টি হইলে নিঃসন্দেহ লাগান যাইতে পারে। কাস্নাভা বা সিমুল-আলু, আদা, হরিদ্রা, এ সকল ফসলও চৈত্রে বৃষ্টি হইলে প্রস্তুত জমিতে অমনই লাগান উচিত। কি জানি যদি এখন আর দুই মাস বৃষ্টি না হয়, এই মনে করিয়া চৈত্রের সুবৃষ্টি এক কালীন অবহেলা করা নিতান্ত অন্যায়। এইরূপ বৃষ্টি অবহেলা করিতে করিতে অনেক কৃষক কোন কোন বৎসর ভাদ্র মাসের প্রথমে ধানের জমিতে চাষ দিয়া বীজ রোপণ করে, এবং কার্ত্তিক মাসে বর্ষা শেষ হইয়া যাওয়াতে একমাত্র বর্ষার জল ও অগ্রহায়নী ধানের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া থাকে। অসময়ে সুবৃষ্টি হইলেই উহাকে ব্যবহারে আনিতে হইবে এই মূলমন্ত্র সাধারণ কৃষিকার্য্যের একটী ভিত্তি।

স্থানীয় পদ্ধতি।—সাধারণ কৃষিকার্য্য করিতে হইলে আর একটী কথা স্মরণ রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। স্থানীয় কৃষিপদ্ধতি ও স্থানীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। ক্রমশঃ নূতন নূতন পদ্ধতি, নূতন নূতন ফসল, নূতন নূতন যন্ত্র ধীরে ধীরে পরীক্ষার ফল দেখিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ধনীব্যক্তি যদি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মানস করেন তাহা হইলে তাঁহার আরও সতর্কের সহিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এক

কালীন ৫০০।৭০০ বিঘা জমি লইয়া, নূতন নিয়মে নূতন নূতন ফসল জন্মাইয়া, তাঁহার সমূহ ক্ষতি-গ্রস্ত হওয়াই অধিক সম্ভাবনা। নিজের ঘরের খরচের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক এ সমস্ত দ্রব্য জন্মাইতে জন্মাইতে, কোন্ দ্রব্য জমিতে উত্তম জন্মে, কোন্ দ্রব্য অনেকে আদর করিতেছে, উহার বীজ পাইবার জন্য কৃষকগণ পর্য্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, কোন্ দ্রব্য সহজে অধিক মূল্য দিয়া আদর করিয়া অনেকে লইতে চাহিতেছে, এই সকল বুঝিয়া ক্রমশঃ কার্য্য কোন না কোন দিকে বাড়াইতে পারা যায়। কৃষকদিগের সহিত ধনী ব্যক্তির প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না। এ কারণ ধনীব্যক্তির কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সাধারণ নিয়মে ধান, কলাই, পাট, এ সমস্তের চাষ করিলে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষকদিগের সহিত ভাগে কায করিয়া লাভ আছে। জমি ও উত্তম উত্তম বীজ ধনীব্যক্তি যোগাইবেন, কৃষকগণ নিজেদের লাঙ্গাল-বলদ দ্বারা চাষাবাদ করিবে, ফসল অর্দ্ধা-অর্দ্ধি ভাগ হইবে, এইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া ধনীব্যক্তি ভাল ভাল জাতীয় চাউল, পাট, কার্পাস, ইত্যাদি সামগ্রী কৃষকদিগের দ্বারা জন্মাইয়া লইয়া দেশেরও উন্নতি করিতে পারেন, নিজেও লাভবান হইতে পারেন। সমুদ্রবালী ও পেশোয়ারী চাউল ৭৲।৮৲ টাকা মন দরে বিক্রয় হইতে পারে। কৃষকগণ যে ধান্য জন্মায় উহা প্রায় ফসল কাটিবার সময় ১৲ টাকা মন দরে বিক্রয় হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ ধান্য পুরাতন করিয়া, উহা হইতে কলের সাহায্যে চাউল বাহির করিয়া, কলিকাতার বিশেষ একটী স্থানে শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরাতন চাউলের আড়ত করিয়া ধনীব্যক্তি বিশেষ লাভবান হইতে পারেন। পাট অপেক্ষা মেস্তা-পাট অধিক দরে বিক্রয় হয়। উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত নীরস জমিতে মেস্তাপাট জন্মাইয়া ধনীব্যক্তি বিশেষ

লাভবান হইতে পারেন। বালুকাময় স্থানে চীনাবাদাম জন্মাইলে লাভ হওয়া সম্ভব। চীনার বাদামের ক্ষেত্রে বৃহদারের ঢাকাই বা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস চারি হাত অন্তর লাগাইয়া দেওয়াতে আরও অধিক লাভ হওয়া সম্ভব। এই সকল লাভবান ফসল কৃষক-দিগের সাহায্যে জন্মাইয়া কলিকাতা সহরে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সুচারুরূপে কার্য্য চলিতে পারে।

সাধারণ কৃষিকার্য্যের আয়ব্যয়।—সাধারণ কৃষিকার্য্যের দ্বারা, অর্থাৎ ধান, পাট, কার্পাস, মুগ, কলাই, সর্ষপ, তিসি, তিল, ইত্যাদি ফসল হইতে বাৎসরিক বিঘাপ্রতি গড়ে ১৫।২০৲ টাকা আয় হইতে পারে। লাঙ্গল বলদ ভাড়া করিয়া ও মজুরের বেতন দিয়া কার্য্য করিলে ব্যয় বিঘাপ্রতি ১৬৲ টাকার কম হওয়া সম্ভব নহে। এমন স্থলে লাভ লোকসানে পরিণত হওয়া অতি সহজ। অতি সতর্কে, কৃষকদের সহিত ভাগে, শ্রেষ্ঠ জাতীয় ফসল জন্মাইয়া, লাভের মাত্রা বাড়াইতে পারা যায় এবং ক্রমশঃ কার্য্য বিস্তৃত ভাবে চালাইয়া লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অসতর্কতা, অনভিজ্ঞতা ও অনিয়ম প্রযুক্ত কৃষিকার্য্যের দ্বারা অর্থের অপচয় হওয়াই সম্ভব। কৃষিকার্য্য ভাল করিয়া শিক্ষা না করিয়া অর্থব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র।

কার্য্যের বন্দোবস্ত।—কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কি কি আবশ্যক ও কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণ অর্থব্যয় হওয়া সম্ভব তৎসম্বন্ধে, এ স্থলে কিছু আভাস দেওয়া উচিত। পগার, বেড়া, আইল, রাস্তা, জল-সেচন প্রণালী, জল-নির্গমন প্রণালী, এ সকল প্রস্তুত করিতে ক্ষুদ্র ক্ষেত্র অপেক্ষা বৃহৎ ক্ষেত্রে খরচের অনুপাত কম হয়। স্থান-বিশেষে ১০০০ ঘন ফুট ম কাটিতে দুই টাকাও

খরচ হয়, আবার স্থান বিশেষে পাঁচ টাকাও হয়। জল-সেচন-প্রণালী আইলের উপর দিয়া হওয়াই উচিত। প্রত্যেক ১০০০ ফুট জল-সেচন প্রণালী প্রস্তুত করিতে ১৲ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হইতে পারে। আইলের মধ্যদিয়া ছয় ইঞ্চি মাত্র গভীর প্রণালী প্রস্তুত করাতে যথেষ্ট হয়। জল-নির্গমন প্রণালী গুলি ক্ষেত্রের সর্ব্ব নিম্নস্থল দিয়া আইল কাটিয়া রাস্তার পার্শ্ব দিয়া ক্রমশঃ মাঠের চতুস্পার্শ্বে যে পগার আছে ঐ পগারে লইয়া যাইতে হয়। সমতল মাঠে এই প্রণালী গুলি ক্রম নিম্ন হইয়া এক ফুট পর্য্যন্ত গভীর হইলেই চলে। সমতল ভূমিতে জল নির্গমন প্রস্তুত করিতেও হাজার ঘন ফুটে দুই এক টাকা খরচ হওয়া সম্ভব। পগারের ভিতর দিকে বেড়া থাকা উচিত। বেড়া কোঙ্গা, টৌরি, বেত, অসেজ্-অরেঞ্জ, ইঙ্গাডাল্‌সিস্, ইত্যাদি এমন সকল গাছের করা উচিত যে সকল উপকারেও আসিতে পারে, অথচ কণ্টক প্রযুক্ত বলিয়া উহাদের ভেদ করিয়া গোরু ছাগলও আসিতে না পারে। টৌরি গাছের বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে এক স্থানে লাগাইয়া দিয়া, আষাঢ় মাসে গাছগুলি এক হাত আন্দাজ উচ্চ হইলে শিকড়শুদ্ধ উঠাইয়া দুই ফুট অন্তর মাঠের চারিদিকে পগারের ধারে ধারে লাগাইয়া দিতে হয়। কোঙ্গা, বেতগাছ, অসেজ অরেঞ্জ ও ইঙ্গাডল্ সিস্ ৪ হাত অন্তর লাগাইতে হয়। পগার, বেড়া, জল-প্রণালী, রাস্তা, আইল, এ সকল প্রস্তুত করিতে বিঘাপ্রতি ৫৲ টাকাও খরচ হইতে পারে আবার সুযোগ বিশেষে ১৲ টাকা খরচে ও এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। স্থান বিশেষে কার্য্য আরম্ভ করিতে জঙ্গল কাটা ও জ্বালাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জঙ্গল কাটাইয়া জ্বালানী কাষ্ঠ বিক্রয় করায় কিছু লাভ ও দাঁড়াইতে পারে। লাভ দাঁড়াইবার যদি সম্ভব না থাকে তাহা হইলে জঙ্গল অগ্নি দ্বারা এক কালীন

দগ্ধ করিয়া দিয়া জমি প্রস্তুত করা উচিত। জমি, রাস্তা, প্রণালী ইত্যাদি ঠিক্ করিতে একার প্রতি গড়ে ১০৲ টাকা খরচ হওয়া সম্ভব।

বলদ কিনিতেও একার প্রতি ১০৲ টাকা খরচ ধরা যাইতে পারে। এক যোড়া বলদে এক হাল জমি, অর্থাৎ ১৫ হইতে ২০ বিঘা (৫।৬ একার) জমি, চাষ করা যাইতে পারে। এক যোড়া বলদ কিনিতে ৫০৲।৬০৲ টাকা, অর্থাৎ একার প্রতি ১০৲ টাকা, খরচ হইতে পারে।

কৃষি-যন্ত্র ক্রয় ও প্রস্তুত করিয়া লইতেও একার প্রতি ১০৲ টাকা খরচ ধরা যাইতে পারে। এক হাল জমি চাষ করিতে হইলে একটী লাঙ্গল, একটী মৈ, একটী বিদা, একখানা কোদাল, চারিখানা নিড়ানী, দুই খানা কাস্তে, একটা বাখার (৫৲ টাকা), একখানি প্লানেট্ জুনিয়ার হো, (২০৲ টাকা) একটী পাঁচফাল গ্রাবার (১৫৲ টাকা), বটি, টব্, গাম্লা, এই সকল যন্ত্র থাকা উচিত। এ সমস্ত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে ৬০৲ টাকা আন্দাজ খরচ পড়ে। বিস্তৃতভাবে কৃষিকার্য্য করিতে গেলে বলদের গাড়ি, ওজনের পাল্লা, দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল, ইত্যাদি কতকগুলি সরঞ্জাম থাকাও আবশ্যক। কিন্তু প্রত্যেক ৬ একারের জন্য একখানি বাখার ও গ্রাবার আবশ্যক করে না। ছোট, বড় সকল প্রকার কৃষিক্ষেত্রের জন্যই কৃষি-যন্ত্রের জন্য একার প্রতি ১০৲ টাকা মূলধন আবশ্যক।

ঘর বাড়ি প্রস্তুত করিবার নিরিখ্ ঠিক্ করা কিছু দুরূহ। ৫০০ একার একটী চাষ-বাগানে ৫০০০ টাকার ঘর-বাড়ি প্রস্তুত করিয়া সকল কার্য্য চালান যাইতে পারে, কিন্তু ১০ একার বাগানে ১০০ টাকা দিয়া বাসগৃহ, খামার, গোরুর চালা, ইত্যাদি প্রস্তুত করা

দুরূহ। তবে যে ব্যক্তি ১০ একার বা ৩০ বিঘা জমির চাষ করে সে নিজের হাতেই বাঁশ কাটা, মাটি খোঁড়া, দেওয়াল দেওয়া এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। এ কারণ একার প্রতি ঘর বাড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য যদি ১০৲ টাকা ধরা যায় তাহা হইলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। অবশ্য যে ব্যক্তি উপজীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে সে শস্তা স্থানে যাইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিবে। যে কৃষক ১০।১৫ একার জমি করিয়া থাকে সে ১০০৲।১৫০৲ টাকার অধিক কখনই ঘর বাড়িতে খরচ করে না। কোন ভদ্রলোক যদি ৫০, ৬০ বা ১০০ একার জমি লইয়া চাষ আরম্ভ করেন তাঁহারও কর্ত্তব্য ৫০০৲ ৬০০৲ বা ১০০০ টাকার মধ্যে ঘর বাড়ি প্রস্তুত করিয়া লওয়া। যে ব্যক্তি ১০, ০০০৲ বা ২০, ০০০৲ টাকার অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া চাষ-বানসা আবাদ করিতে করেন তাঁহার কর্ত্তব্য ১০০০ বা ২০০০ একার জমি চাষ করা।

মূলধন।—অতএব দেখা যাইতেছে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে—

জমি ঠিক্ করিয়া লইবার জন্য		১০৲ টাকা
বলদ কিনিবার	„	১০৲ টাকা
কৃষি-যন্ত্র কিনিবার	„	১০৲ টাকা
ঘর বাড়ি প্রস্তুত করিবার	„	১০৲ টাকা

অর্থাৎ, সর্ব্বশুদ্ধ একার প্রতি ৪০৲ টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য করা আবশ্যক।

বাৎসরিক ব্যয়।—ইহার উপর আবার বাৎসরিক ব্যয়, অর্থাৎ মজুর খরচ, গোরুর খোরাক, খাজনা ও অন্যান্য পাঁচ রকম খরচ আছে। আঁঠিয়াল মাটিতে একজোড়া দেশী বলদের দ্বারা

বৎসরে ৫ একার জমির অধিক চাষ চলে না। বালুকাময় দো-আঁশ জমি ৬।৭ একার পর্য্যন্ত একজোড়া দেশী বলদ দ্বারা চাষকরা যাইতে পারে। প্রত্যেক বলদ যোড়ার প্রতি একজন করিয়া চাষী আবশ্যক। নিড়ানের জন্য বিঘাপ্রতি ৮ জন মজুর আবশ্যক। প্রত্যেক ১০টা বলদের রক্ষার জন্য একজন লোক আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত আর আর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেও কিছু লোক আবশ্যক। ইক্ষু, আলু, ইত্যাদি ফসল লাগাইতে হইলে মজুর-খরচ অধিক লাগে। মোটের উপর সাধারণ কৃষিকার্য্যের জন্য দুই একার জমিতে একজন করিয়া মজুর লাগে। কেবল আলু, কি কপি, কি আক, কি বিলাতী সব্জী লাগাইতে হইলে একার প্রতি দুইজন পর্য্যন্ত লোক আবশ্যক হইতে পারে। ধান, পাট, কলাই, ইত্যাদি ফসল অধিক লাগাইয়া অতি যৎসামান্য আক, আলু, বেগুণ, ইত্যাদি ফসল লাগাইলে প্রতি হাল জমির জন্য ২।৩ জন মজুর আবশ্যক। একজন কৃষকের পরিবারে ৪।৫ জন করিয়া লোক থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রায় এক জন কার্য্যক্ষম পুরুষ, একজন কার্য্য-ক্ষম স্ত্রী ও কিছু কিছু কার্য্য করিতে পারে এমন আর দুইজন বৃদ্ধ বা শিশু থাকে। একারণ বাহিরের মজুর না খাটাইয়া একটী কৃষক পরিবার একহাল জমি চালাইয়া দিতে পারে। ধনীব্যক্তিকে চাষাবাদ চালাইতে হইলে প্রতি হাল জমির জন্য, অর্থাৎ প্রত্যেক ১৫।২০ বিঘা জমির জন্য ২।৩ জন, মজুর রাখা আবশ্যক। ইহাদের মাসিক ৬৲ টাকা বেতন দিতে হইলে ২½ জন মজুরের জন্য বৎসরে ১৮০৲ টাকা খরচ হয়, অর্থাৎ ৫ একার চাষ করিতে বৎসরে ১৮০৲ টাকা মজুর খরচ, অথবা একার প্রতি ৩৬৲ টাকা খরচ হয়। গোরুর খোরাক কেবল খোল ও লবণ বাহির হইতে ক্রয় করা উচিত, অবশিষ্ট সমস্ত চাষ বাগানেই হওয়া উচিত। প্রত্যেক ৫।৬

একারের জন্য যদি এক যোড়া বলদ রাখিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যহ উহাদের গড়ে একসের করিয়া খোল ও অর্দ্ধ ছটাক করিয়া লবণ দেওয়াতে মাসে ২॥০ টাকা আন্দাজ খরচ পড়ে, অর্থাৎ, বৎসরে ৩০৲ টাকা, অথবা একার প্রতি ৫৲।৬৲ টাকা। খাজনা একার প্রতি ৬৲ টাকা ধরা যাইতে পারে, এবং অন্যান্য খরচ ২৲ টাকা করিয়া। তবেই দেখা যাইতেছে বাৎসরিক খরচের জন্য প্রত্যেক একার প্রতি (৩৬৲ + ৬৲ + ৩৲ + ২৲ = ৪৭) প্রায় ৫০৲ টাকা হাতে থাকা আবশ্যক।

আয়।—সাধারণ কৃষিকার্য্য, অর্থাৎ, ধান, পাট, কলাই, সর্ষপ, ইত্যাদি জন্মাইয়া বৎসরে একার প্রতি ৫০৲ টাকার অধিক আয় আশা করা যায় না। ৫ একারের মধ্যে ৩ একার ধান হইতে (৬০ মণ ধান হইতে) ১০০৲ টাকা, ২ একার পাট হইতে (৩০ মণ পাট হইতে) ১২০৲ টাকা, ও ২ একার (১৫ মণ) সর্ষপ, কলাই, মুসুরি, ইত্যাদি হইতে ৩০ টাকা আয় হইতে পারে। ধানের ও কলাই ও মুসুরির খড় বলদের খোরাক বলিয়া ইহার দাম ধরা গেল না। এই (১০০+১২০+৩০=) ২৫০৲ টাকা পাঁচ একারের আয়। কাযেই দেখা যাইতেছে মজুর রাখিয়া সাধারণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে লাভ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। কৃষকগণ নিজ হাতে কাজ করে বলিয়া তাহাদের কৃষিকার্য্য করাতে লোক্‌সান নাই। বিশেষ বিশেষ জাতীয় (পেশোয়ারি সোয়াতি, সমুদ্রবালি, ইত্যাদি) ধান জন্মাইয়া এবং কৃষকদিগের সহিত ভাগে কায করিয়া বলদ রাখিবার ও মজুরি খরচ বাঁচাইয়া, কৃষিকার্য্যের দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে।

ঊনবিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। কয়েকটী বহুমূল্য ফসলের নাম কর।

২। একটী মাত্র বহুমূল্য ফসলের আবাদের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে কি কি কথা বলা যাইতে পারে?

৩। সব্জী-বাগের কার্য্য সাধারণ কৃষিকার্য্যের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে কি না কারণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। সব্জী-বাগান করিতে হইলে কিরূপ নিয়মে ও কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হয়?

৫। ফলের বাগানের কার্য্য সাধারণ কৃষিকার্য্যের অন্তর্ভূত কি না?

৬। দুই এক বৎসরের মধ্যে ফলে এরূপ কয়েকটী ফলের নাম কর। এই সকলের বাগান করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়?

৭। জ্যাম্ ও জেলি কাহাকে কহে। কোন্টী কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় বুঝাইয়া দাও। জ্যাম্ বা জেলি প্রস্তুত করার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দাও।

৮। ফলের আরক কিরূপে প্রস্তুত করিতে পারা যায়?

৯। ফল বা ফলের রস পচিয়া যায় কেন? পচিয়া যাওয়া কিরূপে নিবারিত হইতে পারে?

১০। মর্ত্তমান কলার জেলি ও ছাতু প্রস্তুতের প্রণালী বর্ণনা কর।

১১। জুম্-চাষ কাহাকে কহে?

১২। মিশ্র-ফসলের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তোমার যাহা বলিবার আছে বল। মিশ্র-ফসলের কয়েকটী উদাহরণ দাও।

১৩। সাধারণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কি কি বিষয় স্মরণ রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য ?

১৪। অবস্থাভেদে কৃষি-পর্য্যায় অবলম্বন করিতে হয়, এই কথার সার্থকতা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১৫। বহুমূল্য ফসল কয়েকটী সাধারণ কৃষিকার্য্যের আনুসঙ্গিক করিয়া লওয়া উচিত কি না ?

১৬। হো ও ভুঁড়িওয়া কাহাকে কহে ? ইহাদের ব্যবহার দ্বারা কি উপকার দর্শে ?

১৭। পঞ্জিকা দেখিয়া বা তিথি-নক্ষত্রের উপর নির্ভর করিয়া হল-কর্ষণ, বীজ-বপন প্রভৃতি করাতে কিরূপ ফল হওয়া সম্ভব, হেতু দেখাইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৮। মাঘ মাসে ও ফাল্গুন মাসে, দুই মাসেই যদি সুবৃষ্টি হয় তাহা হইলে কৃষকের কি কর্ত্তব্য ? তাহার পরে চৈত্র মাসেও যদি সুবৃষ্টি হয় তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য ?

১৯। ধনী ব্যক্তি কৃষি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যদি কৃষি-কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে তাঁহার কি পদ্ধতিতে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ?

২০। সাধারণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কিরূপ কার্য্যের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য একার প্রতি কত এককালীন ও বাৎসরিক খরচ হওয়া সম্ভব ?

২১। বেড়া কোন্ কোন্ গাছের দেওয়া উচিত ?

২২। বিশ-পঞ্চাশ একার জমি লইয়া কার্য্য করিতে হইলে কোন্ কোন্ কৃষি-যন্ত্র আবশ্যক ? বিস্তৃতভাবে কার্য্য করিতে হইলে আর কোন্ কোন্ যন্ত্র বা ব্যবস্থা থাকা উচিত ?

২৩। সাধারণ কৃষিকার্য্য দ্বারা একার প্রতি কত আয় হওয়া সম্ভব ইহার একটী হিসাব দাও।

বিংশ অধ্যায়।

মৃত্তিকা।

মৃত্তিকার উপাদান।—বালুকা ও কর্দ্দমের সমবায়ে মৃত্তিকা গঠিত হয়। মৃত্তিকার উপরিভাগ, অর্থাৎ যে ভাগ কর্ষণ দ্বারা সর্ব্বদাই আলোড়িত হয়, উহার নিম্ন স্তর হইতে কিছু ভিন্ন হইয়া থাকে। ফসল জন্মাইবার কারণ উপরের স্তরটীতে অধিক জৈবিক পদার্থ থাকে। মৃত্তিকার উপরিভাগ অপেক্ষা উহার নিম্ন স্তর যদি অধিক বালুকাময় হয় তাহা হইলে জল ও বায়ু সহজে শিকড়ে প্রবেশ করিয়া ফসলকে সতেজে রাখে। সুবিধা পাইলে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার স্তরযুক্ত ভূমি কৃষিকার্য্যের জন্য নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। মৃত্তিকার উপরের স্তর নিতান্ত কর্দ্দমময় হওয়াও ভাল নহে, দোআঁশ হওয়াই ভাল। নিতান্ত কর্দ্দমময় বা আঁঠিয়াল হইলে মাটি সহজে কর্ষণ করা যায় না; ইহার মধ্যে সহজে জলও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না; ইহা শুকাইয়া ফাটিয়া গিয়া শিকড় সকল ছিন্ন ও বিদীর্ণ করে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নিতান্ত কর্দ্দমময় মৃত্তিকা দো-আঁশ মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক সারবান বলিয়া প্রতিপন্ন

হইলেও, সাধারণ কৃষিকার্য্যের জন্য দো-আঁশ মাটি পছন্দ করাই ভাল। মৃত্তিকার যে কয়েকটী রাসায়নিক পদার্থ কৃষিকার্য্যের বিশেষ সহায়কারী তাহাদিগের প্রাধান্য অনুসারে নাম—

বালুকা (সিলিকা)
কর্দ্দম-সার (এলুমিনিয়ম্)
যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন)
ফস্‌ফরাস্
পটাশ্
চূণ
ম্যাগ্‌নিশিয়া
লৌহ

এতদ্ব্যতীত গন্ধক, ম্যাঙ্গেনিজ্ প্রভৃতি আরও কয়েকটী পদার্থের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ হইয়াছে। বালুকা ও কর্দ্দমের সহিত আর কয়েকটী উপাদান বিদ্যমান থাকে বলিয়া মৃত্তিকাতে ফসল জন্মিয়া থাকে। বিশুদ্ধ স্ফটিকের চূর্ণে অথবা বিশুদ্ধ চীনামাটি চূর্ণে, গাছ জন্মিতে পারে না। রাসায়নিকভাবে দেখিতে গেলে বিশুদ্ধ স্ফটিক-চূর্ণই বালুকা এবং বিশুদ্ধ চীনামাটি চূর্ণই কর্দ্দম। কিন্তু সাধারণতঃ বালুকা বা কর্দ্দম এরূপ বিশুদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যে বালি কিছু লালবর্ণের তাহাতে নিশ্চয় সামান্য পরিমাণ লৌহ আছে; যে মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও পিচ্ছিল, উহাতে পটাশ্ ও জৈবিক পদার্থ নিশ্চয়ই মিশ্রিত আছে। জৈবিক পদার্থের মধ্যে যবক্ষারজান, ফস্‌ফরাস্ ও চূণ কিছু না কিছু পরিমাণে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। জৈবিক পদার্থ ভিন্ন আপেটাইট্ আদি কয়েকটী প্রস্তরময় পদার্থেও ফস্‌ফরাস্ আছে। মৃত্তিকার মধ্যে এই সকল

পদার্থ সামান্য পরিমাণে নিহিত থাকে। জিওলাইট্ প্রভৃতি প্রস্তরময় পদার্থে চূণ ও পটাশ্ থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে এ সকল পদার্থেরও কণা বর্ত্তমান আছে। জৈবিক পদার্থের মধ্যে উদ্ভিদের পোষণকারী সকল উপাদানগুলিই নিহিত আছে; একারণ জৈবিক, অর্থাৎ উদ্ভিদও প্রাণীঘটিত, সারকে, সাধারণ-সার কহে। উদ্ভিদের মধ্যে প্রধানতঃ যবক্ষারজান ও পটাশ্-সার আছে; অস্থির মধ্যে প্রধানতঃ ফস্ফরাস্ ও চূণ-সার আছে, মাংসের মধ্যে সকলগুলিই বিশিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে; মলমূত্রের মধ্যেও ঐরূপ। সাররূপে মৃত্তিকার সহিত এই সমস্ত পদার্থ মিশ্রিত করিলে মৃত্তিকা কৃষিকার্য্যের অধিক উপযোগী হইয়া থাকে।

বালুকা ও কর্দ্দমের উপকারিতা।—বালুকা ও কর্দ্দম কেবল ফসলের খাদ্য সমুদায়ের আধার, ও উদ্ভিদের ভিত্তি-স্থল মাত্র। কর্দ্দম শিকড়গুলি দৃঢ়রূপে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকিবার সহায়তা করে,—কেবল বালুকা-মধ্যে গাছ জন্মিলে গাছ সহজে উৎপাটিত হইতে পারে। কর্দ্দম বালুকা অপেক্ষা অধিক জল সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে,—বালুকাময় জমি হইতে জল সহজে নির্গত হইয়া যায়, এবং শীঘ্র শুকাইয়া যায়। এই সকল কারণে বালুকার সহিত কর্দ্দম মিশ্রিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কর্দ্দম ও বালুকার তারতম্যানুসারে উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থের তারতম্য ঘটে না। তবে সহজে কর্ষণ করিবার উপযোগী জমিতে ৮০।৮৫ ভাগ বালুকার সহিত ৫।৬ ভাগ কর্দ্দম-সার বা এলুমিনা মিশ্রিত থাকিলেই যথেষ্ট দৃঢ়তা গুণ জন্মে।

মৃত্তিকার উদ্ভিদ্পোষণোপযোগী অংশ।—মৃত্তিকার মধ্যে উপাদানগুলি কিয়ৎ পরিমাণে গলিত ভাবে অথবা গলনশীল

ভাবে বর্ত্তমান থাকে। বায়ু (বিশেষতঃ অম্লজান গ্যাস ও দ্ব্যম্লঙ্গারক বায়ু, অর্থাৎ প্রশ্বাস বায়ু), জল, প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থ মৃত্তিকার উপাদানগুলি ন্যূনাধিক পরিমাণে গলনশীল অবস্থায় পরিণত করে। এই গলনশীল অবস্থাগত পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল অবস্থাতে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়, এবং এই খাদ্যই শিকড় দ্বারা উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া উদ্ভিদের সকল অঙ্গ পোষণ করে। পত্র ও নবপল্লব দ্বারাও উদ্ভিদ বায়ু হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই খাদ্য দ্ব্যম্লঙ্গারক বায়ু, অর্থাৎ, প্রশ্বাসের সহিত আমরা প্রধানতঃ যে বায়ু শরীরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়া থাকি সেই বায়ু। শিকড় দ্বারা জলের সহ-যোগে মৃত্তিকা হইতে যে গলিত পদার্থ পত্র পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে, উহার সহিত দ্ব্যম্লঙ্গারক বায়ুর অঙ্গার ভাগটী বিশ্লেষিত ও মিলিত হইয়া বৃক্ষ লতাদির পোষণোপযোগী নানা পদার্থ গঠিত করে। মৃত্তিকার অতি সামান্য অংশই (অর্থাৎ সাধারণতঃ শতকরা ·২ হইতে ·৫ ভাগ) গলিত অথবা গলনশীলভাবে বিদ্যমান থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে গলনশীল পদার্থের অভাব হইলে উদ্ভিদ পর্য্যাপ্ত আহারাভাবে মরিয়া যায়। আবার মৃত্তিকা, মধ্যে গলনশীল অবস্থায় অধিক পরিমাণে খাদ্য থাকিলেও উদ্ভিদ্ সকল অত্যধিক আহার পাইয়া মরিয়া যায়। এক সহস্র ভাগ জলে উদ্ভিদের আহারীয় একভাগ কঠিন পদার্থ গলিত অবস্থায় থাকিলে উদ্ভিদ সকল এই আহারীয় পদার্থ সুচারুরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তম বাড়িয়া থাকে। এক সহস্র ভাগ জলের সহিত যদি ৫।৬ বা ততোধিক ভাগ কঠিন পদার্থ গলিত অবস্থায় থাকে তাহা হইলে উদ্ভিদ্ সকল ঐ রস গ্রহণ করিয়া মরিয়া যায়। উষর এবং লোণা-মাটিতে গলিত অবস্থায়

সোডা ও লবণ বা অন্যান্য গলনশীল পদার্থ অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকাতে, উহাতে ফসল জন্মে না। এইরূপ মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া উহাতে নালা কাটিয়া দিলে উহাতে বৃষ্টি পড়িয়া নালা বহিয়া গলিত পদার্থ বাহির হইয়া গিয়া ক্রমশঃ উহা উর্ব্বর হইয়া থাকে। বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উষর ভূমি আছে এবং সুন্দরবন প্রভৃতি সমুদ্র কূলবর্ত্তী স্থানে লোণা-মাটি আছে। মৃত্তিকার সহিত সোরা, মূত্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সার ব্যবহার করাতে কখন কখন গাছ জ্বলিয়া বা মরিয়া যায় দেখা যায়। একশত ভাগ মূত্রের মধ্যে দুইভাগ ইউরিয়া নামক কঠিন গলনশীল উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। শুষ্ক মৃত্তিকায় মূত্র সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে ২০ গুণ জলের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাতে ১০০০ জল ভাগের সহিত একভাগ গলিত আহারীয় পদার্থ প্রয়োগ করা হইবে। মৃত্তিকার উপরে যদি জল দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে প্রয়োগের পূর্ব্বে জলের সহিত মূত্র বা সোরা মিশ্রিত করিয়া লইয়া প্রয়োগ করিবার কোন আবশ্যক থাকে না।

উর্ব্বর মৃত্তিকা।—শুষ্ক মৃত্তিকা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যদি উহাতে শতকরা ·১ হইতে ·৫ ভাগ মাত্র যবক্ষারজান, ·০৮ হইতে ·৫ ভাগ মাত্র ফস্‌ফরসাম্ল, এবং এক এক ভাগ পটাশ্ ও চুন বিদ্যমান আছে দেখা যায়, তাহা হইলে উহা উর্ব্বর মৃত্তিকা বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। যদি শত করা ·১ ভাগ অপেক্ষাও কম যবক্ষার জান, ·০৮ ভাগ অপেক্ষাও কম ফস্‌ফরাসাম্ল এবং ১ ভাগ অপেক্ষাও কম চুন বা পটাশ থাকে, তাহা হইলে জমিতে সার দিয়া জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করা প্রথমাবধিই আবশ্যক

হইবে। গলিত অবস্থায় শতকরা ·০১ ভাগ অপেক্ষা কম ফস্‌ফরাসাম্ল বা পটাশ্‌ থাকিলে জমি নিস্তেজ বলিয়া মনে করা উচিত।

লৌহের উপকারিতা।—মৃত্তিকার সহিত কিছু লৌহ থাকিলে উহা মৃত্তিকার উর্ব্বরতার সহায়তা করে। শতকরা ৫।৬ ভাগ লৌহ থাকিলেই যথেষ্ট হয়। শতকরা ২০ ভাগের অধিক লৌহ থাকিলে জমি কর্ষন করিবার অনুপয়োগী হইয়া থাকে। তবে শতকরা ১ বা ২ ভাগ লৌহ থাকিলে যে জমি নিস্তেজ এরূপ মনে করা উচিত নহে; কিন্তু শতকরা ৫।৬ ভাগ অথবা ততোধিকভাগ লৌহ থাকাতে জমিতে অম্লজান বায়ু সঞ্চিত হইবার সুবিধা হয়। অম্লজান বায়ুর সঞ্চয় দ্বারা জমির ও উদ্ভি'দের নানা উপকার সাধিত হয়, এ কারণ লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা, অর্থাৎ যে মৃত্তিকায় লৌহের ভাগ অধিক থাকে ঐ রূপ মৃত্তিকা, কৃষি কার্য্যের বিশেষ উপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য করা উচিত।

মৃত্তিকা-পরীক্ষা।—এক ছটাক মৃত্তিকা লইয়া একটী খলে উত্তম করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গুলিয়া, প্রলেপের ন্যায় করিয়া ফেল। ইহাতে লিট্‌মস্‌ কাগজ স্পর্শ করিয়া যদি দেখা যায় কাগজের নীলবর্ণ লাল হইয়া গেল, তাহা হইলে জানিতে হইবে মৃত্তিকাটী অম্ল-দোষ-ঘটিত। মৃত্তিকার এই দোষটী খণ্ডাইবার জন্য উহাতে নালা কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হয়, এবং উহাতে চূণ ছিটাইতে হয়। অম্ল-দোষ-ঘটিত মৃত্তিকাতে কোন ফসলই ভাল জন্মে না। প্রলেপাকারের মৃত্তিকাটী একটী লম্বা চোঙ্গার ন্যায় বোতলের মধ্যে জলে ধৌত করিয়া সমস্তটী ঢালিয়া দিয়া বোতলটী প্রায় জলে পূর্ণ কর। পরে উত্তমরূপে বোতলটী নাড়িয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে রাখিয়া দিয়া বোতলের উপরের জল

ভাগটী অন্য পাত্রে ঢালিয়া বালুকার ন্যায় ভাগটী বোতলে রাখিয়া দাও। পরে বোতল পুনরায় জলে পূর্ণ করিয়া নাড়িয়া, স্থির ভাবে ক্ষণকাল রাখিয়া উহার উপরিস্থ জল ভাগটী পূর্ব্বোক্ত পাত্রে ঢালিয়া, আবার বোতলের নিম্নস্থিত বালুকা মিশ্রিত জলের উপর পরিস্কার জল দিয়া বোতলটী ভরিয়া দাও, এবং পূর্ব্বের ন্যায় নাড়িয়া স্থির রাখিয়া, পূর্ব্বোক্ত পাত্রে তৃতীয়বার উপরিস্থ জল ভাগটী ঢালিয়া লইয়া বালুকা মিশ্রিত নিম্নের জলটী বোতলে রাখিয়া দাও। ঢালা ঢালি করিতে পাছে জল পড়িয়া যায় এ কারণ বোতলের মুখের বহির্ভাগে একটু মোম্ মাখাইয়া, উপরিস্থ জল ভাগটী একটী কাঠি বাহিয়া যাহাতে পড়ে এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। তৃতীয়বার ধৌত করিবার পরে বোতলে যে বালুকাময় পদার্থটী পড়িয়া থাকিল উহা শুকাইয়া লইয়া ওজন করিয়া দেখিতে হইবে জলের সহিত মৃত্তিকার কত পরিমাণ গলনশীল ও সূক্ষ্মভাগ বাহির হইয়া গিয়াছে। যদি ওজন করিয়া ৪ তোলা হয় তাহা হইলে মৃত্তিকাতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ কর্দ্দম ও ৪ ভাগ বালুকা ছিল স্থির করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ পরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ বালুকার (অর্থাৎ স্ফটিক চূর্ণের) পরিমাণ স্থির হয় না, এবং যে কর্দ্দম ভাগ বাহির হইয়া গেল উহাও বিশুদ্ধ এলুমিনা নহে। কৃষিকার্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে মৃত্তিকার গুণাগুণ স্থির করিতে বালুকার পরিমান জানিবার জন্য এই রূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলেই চলিবে। এই রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা যদি এক ছটাক শুষ্ক মৃত্তিকায় ৪ তোলা বালুকা ভাগ পাওয়া যায় তাহা হইলে মৃত্তিকাটী দো-আঁশ ও হাল্কা এবং কৃষি-কার্য্যের উপযোগী বলিয়া স্থির করা উচিত, অর্থাৎ এরূপ মৃত্তিকার ৮০ ভাগ আন্দাজ বালুকা আছে এই রূপ মনে করা উচিত। অবশিষ্ট ২০ ভাগ

কর্দ্দম, অর্থাৎ জৈবিক পদার্থ মিশ্রিত সূক্ষ্ম ধাতুময় পদার্থ। ইহারই মধ্যে প্রধানতঃ যবক্ষারজান, ফস্‌ফরাস্, পটাশ্, চূণ, ম্যাগ্‌নিশিয়া, ও লৌহ, এলুমিনা ও সোডার সহিত যৌগিক অবস্থায় নিহিত থাকে।

জৌবিক পদার্থ।—যে মৃত্তিকাতে যত অধিক জৈবিক পদার্থ থাকে সেই মৃত্তিকা তত অধিক উর্ব্বরা। গাছের পত্রাদি ও জীব-জন্তুর শরীর পচিয়া গলিত ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে পরিণত ও মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকাকে অধিক সারবান করে। এই গলিত সূক্ষ্ম পদার্থকে জৈবিক পদার্থ কহে। জৈবিক পদার্থও মোটামুটী এক রকম নিরূপিত হইতে পারে। শুষ্ক মৃত্তিকাকে ফাঁকি করিয়া চূর্ণ করিয়া ঠিক্ ১০০ গ্রেন্ ওজন করিয়া লইয়া, একটী প্লাটিনাম্ ধাতু নির্ম্মিত মুচিতে রাখিয়া, অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া প্লাটিনাম্ শলাকা দ্বারা আলোড়ন করিতে করিতে উত্তপ্ত করিয়া, পরে শুষ্ক আধারের মধ্যে মুচিটী রাখিয়া, ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহা ওজন করিয়া দেখা যাইবে ১০০ গ্রেন মৃত্তিকা চূর্ণ আর ১০০ গ্রেন নাই, কিছু কমিয়া গিয়াছে। উত্তাপ দ্বারা বালুকা, এলুমিনা, চূণ, ম্যাগ্‌নিশিয়া, ফস্‌ফরাস্, পটাশ্, সোডা, প্রভৃতি উপাদান কমিয়া যায় না, কেবল জৈবিক পদার্থ ও যাহা কিছু জলভাগ শুষ্ক মৃত্তিকায় অবশিষ্ট ছিল তাহাই উড়িয়া যায়। ১০০ গ্রেন শুষ্ক মৃত্তিকা উত্তপ্ত করিয়া লইয়া যদি পরে ৯২ গ্রেনে দাঁড়ায় তাহা হইলে মোটামুটী বলা যাইতে পারে মৃত্তিকাটীতে শতকরা ৮ ভাগ জৈবিক পদার্থ ছিল।

চূণ।—মৃত্তিকাতে শতকরা অন্ততঃ এক ভাগ চূণ থাকা বাঞ্ছনীয়, এ কারণ চূণের পরিমাণও স্থির করিয়া লইয়া কৃষি-কার্য্যের উপযোগী মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ৪৮০ গ্রেন অর্থাৎ এক আউন্স

শুষ্ক মৃত্তিকা চূর্ণ ওজন করিয়া লইয়া, একটী বোতলের মধ্যে ভরিয়া উহাতে ছয় আউন্স্ জল দিয়া, পরে ধীরে ধীরে ১৫০ গ্রেন আন্দাজ হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ ঢাল, এবং বোতলটী বদ্ধাবস্থায় এক দিবস রাখিয়া দাও। যদি হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ পাত করিবার সময় ঝাঁ-ঝাঁ-শব্দ হইতেছে এই রূপ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলে মৃত্তিকাতে চূণের ভাগ বিশিষ্ট পরিমাণে আছে এই রূপ অনুমান করিতে হইবে। এক দিবস কাল বোতলের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশ্রিত মৃত্তিকা থাকিবার পরে, উহা ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া, ব্লটিং কাগজের উপর ভাল জল পাত করিয়া মৃত্তিকা স্থিত গলিত পদার্থ আরও ভাল রূপে ধৌত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, ছাঁকা জলটী সমস্ত গ্লাশে একত্রিত করিয়া উহার মধ্যে কাচের শলাকার দ্বারা আলোড়ন সহকারে আমোনিয়া পাতিত করিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ছাঁকা জলে আমোনিয়ার গন্ধ হইয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমোনিয়া পাত করিতে হয়। এই সময় প্রায় দেখা যায় ইটের রংএর গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ ছাঁকা জলের মধ্যে উদ্ভূত হইতেছে। ইহা মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সম্বন্ধে একটী নিদর্শন, কেন না ইহা ফস্‌ফরাস্ ও লৌহ যে দ্রব অবস্থায় কর্দ্দমসারের সহিত মিলিত হইয়া আছে তাহারই লক্ষণ। এই গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ হইতে বোতল স্থিত জলকে পৃথক্ করিবার জন্য পুনরায় ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকা, ও ধৌত করিয়া ভাল করিয়া ছাঁকা আবশ্যক। পরে এই ছাঁকা জলের মধ্যে অক্সালিক্ এসিড্ জলে মিশ্রিত করিয়া পাতিত করা আবশ্যক। পরিষ্কার ছাঁকা জল এই এসিড্ পাত দ্বারা অপরিষ্কার হইতে থাকিবে। যতক্ষণ এইরূপ অপরিষ্কার অবস্থা ঘটিতে থাকিবে ততক্ষণ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া এসিডের জল পাত করিয়া যাইতে হইবে। এই

সময়ে আমোনিয়ার গন্ধ জলের মধ্যে এখনও আছে কি না ইহা দেখা আবশ্যক; যদি না থাকে, তবে আরও কয়েক ফোঁটা আমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া অক্‌সালিক্ এসিড্ পাতিত করিতে হইবে। পরে যে গ্লাশে এই এসিড্ মিশ্রিত ছাঁকা জল আছে উহা ঢাকিয়া রাখিয়া দেখিতে হইবে কি পরিমাণ অক্‌সালিক্-চুণ গ্লাশের নিম্নে জন্মিয়াছে। যদি চুণের পরিমাণ ওজন দ্বারা স্থির করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে পুনবায় জলটী ব্লটিং কাগজের দ্বারা ছাঁকিয়া ব্লটিং কাগজের উপরিস্থ অক্সালিক্-চুণ অগ্নির সমক্ষে রাখিয়া শুকাইয়া লইয়া পরে ওজন করিতে পারা যায়। অক্সালিক-চুণ হইতে খাঁটি চুণের পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায়।

দ্রব-পদার্থ।—মৃত্তিকার কত পরিমাণ দ্রব অবস্থায় আছে স্থির করিতে হইলে পরিষ্কার জলে ৪০০ গ্রেণ শুষ্ক মৃত্তিকাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া পরে ছাঁকা জল শুকাইয়া লইয়া ঐ জল হইতে যে কঠিন পদার্থের গুঁড়া বাহির হইবে উহা ওজন করিলেই, দ্রব অবস্থায় মৃত্তিকায় যে পরিমাণ পদার্থ ছিল তাহা স্থির করা যায়।

ফস্‌ফরাস্ ও পটাশের অংশ রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করা কিছু দুরূহ কার্য্য। শিক্ষিত কৃষক যে এ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিবে ইহা আশা করা যায় না। কৃষকদিগের এইটী স্থির করিয়া রাখা উচিত, যে স্থানের গাছে পত্রোদ্গম সহজে হয় এবং পত্র-পূর্ণ গাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায় সেখানকার মাটিতে পটাশের অভাব নাই। যে স্থানে নোড়, কুল, প্রভৃতি টক্‌ফল প্রচুর জন্মিয়া থাকে, সে স্থানের মাটিতে পটাশের অভাব নাই। যে স্থানে মানকচু, ওল, ইত্যাদি মূল স্বভাবতঃ বৃহদাকারের হইয়া থাকে সে স্থানের মাটিতে

পটাশের অভাব নাই। কার্য্যস্থলে এই তিনটী নিদর্শন স্মরণ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হয়। ফস্‌ফরাস্‌ সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবহারিক দুই একটী সঙ্কেত মনে রাখিলে চলে। যে স্থানে গাছের ফুল ও ফল হইবার প্রবৃত্তি অধিক দেখা যায়, সে স্থানের মৃত্তিকায় ফস্‌ফরাস্‌ অধিক আছে। কোন কোন স্থানে গোলাপ-ফুল প্রচুর ও বৃহদাকারের হইয়া থাকে; করবীর গাছে কেবল ফুল নহে ফল পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে, এরূপ স্থানের মৃত্তিকায় যে ফস্‌ফরাসের অভাব নাই ইহা স্থির-নিশ্চয়। যে স্থানের ফল ও শাক-সব্‌জী ইত্যাদি খাইতে পানশে না লাগিয়া সুমিষ্ট লাগে, সে স্থানের মৃত্তিকাতেও প্রচুর ফস্‌ফরাস্‌ আছে স্থির করিতে হইবে। যে স্থানে আলু, ফুল-কপি, গাজর, বীট্‌, মটর-সুঁটি, ও সীম, উত্তম জন্মে, সে স্থানের মৃত্তিকাতেও ফস্‌ফরাসের অভাব নাই।

মৃত্তিকার অভাব স্থির করণ।—কোন্‌ মৃত্তিকাতে কোন্‌ উপাদানের অভাব আছে ইহা স্থির করিবার জন্য একটী পরীক্ষাও প্রচলিত হইতে পারে। যে মাঠে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক ঐ মাঠের দশটী পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে পরীক্ষার চৌকা প্রস্তুত করিয়া লইয়া, দুই দুইটী চৌকায় এক এক জাতীয় সার প্রয়োগ করিয়া, দুইটী চৌকা বিনা-সারে রাখিয়া দিয়া প্রত্যেক চৌকায় বিশটী গমের গাছ, বিশটী আলুর গাছ, বিশটী মটর-সুঁটির গাছ, ও বিশটী গাজর গাছ, একই প্রকার বীজ হইতে একই রকমে দশটী চৌকার পাইট করিয়া, ফল দেখিতে হয়। যদি দেখা যায় সোরা-সার প্রযোগ দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যে দুইটী চৌকায় সোরাসার পর্য্যাপ্ত জলের সহিত মিলাইয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই দুইটী

চৌকায় ফসল গুলি ভাল জন্মিয়াছে, তাহা হইলে এই স্থির করিতে হইবে, জমিতে চূণও পর্য্যাপ্ত আছে, ফস্‌ফরাস্‌ ও পর্য্যাপ্ত আছে, কেবল যবক্ষারজানের অভাব। যদি দেখা যায়, দ্রবীভূত অস্থি-সার (বোন্‌-সুপার) দ্বারা, অর্থাৎ সাল্‌ফিউরিক এসিডের-সাহায্যে গলিত অস্থি-চূর্ণ সার প্রয়োগ দ্বারা, দুইটী চৌকাতে উত্তম ফল হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জমির প্রধান অভাব ফস্‌ফরাস্‌। যদি এই দুইটী চৌকার গাজর চাকিয়া অধিক সুমিষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে ফস্‌ফরাসের অভাব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। আলু ও মটর-সুঁটিরও যদি বিশেষ উন্নতি এই দুইটী চৌকাতে দেখা যায় তাহা হইলে সন্দেহ আরও মিটিয়া যায়। যদি চূণ-সার প্রয়োগ দ্বারা অধিক উপকার দর্শে, অর্থাৎ যে দুইটী চৌকায় চূণ-সার পড়িয়াছে সেই দুইটী চৌকার ফসল ভাল মনে হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকা বিশেষ উর্ব্বর কেবলমাত্র চূণের কিছু অভাব ইহাই স্থির করিতে হইবে। ইহার উপরে যদি দেখা যায়, যে যে দুইটী চৌকায় চূণ-সার পড়িয়াছে ঐ দুইটী চৌকায় মটর-সুঁটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জন্মিয়াছে তাহা হইলে সন্দেহ মিটিয়া যায়। ঘুঁটের ছাইমাত্র সার প্রয়োগ করিয়া যদি ফল ভাল পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে দুইটী চৌকাতে ঘুঁটের ছাই মাত্র সার প্রয়োগ করা হইয়াছে ঐ দুইটী চৌকায় ফসল যদি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখায় তাহা হইলে জমিতে কেবল পটাশের অভাব ইহাই স্থির কবিতে হইবে। ইহার উপর যদি দেখা যায় এই দুইটী চৌকার আলু ও মটর-সুঁটি বিনাসারের চৌকা দুইটীর অপেক্ষা ভাল জন্মিয়াছে, তাহা হইলে পটাশের অভাব সম্বন্ধে কিছুই সন্দেহ থাকে না। যদি দেখা যায় বিনাসারের চৌকা দুইটীতেও গাছগুলি যেমন জন্মিয়াছে অন্য আটটী চৌকাতেও ঠিক

ঐরূপ জন্মিয়াছে তাহা হইলে মৃত্তিকার কোনই অভাব নাই, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ও গলিত অবস্থায় উদ্ভিদের সকলগুলি আহারীয় উপাদান বর্ত্তমান আছে ইহাই স্থির করিতে হইবে।

প্রস্তরময় মৃত্তিকার উপযোগী ফসল।—যই, জুয়ার, ভুট্টা, গোঁদলী, লাইও, মাড়ুয়া, কোদো, বাজ্‌রা, বাঁশ, কোঙ্গা, খাম্‌আলু, চুব্‌ড়ি-আলু, শঠি, রেড়ি, সিমুল-আলু, তুঁত, লঙ্কা, টেঁপারি, গুড়-বেগুন, তামাক, রাঙ্গা ও সাদা আলু, শাঁক-আলু, কাঁকুড়ি, কাঁকুরোল্, চিচিঙ্গা, কুন্দ্রুকি, বর্ব্বটী, ঘোড়ামুগ, কুলত্থ-কলাই, অড়হর, নীল, সজ্‌না, ভৃঙ্গী, অড়হরিয়া সীম, পলাশ, আসন, মাখম-সীম, সয়-বীন্ নামক জাপানী সীম, সোর-গোঁজা, মেস্তা-পাট, কার্পাস, সিমুল, মেস্তা, ঢেঁড়শ, কুসুম, ফাপর বা রাজ-গীর, ভেলা, সাবুই-ঘাস, হরিতকী, কুইনাইনের গাছ, চা, কফি, তেজ-পাতা, ডেঙ্গোশাক, হিজ্‌লী-বাদাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি।

বালুকাময় জমির উপযোগী ফসল।—বাজ্‌রা, তিল, সোর-গোঁজা, কলাই, মুগ, যব, যই, সর্ষপ, ধইঞ্চা, চীনা-বাদাম, ফাপর, শন, চীনা, কাঙ্গনী, ফুটি, তরমুজ, খরমুজ, পটোল, শাঁক-আলু, কুলথ-কলাই, নীল, মেস্তাপাট, কুসুম, ভাদুই-ধান, ইত্যাদি।

দো-আঁশ জমির উপযোগী ফসল।—আলু, তামাক, রিহা, ধান, পাট, ইক্ষু, বিলাতী ও দেশী সব্‌জী, ভুট্টা, গম, যব, তিসি, যই, ছোলা, মটর, মুসুরি, খেঁসারি, মুগ, কলাই, জুয়ার, কার্পাস, মেস্তা, হলুদ, আদা, আমাদা, এরারুট, চীনাবাদাম, ফুটী, তুঁত, সিমুল-আলু, সাদা ও রাঙ্গা আলু, ওল, কচু, মান, চুব্‌ড়ি ও খাম্‌আলু, ইত্যাদি।

কর্দ্দমময় মৃত্তিকার উপযোগী ফসল।—আমনধান, গম, পাট, ইক্ষু, অড়হর, মাত্নরকাঠি তুঁত, ছোলা, মটর, সীম, মুগ, তিসি, বাঁধা-কপি, যই, ইত্যাদি।

ঘুঠিং, শামুক, বা চুণে-পাথর সঙ্কুল মৃত্তিকার উপযোগী ফসল।—ধান, অড়হর, গম, ছোলা, খেসারি, মুসুরি, যব, আলু, শাঁক-আলু, ভুট্টা, জুয়ার, বাজ্‌রা, যই, লুসার্ণ্‌, অড়হরিয়া সীম, কুলথ-কলাই, ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ পদার্থ ঘটিত মৃত্তিকা বা বোদ্‌-মাটির উপযুক্ত ফসল।—লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা, তিসি, সর্ষপ, যই, গম, যব, বেগুন, ঢেঁড়শ্‌, ইত্যাদি।

সমুদ্র কূল হইতে ৫০।৬০ ক্রোশের মধ্যে জন্মাইবার উপযোগী ফসল।—ধান, মূলা, বীট, বাঁধাকপি, হিজ্‌লী-বাদাম, খর্জ্জুর, সুপারি, নারিকেল, ইক্ষু, ধইঞ্চা, আলু, চীনাবাদাম, কার্পাস, কলা, লাউ, কুমড়া, যব, ইত্যাদি।

মৃত্তিকার অবস্থান ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপরও শস্যোৎপাদন নির্ভর করে। নিম্ন কর্দ্দমময় ভূমিই আমন-ধানের উপযোগী। মাত্নরকাঠি বা তুঁত নিম্ন ভূমিতে লাগাইলে চলিবে না। হিজ্‌লী-বাদাম সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রস্তরময় জমিতেই ভাল জন্মে, সমুদ্র হইতে শতাধিক ক্রোশ অন্তরে ইহা ভাল জন্মে না। তেজ-পাতার গাছ প্রস্তরময় ভূভাগে উত্তম জন্মাইতে পারা যায় বলিয়া যে মানভূম বা সিংভূমে ইহা ভাল জন্মিবে এরূপ কথা নাই। যে স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম সেস্থানে এ গাছ ভাল জন্মে না। কেবল মৃত্তিকার উপাদান দেখিয়া ফসল নির্ব্বাচন করা চলিতে পারে না।

বিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। দো-আঁশ ও কর্দ্দমময় মৃত্তিকাতে কি প্রভেদ?

২। কিরূপ মৃত্তিকা কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগী?

৩। মৃত্তিকার প্রধান প্রধান রাসায়নিক উপাদান গুলির নাম কর।

৪। মৃত্তিকার মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদান না থাকিলে ফসল জন্মিতে পারে না? বালুকা ও কর্দ্দমের আবশ্যকতা কি?

৫। মৃত্তিকার মধ্যে কোন্ পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকিলে উহা অধিক উর্ব্বর হয়?

৬। কিরূপ অবস্থায় ও কি পরিমাণে মৃত্তিকার উপাদান সকল উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্ভিদকে পোষণ করিয়া থাকে?

৭। পত্র ও নব-পল্লব দ্বারা উদ্ভিদ্ পোষণকারী কোন্ কোন্ পদার্থ কিরূপ পরিমাণে প্রবেশ করে?

৮। উষর ভূমি ও লোণা মাটিতে ফসল জন্মে না কেন? এই দুই প্রকার মৃত্তিকাতে ফসল জন্মাইতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য?

৯। কখন কখন অত্যধিক সার-প্রয়োগ দ্বারা গাছ জ্বলিয়া যায়, ইহার হেতু কি?

১০। জন্তুদিগের মূত্র ও সোরা সার-রূপে ব্যবহার করিতে হইলে কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়?

১১। উর্ব্বর মৃত্তিকায় কোন্ উপাদান কি পরিমাণে থাকা সম্ভব

১২। গলিত অবস্থায় উর্ব্বর মৃত্তিকায় কি পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান থাকা সম্ভব?

১৩। মৃত্তিকায় লৌহাংশ থাকাতে কি উপকার দর্শে?

১৪। মৃত্তিকা অম্লদোষ ঘটিত হইলে কি ক্ষতি হয়? এই দোষ মৃত্তিকার আছে কি না জানিবার উপায় কি? এই দোষ খণ্ডনের উপায় কি?

১৫। মৃত্তিকার মধ্যে কি পরিমাণ বালুকা ও কি পরিমাণ কর্দ্দম আছে ইহা কিরূপে স্থির করিতে হয়?

১৬। মৃত্তিকার মধ্যে কি পরিমাণ জৈবিক পদার্থ আছে ইহা মোটামুটি স্থির করিতে হইলে কি প্রকরণে মৃত্তিকার পরীক্ষা আবশ্যক?

১৭। মৃত্তিকাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চূণ আছে কি না ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে?

১৮। মৃত্তিকার কত অংশ গলিত অবস্থায় বিদ্যমান ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে?

১৯। মৃত্তিকার মধ্যে যথেষ্ট পটাশ্ ও ফস্ফরাস্ আছে কি না রাসায়নিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ইহা কিরূপে জানা যাইতে পারে?

২০। মৃত্তিকার মধ্যে কোন উপাদানের বিশেষ অভাব আছে ইহা স্থির করিতে হইলে একজন শিক্ষিত কৃষক কিরূপ পরীক্ষার অনুষ্ঠান করিতে পারেন?

২১। প্রস্তরময় মৃত্তিকার উপযোগী কতকগুলি ফসলের নাম কর।

২২। বালুকাময় জমির উপযোগী কতকগুলি ফসলের নাম কর।

২৩। দো-আঁশ মাটির উপযোগী কতকগুলি ফসলের নাম কর।

২৪। যে মাটিতে অত্যধিক চুণ আছে উহার উপযোগী কতকগুলি ফসলের নাম কর।

২৫। বোদ্-মাটিতে কোন্ কোন্ ফসল ভাল হয়?

২৬। সমুদ্রোপকূলে কোন্ কোন্ ফসল ভাল জন্মে?

২৭। কোন্ ভূভাগে কি ফসল জন্মান উচিত ইহা কি কেবল মৃত্তিকার উপাদান দেখিয়া স্থির করা যাইতে পারে? উদাহরণ দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দাও।

একবিংশ অধ্যায়

কৃষি-যন্ত্র।

পুনরুল্লেখ।—সভ্যতা ও কৃষিকার্য্যের অবস্থাভেদে নানা দেশে নানা প্রকার কৃষি-যন্ত্র প্রচলিত আছে। সহস্র সহস্র কৃষি-যন্ত্রের মধ্যে কোন্ গুলি এদেশের কৃষকগণের ব্যবহারোপযোগী ইহা স্থির করা অনেক পরীক্ষা এবং অনেক ব্যয়-সাপেক্ষ। গবর্ণমেণ্ট-স্থাপিত পরীক্ষা ক্ষেত্র গুলিতে কতকগুলিন যন্ত্র পরীক্ষা হইয়াছে এবং কয়েকটী এদেশের উপযোগী বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভুট্টা প্রধানতঃ আমেরিকারই ফসল, একারণ ভুট্টার দানা ছাড়ান আমেরিক যন্ত্র গুলির মধ্যে যে গুলি ক্ষুদ্র ও স্বল্প ব্যয়ে লভ্য এরূপ দুই একটী এদেশে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ৪৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ একটী

যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে জল-সেচনোপযোগী এবং এদেশে নির্ম্মাণ ও ব্যবহারোপযোগী কয়েকটী যন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে কীট ও ধসারোগ নষ্ট করিবার জন্য আরক, চূর্ণ, ইত্যাদি ছিটাইবার উপযোগী কয়েকটী যন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে-দ্বি-পক্ষ লাঙ্গলের বিষয় এবং ষোড়শ অধ্যায়ে মাখন প্রস্তুত করণার্থ যন্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক ব্যবহা-রোপযোগী যন্ত্র বর্ণনা করিতে আছে।

অপর প্রদেশীয় যন্ত্র।—বঙ্গদেশে ব্যবহার নাই অথচ ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রদেশে ব্যবহার আছে এমন কতকগুলি যন্ত্র বঙ্গদেশে ব্যবহারে আনিতে পারিলে সুবিধা আছে। বঙ্গদেশের যোয়াল প্রায় একখণ্ড কাষ্ঠের হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বলদের ঘাড়ে প্রায় ঘা হইয়া যায়। অন্যান্য প্রদেশের যোক্ত্রতে বক্ষ-স্পর্শী অপর একখণ্ড কাষ্ঠ থাকাতে বলদগুলি ককুৎ ও বক্ষ উভয়ের সাহায্যে লাঙ্গল, শকট, ইত্যাদি টানিয়া থাকে; ইহাতে অঙ্গের বিশেষ একটী স্থানে বল কম লাগাতে ঘা হইতে পারে না।
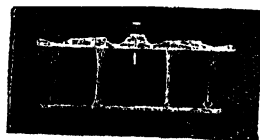
৩৬ চিত্র। বক্ষস্পর্শী যোক্ত্র।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে বার বার লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র জমির দীর্ঘে ও প্রস্থে একবার করিয়া লাঙ্গল চালাইয়া পরে বাখার ব্যবহার দ্বারা জমি প্রস্তুত করার নিয়ম আছে। বাখারের ফাল

প্রায় দুই ফুট্ প্রস্থ জমি এককালীন কর্ষিত করিয়া চলে; লাঙ্গল দ্বারা ৫।৬ ইঞ্চি মাত্র জমি আলোড়িত হয়। লাঙ্গল দ্বারা সমস্ত দিবসে যদি এক বিঘা জমি কর্ষিত করা যায়, বাখার ব্যবহার দ্বারা ৪ বিঘা জমি কর্ষিত হইতে পারে। একবার লাঙ্গল-মৈ দিয়া জমি নরম করিয়া লইলে পরে বাখার সহজেই চলিতে পারে। অকর্ষিত ভূমি নিতান্ত বালুকাময় হইলেই উহাতে প্রথমাবধি বাখার চালান যাইতে পারে, নতুবা কর্ষিত ভূমি পুনঃকর্ষণার্থই বাখার ব্যবহার করা উচিত। বাখার দ্বারা ২।৩ ইঞ্চি মাত্র গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা কর্ষিত ভূমির জঙ্গল নষ্ট এবং মৃত্তিকার কিছু আলোড়ন হইয়া থাকে। বাখার ব্যবহারের বিশেষ উপকার জমি সমতল করিয়া লওয়াতে অনুভূত হইয়া থাকে। বাখার ব্যবহারের পরে বীজবপন যন্ত্র দ্বারা বীজবপন করিলে সকল বীজ সমান ভাবে জমির মধ্যে উপ্ত হইয়া থাকে।
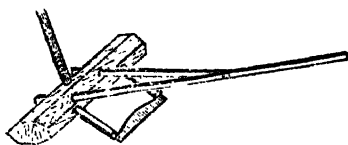
৩৭চিত্র। বাখার।

নিম্ন বঙ্গদেশে জমি প্রস্তুত করিবার জন্য কেবল লাঙ্গল ও মৈ-ব্যবহার হইয়া থাকে। "যো" বুঝিয়া চাষ করিতে পারিলে লাঙ্গল ও মৈ দ্বারাই জমি প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু বৃষ্টির পরে সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে মৃত্তিকা কঠিন হইয়া গিয়া ঢেলা বাঁধিয়া যায়, এমন অবস্থায় মৈ দ্বারা বীজবপনোপযোগী জমি প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। বিলাতে রোলার বা রুল টানিয়া জমির ঢেলা

ভাঙ্গা হয়। এদেশেও কাষ্ঠের গুঁড়ি দ্বারা রোলার প্রস্তুত করিয়া লইয়া কৃষিকার্য্যে ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু কড়ি কাষ্ঠের ন্যায় বৃহৎ কাষ্ঠের ব্যবহার কোন কোন প্রদেশে হইয়া থাকে। এই কাষ্ঠের এক পার্শ্বে সারি সারি চারিটী হুক্ থাকে। এই হুক্ চারিটী দ্বারা চারিটী বলদ যুতিয়া কাষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া বলদ চালাইয়া কৃষক আপনার জমি "যো" চলিয়া গেলেও প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে।

বীজ-বপন যন্ত্র নিম্ন বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। বিহারাঞ্চলে, যুক্ত প্রদেশে, দাক্ষিণাত্যে, এবং ভারতবর্ষের প্রায় অন্য সর্ব্বত্রেই কোন না কোন প্রকার যন্ত্র দ্বারা বীজ সরল রেখায় উপ্ত হইয়া থাকে। লাঙ্গলের মুড়ার মধ্যে ফালের ঠিক্ পশ্চাতে একটী ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের মধ্যে একটী বাঁশের চোঙ্গা প্রবেশ করিয়া দিয়া, চোঙ্গার উপর একটী কাষ্ঠের ঠোঙ্গা বসাইয়া, ঐ ঠোঙ্গার মধ্যে দক্ষিণ হস্তে কৃষক বীজ খাওরাইতে খাওরাইতে লাঙ্গল বামহস্তে বাহিয়া চলিয়া যায়। ইহার পরে মৈ বা কড়ি কাষ্ঠ চালাইয়া জমি জমাট্ করিয়া দিতে হয়। কৃষকের কোঁচড়ে বীজ থাকে এবং মুঠায় করিয়া বীজ লইয়া কৃষক ঠোঙ্গার মধ্যে দুই চারিটী করিয়া পাতিত করিতে করিতে লাঙ্গল বাহিয়া বীজ বপন করিয়া থাকে। বীজ এইরূপে উপ্ত হইলে গাছগুলি ঠিক্ লাইন ধরিয়া বাহির হয়। ইহা দ্বারা ভবিষ্যৎ নিড়ান কার্য্যের বিশেষ সুবিধা ঘটে। গাছ বাহির হইলে একবার খুর্পি বা দাউলি ব্যবহার দ্বারা আগাছা উৎপাটন ও অতিরিক্ত গাছের উৎপাটন আবশ্যক। পরে আর খুর্পি বা দাউলি ব্যবহার না করিয়া "হো" ব্যবহার চলিতে পারে। হো ব্যবহার দ্বারা জমি মধ্যে মধ্যে উস্কাইয়া দেওয়াতে জমির ও ফসলের যে বিশেষ উপকার দর্শে

উনবিংশ অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে। বীজ ছিটাইয়া বুনিলে হো-ব্যবহার চলিতে পারে না। লাইন ধরিয়া বীজ বপন প্রথা এদেশে প্রচলিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই প্রথা অবলম্বনের পক্ষে একটী প্রধান বাধা এই, বলদ যদি সোজা হইয়া না চলিয়া হেলিয়া দুলিয়া বক্রভাবে চলে, তাহা হইলে বীজ বপন যন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা বিশেষ কিছুই উপকার হয় না। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে লাঙ্গলের বলদ ঠিক্ সোজা হইয়া চলে। বঙ্গ-
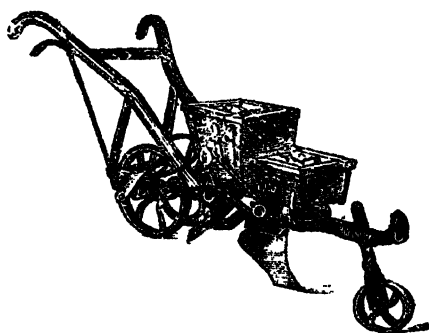
৩৮ চিত্র। আমেরিকার বীজ-বপন-যন্ত্র।

দেশেও বলদকে সোজা হাঁটিতে শিখান যাইতে পারে। একটী চোঙ্গার পরিবর্ত্তে মান্দ্রাজ প্রদেশে এককালীন তিনটী বা ছয়টী চোঙ্গা ব্যবহার দ্বারা এক সঙ্গে তিন বা ছয় লাইন বীজ বপন করিবার কয়েক প্রকার বিশেষ যন্ত্র আছে। এ সকল যন্ত্রও ব্যবহারে আনিতে গেলে শিক্ষিত বলদের আবশ্যক। আমেরিকায় কয়েক প্রকার হাতে চালান চক্রযুক্ত বীজ-বপন যন্ত্রের ব্যবহার আছে। এই সকল যন্ত্র ৩০৲।৪০৲ টাকা খরচ করিয়া এদেশে আমদানি করা যাইতে পারে। এই যন্ত্র ব্যবহার করিলে শিক্ষিত বলদের আবশ্যক

করে না। জমি সমতল করিবার জন্য এবং জমিতে ভিলি বাঁধিবার জন্য নিম্ন-বঙ্গে কোন বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার নাই। পর্ব্বতময় স্থানে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই সকল কার্য্যের জন্য পাট্টা বা তক্তার ব্যবহার আছে। কর্ষিত ভূমি উচ্চস্থান হইতে নিম্ন স্থানে মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিবার জন্য কোদাল ও ঝুড়ি ব্যবহার না করিয়া এইরূপ তক্তা ব্যবহার দ্বারা সত্বর কায হয়। তক্তার দুই প্রান্তে কড়া লাগান থাকে, পশ্চাতে চাপিয়া ধরিবার জন্য একটী হাতল থাকে, এবং সম্মুখে বলদ বা মহিষ যোতা হয়। পয়ঃ-প্রণালী, আইল ও ভিলি বাঁধিবার জন্য উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যে ছোট পাট্টার ব্যবহার আছে উহার সম্মুখে বলদ বা মহিষ ব্যবহার হয় না। দুইজন বালকে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। এক জন হাতল চাপিয়া কর্ষিত ভূমি ঠেলিয়া দেয় আর একজন পাট্টার দুই প্রান্তে সংযুক্ত দড়ি ধরিয়া নিজের দিকে মাটি সরাইয়া আনে। এইরূপে সহজে লাইন ধরিয়া মৃত্তিকার স্তূপ করিতে করিতে দুইজন বালক চলিতে থাকে। হেঁট হইয়া কোদালি দ্বারা কার্য্য করাতে এরূপ সত্বর কায হয় না।

হো।—লাইন ধরিয়া বীজবপন করিলে, হাতে বা বলদ দ্বারা চালাইবার উপযুক্ত মাটি উস্কাইবার কয়েক প্রকার দেশী বা বিলাতী যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফসল জন্মিবার সময় মধ্যে মধ্যে মাটি উস্কাইতে পারিলে ফসল বিশেষ তেজঃ করিয়া উঠে। নিড়ানী ও খুর্পি দ্বারা মাটি উস্কানতে ব্যয় অনেক পড়িয়া যায়। এক একার জমি খুর্পি দ্বারা মাটি উস্কাইতে প্রায় ২৫ জন লোক লাগে। দাঁড়াইয়া চালাইবার উপযুক্ত কোন হো এদেশে ব্যবহার নাই। দাঁড়াইয়া চালাইবার উপযুক্ত প্ল্যানেট্ জুনিয়ার হো দ্বারা একব্যক্তি

প্রত্যহ একবিঘা জমি অর্থাৎ তিন দিবসে এক একার জমি উস্কাইতে পারে। এই হো বা চক্র-নিড়ানীর নিড়ানী ভাগ খুলিয়া লইয়া লাঙ্গল,
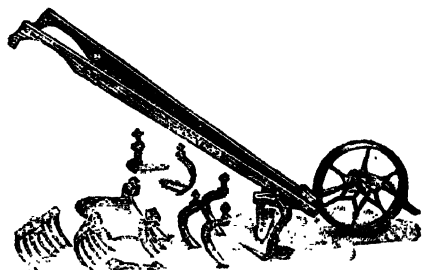
৩৯ চিত্র। প্ল্যানেট্ জুনিয়ার হো ও অন্যান্য প্রকার যন্ত্রের অংশ।

বিদে, ইত্যাদি অন্যান্য যন্ত্রও পরাইয়া দেওয়া চলে। দক্ষিণ ভারতবর্ষে বলদ বা মহিষের সাহায্যে চালাইবার উপযুক্ত কয়েক প্রকার মাটি উস্কান যন্ত্রের ব্যবহার আছে। ধান, পাট, গম, ইত্যাদি ফসল যাহা অর্দ্ধহাত বা একফুট অন্তর লাইন দিয়া লাগান যায়, উহাদের নিম্নস্থ মৃত্তিকা উস্কাইবার জন্য দাউড়া-যন্ত্রের ব্যবহার আছে। কার্পাস,
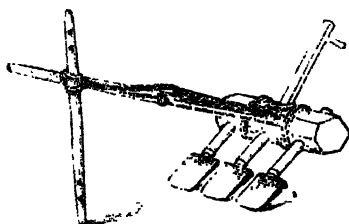
৪০ চিত্র। দাউড়া।

অড়হর, ইত্যাদি যে সকল ফসল দুই বা আড়াই ফুট অন্তর লাগান হয়, উহাদের মধ্যস্থ মৃত্তিকা উস্কাইবার জন্য একটী বলদ দ্বারা চালিত

ডুগিয়া যন্ত্রের ব্যবহার আছে। ডুগিয়া যন্ত্র দেখিতে বাখারের ন্যায়, কার্য্যও ইহা দ্বারা বাখারের ন্যায় হইয়া থাকে, তবে বাখার এককালীন দুই ফুট জমি আলোড়িত করে, ডুগিয়া দ্বারা এককালীন এক ফুট জমি আলোড়িত করা চলে। ডুগিয়া-যন্ত্র একটী মাত্র বলদের সাহায্যে চালান হইয়া থাকে। জমির মাথা আঁটিয়া গেলে
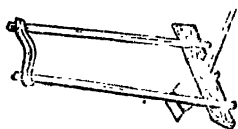
৪১ চিত্র। ডুগিয়া।

জমির মধ্যে অবাধে বায়ু ও শিশির প্রবেশ করিতে পারে না। জমির মধ্যে বায়ু ও শিশির প্রবেশ করিতে পারিলে ফসল যেরূপ তেজঃ করে জমির মাথা আঁটা থাকিলে সেরূপ কখনই করিতে পারে না, একারণ হাতে চালান হোই হউক অথবা বলদ বা মহিষ দ্বারা চালিত বিলাতী বা দেশী কোন প্রকার হোই হউক, মাটি উস্কান কোন না কোন প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার এদেশে বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

দোন, শুণ্ড-যুক্ত মোট, বালদেব বালতি, ঘট-চক্র, এই কয়েকটী জলোত্তলন যন্ত্রের ব্যবহার বঙ্গদেশে প্রচলিত হওয়া যে বিশেষ আবশ্যক ইহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিলাতী কৃষি-যন্ত্র।—যে দেশে এক একজন অর্থবান ব্যক্তি ২০০।৩০০ একার জমি চাষ করিয়া থাকে সে দেশের অনুকরণে কৃষিকার্য্যের কোন অনুষ্ঠান এদেশে প্রচলিত করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল কুঠিয়াল সাহেব এদেশে হাজার হাজার

বিঘা জমি লইয়া চাষাবাদ করিয়া থাকেন তাঁহারা অনায়াসে বিলাতী কল ও যন্ত্রাদি ব্যবহার করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন; সাধারণ কৃষকদের পক্ষে ফ্রান্স ও আমেরিকার বাগানে ব্যবহার্য্য কয়েকটী যন্ত্র এদেশে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলে সুলভ মূল্যে কৃষকগণ উহাদের সংগ্রহ করিয়া ব্যবহারে আনিতে পারে। বিলাতী কোন যন্ত্র এদেশের ব্যবহরোপযোগী করিয়া লইতে হইলে ঠিক্ উহা অনুকরণ না করিয়া, সুলভ করিবার জন্য ও মেরামেতের সুবিধার জন্য উহার কোন কোন অংশ বাদ দেওয়া ও কোন কোন ধাতু নির্ম্মিত অংশ কাষ্ঠের প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

বিলাতী কতকগুলি কল বাষ্পীয় যন্ত্রের অথবা তড়িৎ-যন্ত্রের সাহায্যে চালিত হয়। এদেশে কৃষিকার্য্যে এসকল যন্ত্রের সাহায্য লইবার সময় এখনও আসে নাই। কুঠিয়াল সাহেবেরা অথবা ধনীব্যক্তি বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু কৃষকগণ দ্বারাই এদেশের কৃষি-কার্য্য স্থায়ীভাবে চালিত হওয়া সম্ভব। অর্থবান সুখী ব্যক্তির দ্বারা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে কৃষিকার্য্য স্থায়ীভাবে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে। কৃষকদিগের দ্বারা ভাগে কার্য্য চালান যাইতে পারে বটে কিন্তু যেখানে বল ও সহিষ্ণুতা প্রয়োগের আবশ্যক সেইখানেই শ্রমজীবী কৃষক ও কৃষকের বলদ আপাততঃ ব্যবহার্য্য, জটিল বাষ্পীয় যন্ত্র, যাহা পল্লিগ্রামে প্রস্তুত বা মেরামত হইতে পারে না, ব্যবহার্য্য নহে। উন্নতি ক্রমশঃই হইয়া থাকে। বিলাতে বাষ্পীয় যন্ত্র পর্য্যন্ত পুরাতন হইয়া দাঁড়াইতেছে, তড়িৎ-যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমশঃ কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এই উন্নতি ক্রমশঃ হইয়াছে। উন্নতির নিম্ন সোপান গুলি পরিত্যাগ করিয়া এককালীন উচ্চ সোপানে পদার্পণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। আপাততঃ যে সকল যন্ত্র বলদের শক্তি দ্বারা

চালিত হইতে পারে এরূপ যন্ত্র সকল ব্যবহার দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা কৃষি-কার্য্য কিছু বৃহদায়তনে পরিচালিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি এক বা দুই হাল জমি চাষ করে, সে অনায়াসে বলদের দ্বারা ধান-কলাই মাড়াই করিয়া, কুলায় করিয়া ঝাড়িয়া, থালা ও সেচনী দ্বারা জল ছিটাইয়া দিয়া, বংশ-দণ্ড দ্বারা দধি মন্থন করিয়া, গৃহস্থালী চালাইয়া লয়। কিন্তু ১০০।২০০ বিঘা জমি চাষ করে এরূপ কৃষকও এদেশে আছে। ইহাদের কর্ত্তব্য বলদের সাহায্যে যে সকল কল চালাইতে পারা যায় ঐ সকল ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করা। আক্-মাড়াই কল ক্রমশঃ এদেশে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বল-দের সাহায্যে চালাইতে পারা যায় এরূপ আরও অনেক প্রকার কল প্রচলিত হইতে পারে। বলদের সাহায্যে চালাইতে পারা যায় এরূপ অনেক প্রকার কল অন্যদেশে প্রচলিত আছে। যেমন বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে একটী লৌহ-শলাকা ঘুরিতে থাকে, এবং এই শলাকা-স্থাপিত পুলিশ্রেণী-আলম্বিত চর্ম্মের বা সূত্রের রজ্জু-পট দ্বারা নানা প্রকার কল চালাইতে পারা যায়, সেইরূপ বলীবর্দ্দ-বল-প্রয়োগ-যন্ত্র (bullo-ckgear) অন্যান্য যন্ত্রের সহিত রজ্জু-পট দ্বারা সংলগ্ন করিয়া লইয়া ইহাদের চালাইতে পারা যায়। কাটারির অথবা বঁটির সাহায্যে যে পরিমাণ বিচালি কাটা যায় বিচালি-কাটা-কলের সাহায্যে তাহার দশগুণ কাটিতে পারা যায়। বিচালি-কাটা-কল হাতে চালাইবার উপযোগীও নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে চালাইবার উপযোগী অতি বৃহদাকারেরও নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, এবং বলীবর্দ্দ-বল-প্রয়োগ-যন্ত্র দ্বারা চালাইবার উপযোগী মধ্যমাকারের ও নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। যে পরিমাণ বিচালি হাতে চালান কলের দ্বারা কাটা যাইতে পারে তদপেক্ষা অনেক অধিক বিচালি বলীবর্দ্দ-বল-

প্রয়োগ-যন্ত্রের সাহায্যে কাটিতে পারা যায়। বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে ইহা অপেক্ষাও অধিক বিচালি কাটিতে পারা যায়। যন্ত্রগুলির আকার ও কার্য্যক্ষমতানুসারে উহাদের মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। অনেক প্রকার কৃষি-যন্ত্র, হাতে চালান, বলীবর্দ্দ-বল-প্রয়োগ-যন্ত্রের সাহায্যে চালান ও বাষ্পীয়-যন্ত্রের সাহায্যে চালান, এই তিন শ্রেণীর প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাতে চালান বিচালি-কাটা-কল কলিকাতার টি. ই. টম্‌সান্, জেসপ কোম্পানী প্রভৃতি সাহেবদের দোকানে, ৪০৲।৫০৲ টাকায় পাওয়া যায়; বলীবর্দ্দ-বল-প্রয়োগ-যন্ত্রের সাহায্যে চালানর উপযুক্ত বিচালি-কাটা-কলের দাম ২৫০৲। ৩০০৲ টাকা এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে চালানর উপযুক্ত বিচালি-কাটা-কলের দাম ৫০০৲।৬০০৲ টাকা। হাতে চালান কলের দ্বারা সমস্ত দিবসে ষোল বা বিশ মণ বিচালি কাটা যায়। বলীবর্দ্দ-বল-প্রয়োগ-যন্ত্রের সাহায্যে যে বিচালি-কাটা-কল চালান যায় উহা দ্বারা সমস্ত দিবসে ৬০।৭০ মন বিচালি কাটা যাইতে পারে, এবং বাষ্পীয়-যন্ত্রের সাহায্যে যে বিচালি-কাটা-কল চালান যায় উহা দ্বারা ৩০০। ৪০০ মন বিচালি এক দিনে কাটা যায়। যে ব্যক্তি ২০০।২৫০ গাই-বলদ পালন করিয়া থাকে তাহার উচিত একটী বলীবর্দ্দ-বল-প্রয়োগ-যন্ত্র ও প্রত্যহ ৬০।৭০ মণ বিচালি কাটা যায় এরূপ আয়তনের একটী বিচালি-কাটা-কল রাখা। যাহার ৫০।৬০ টী গাই-বলদ আছে তাহার কর্ত্তব্য বঁটি বা কাটারির উপর নির্ভর না করিয়া একটী হাতে চালান বিচালি-কাটা কল রাখা। ৫০০।৭০০ বা ১০০০ গাই-বলদ পালন করিয়া থাকে এরূপ কৃষক বা গোপ এদেশে নাই, কাযেই বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল বিচালি-কাটা-কল চালিত হয় কৃষি-কার্য্যের জন্য সে সকল কল এদেশে প্রচলিত করিবার সময় এখনও আসে নাই।

বিচালি-কাটা কলের বিষয় যাহা বলা হইল নানা প্রকার কলের বিষয় ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। শস্য-মাড়াই যন্ত্র, হাতে চালান, বলদ-যন্ত্রের সাহায্যে চালান, ও বাষ্পীয়-যন্ত্রের সাহায্যে চালান, এই তিন আকারেরই প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাতে চালান শস্য-মাড়াই কলের দ্বারা যত কায হয় তদপেক্ষা অধিক কায বলদের পদ-দলন দ্বারা পাওয়া যায়। কাযেই হাতে চালান শস্য-মাড়াই কলের ব্যবহার এদেশে প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বলদ-যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যহ ১০০।১৫০ মণ ধান-কলাই ইত্যাদি শস্য মাড়াই করিয়া লইয়া, আর একটী যন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ, ধান-কলাই ইত্যাদি শস্য-ঝাড়ান যন্ত্রের দ্বারা, একই দিবসে উহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া চলে। মূল-কর্ত্তণ যন্ত্র, মূল-ঘর্ষণ-যন্ত্র, খোল গুঁড়া করা যন্ত্র, যই, বুট ইত্যাদি শস্য পেষণ-যন্ত্র, ধান-ভাঙ্গা-কল, চাউল-ছাটা কল, ভুট্টার দানা ছাড়ান কল, ময়দা প্রস্তুত কল, তৈল-মর্দ্দণ-কল, গুড় হইতে মাৎ বাহির করিয়া দিবার কল, নবনীত পৃথক করা কল এবং কয়েক প্রকার জলোত্তলন-যন্ত্র, বলদ-যন্ত্রের সাহায্যে চালাইতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। একই বলদ-যন্ত্র বা বলীবর্দ্দ-বল-প্রয়োগ-যন্ত্র দ্বারা এই সকল কল চালান যাইতে পারে। যে সকল কল হাতে চালান যাইতে পারে সে সকল কলেরও হাতল বাহির করিয়া লইয়া পুলি বা কাটা-চাকা হাতলের পরিবর্ত্তে পরাইয়া দিয়া বলদ-যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া লইয়া উহাদের আরও সহজে চালান যাইতে পারে। বলদ-যন্ত্র নানা প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে গেলে যে কল চালান আবশ্যক উহার সহিত যন্ত্রটী সংলগ্ন করিতে হইলে চর্ম্ম বা রজ্জু-পট আবশ্যক করে; অন্য প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে গেলে কলের সহিত সংলগ্ন করিবার জন্য রজ্জু

বা চর্ম্ম-পট ব্যবহার না করিয়া যন্ত্রের ও কলের কাটা-কাটা চাকা দুইটী খাঁজে খাঁজে লাগাইয়া দিয়া কল ও যন্ত্র দৃঢ়রূপে বসাইয়া দিলেই বলদ যেমন যন্ত্রটী ঘুরাইতে থাকিবে কলও সেইমত ঘুরিবে। কলিকাতার জেসপ্ কোম্পানীর দোকানে কাটা-চাকার বলদ-যন্ত্র ২০০৲ টাকায় ক্রয় করিতে পারা যায়।
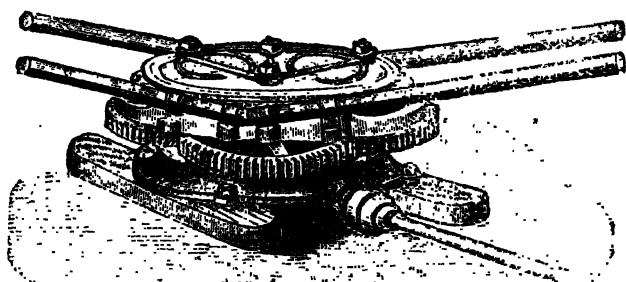
৪২ চিত্র। কাটা-চাকার বলদ-যন্ত্র।

নানাপ্রকার শস্য মাড়াই-যন্ত্রও কলিকাতার সাহেবদের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। যে গুলি ৩০০৲।৪০০৲ টাকার দামের সেইগুলি বলদ-যন্ত্রের সাহায্যে চালাইবার উপযুক্ত। শস্য-ঝাড়া, অর্থাৎ ভুসা হইতে শস্য পরিষ্কাররূপে পৃথক্ করা যন্ত্রও নানাপ্রকার কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে হাউসার সাহেবের কলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। ইহা কলিকাতার বর্ণ-কোম্পানীর কারখানায় ২৫০৲ টাকায় কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রত্যহ ১৫০।২০০ মণ শস্য পরিষ্কাররূপে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়। এই কলের বিশেষত্ব এই, যে ইহা হইতে ছোট-বড় বা বিভিন্ন জাতীয় শস্য, কলের সম্মুখে স্থাপিত বিভিন্ন আধারে পতিত হইয়া থাকে এবং কলের পশ্চাৎভাগ দিয়া খড়-ভুসা সমস্ত উড়িয়া যায়।
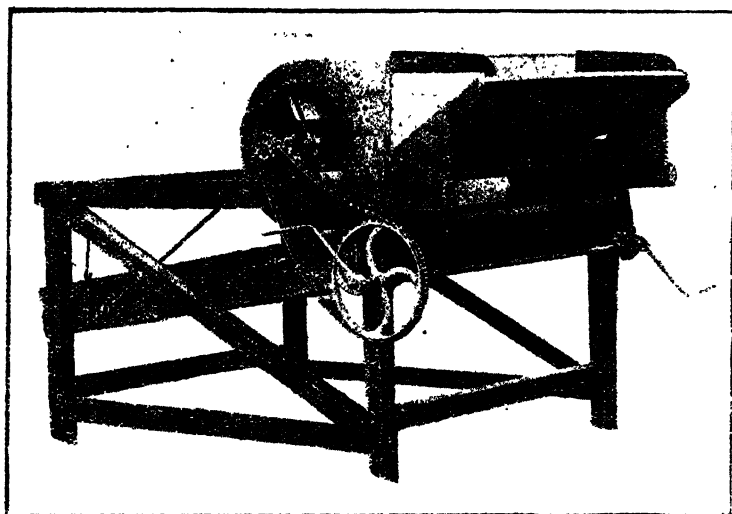
৪৩ চিত্র। শস্য-ঝাড়া কল।

ধান-ভাঙ্গা ও চাউল-ছাটা কল বঙ্গদেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া এই কলের বিষয়ও এস্থলে বর্ণনা করা বিধেয়। বর্ণ-কোম্পানীর কারখানায় **ঘটকের ধান ভাঙ্গা কল** ৬০৲ টাকা দামে বিক্রয় হয়,এবং এই কারখানায় ক্ষুদ্র এক প্রকার শস্য ঝাড়া কলও অতি স্বল্প মূল্যে, অর্থাৎ ৫০৲ টাকা দরে, বিক্রয় হইয়া থাকে। ঘটকের কল দ্বারা ৪।৫ বার উপর্য্যুপরি ধান ভাঙ্গিয়া প্রত্যেক বারে ঝাড়িয়া, লইয়া, তবে চাউল এক রকম পরিষ্কার হইয়া বাহির হয়। এই কল বলদের দ্বারা চালাইয়া প্রত্যেক দিবসে ৪।৫ মণ চাউল বাহির করা যাইতে পারে। দুই জোড়া বলদের খোরাক ও একজন মানুষের মজুরিতে প্রত্যহ ॥০ আনা খরচ হওয়া সম্ভব। সুতরাং ঘটকের কলদ্বারা প্রত্যেক মণ চাউল প্রস্তুত করিতে ন্যূনাধিক ৵০ আনা খরচ পড়ে।

এঙ্গেল্‌বার্গ হালার্‌ ও পলিশার্‌ নামক ধানভাঙ্গা ও ছাঁটা মার্কিন্‌ কল, কলিকাতার নং ৯৯, ক্লাইব্‌ষ্ট্রীটের মার্শাল্‌ এণ্ড্‌ সান্স্‌এর কারখানায় ১০০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই কলদ্বারা একবারে ধান হইতে পরিষ্কার ছাঁটা চাউল বাহির হইয়া থাকে। চারি প্রস্ত হালার বা ধানভাঙ্গা কলের সহিত একটী পলিশার বা ধান-ছাটা কল চালাইতে ১৬ হর্স পাওয়ারের একটী এঞ্জিন্‌ আব-
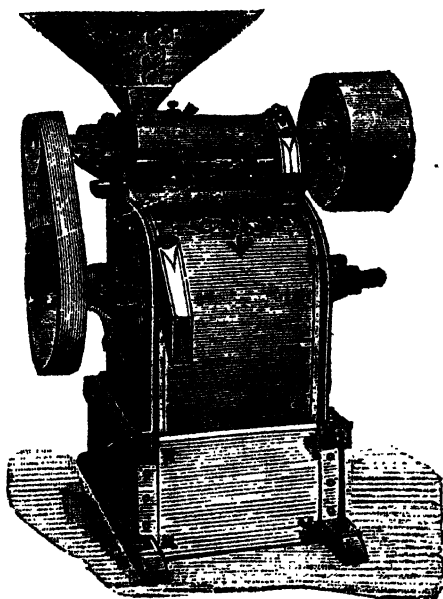
৪৪ চিত্র। এঙ্গেলবর্গ হালার্‌ ও পলিশার্‌।

শ্যক করে। যদি এঞ্জিন ও বয়লারের দাম ৫০০০৲ টাকা পড়ে ও ৪টী ধানভাঙ্গা কল ও একটী চাউলছাটা কল কিনিতে যদি ৪০০০৲ টাকা খরচ পড়ে, ও কল বসাইবার ও ধান-চাউল রাখিবার ঘর

প্রস্তুত করিতে আর এক হাজার টাকা খরচ পড়ে তাহা হইলে ১০,০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা চলে। এক এক প্রস্ত কল হইতে ঘণ্টায় প্রায় ৪ মণ, অর্থাৎ চারিটী প্রস্ত কল হইতে প্রত্যহ আন্দাজ ১৩০/ মণ চাউল পরিষ্কার হইতে পারে। কল চালাইবার দৈনিক খরচ প্রায় ৮/ মণ কয়লার জন্য ৩৲ টাকা, এবং একজন খালাসি ও একজন ভিস্তির বেতন বাবদ ১।/০। মূলধনের সুদ প্রত্যহ দুই টাকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। আর আর খরচের জন্য যদি ॥৶০ আনা ধরা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ প্রাত্যহিক ব্যয় ৭৲ টাকা ধরা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে এই কলদ্বারা ধানভাঙ্গা ও ছাটাতে মণ প্রতি /০ আনারও কম খরচ পড়ে।

শাল্‌কিয়া (হাওড়া), ৪৮ নং গোলাবাড়ি রোডের শ্রীযুক্ত রাখাল দাস খাঁ নিজের কারখানায় যে ধানভাঙ্গা ও চালছাটা কল প্রস্তুত করিয়াছেন উহা এঙ্গেলবার্গ কল অপেক্ষা অধিক আদরনীয়। এই কল হাতে চালান, বলদে ও এঞ্জিনে চালান তিন প্রকার প্রস্তুত হইতেছে। হাতে চালান কলের দাম ১০ টাকা মাত্র। ইহাতে কায সুন্দররূপে হয় না, তবে ঘটকের কলের মত হয়। বলদে চালান কলের দাম ৪০০৲ টাকা। ইহাতে এক প্রস্ত ধানভাঙ্গা কল ও একটী চাউল ঝাড়া কল আঁটা থাকে, ও যেমন বলদ ঘুরিতে থাকে অমনই কল দুইটীও চলিতে থাকে এবং ধান হইতে একেবারে ছাটা চাউল বাহির হইয়া থাকে। প্রত্যহ ২০ মণ চাউল এই কল দ্বারা বাহির হওয়া সম্ভব। এঞ্জিন ও বয়লার ব্যবহার দ্বারা এককালীন পাঁচ প্রস্ত কল চালাইতে পারা যায় এবং উহারই সহিত একটী চাউল ঝাড়া কল জুড়িয়া দিলে তাহাও ঐ একই সঙ্গে চালাইতে

পারা যায়। ধান ভাঙ্গা ও চাউল ছাটা একই কলে হইয়া থাকে। এক এক প্রস্ত ধানভাঙ্গা বা চাউল ছাটা কলের দাম ৩০০৲ টাকা। ইহার উপর এঞ্জিন ও বয়লার কিনিতে যদি ৫০০০৲ টাকা খরচ পড়ে, তাহা হইলে এই কল কিনিয়া ৮০০০৲ টাকা মূল-ধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক প্রস্ত কল হইতে ৫০/ মণ চাউল ভাঙ্গা বা ছাটা হইবে ও ২৫০/ মণ চাউল ঝাড়া হইবে। আতপ চালের কুঁড়া প্রত্যেক মণ-চাউলের সহিত অৰ্দ্ধসের মাত্র মিশাইয়া, চাউল, ধানভাঙ্গা ও চাউল ঝাড়া কলের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইতে পারিলে উহা মাজা চাউলে পরিণত হয়। এই কলের দ্বারা এঙ্গেলবার্গ কল অপেক্ষা অধিক কার্য্য হয় ও ইহা অপেক্ষাকৃত সুলভ। কিন্তু কলটীর প্রধান সুবিধা এই, ইহা এই দেশেই প্রস্তুত হইতেছে ও এই দেশেই ইহার প্রত্যেক অংশ মেরামত হইতে পারে। এঙ্গেল্‌বার্গ হালারের ছুরিকা, রোলার, প্রভৃতি ক্ষয় হইয়া গেলে এদেশে ঐ সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া লইবার উপায় নাই। আমেরিকা হইতে এই সকল সামগ্রী আনাইয়া লইতে ব্যয়াধিক্য হয়। রাখালদাস বাবুর ধানভাঙ্গা কল এদেশে প্রচলিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

সাধারণ কৃষি-যন্ত্রের মধ্যেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিলে লাভ আছে। বিলাতী লাঙ্গলের একটী প্রধান উদ্দেশ্য মাটি উল্টাইয়া ঘাস চাপিয়া দেওয়া। দেশী লাঙ্গলের দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ হয় না। কোদালের দ্বারা এই কার্য্য করা যাইতে পারে বটে এবং আবশ্যক হইলে মাটির চাপড়া কাটিয়া উল্টাইয়া দেওয়া কোদালের দ্বারাই করা হয় বটে, কিন্তু ইহাতে খরচ অনেক অধিক পড়ে। এদেশেও মাটির চাপ্‌ড়া উল্টাইয়া ফেলিবার জন্ত

কয়েক প্রকার পক্ষযুক্ত লাঙ্গল প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার মধ্যে জেসপ্ কোম্পানীর "হিন্দুস্থান প্লাউ"এর দাম ১৬৲ টাকা, কানপুর সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রের "ওয়াট্স্ প্লাউ"এর দাম ৮৲ টাকা, ও "মেষ্টন্ প্লাউ"এর দাম ৪৲ টাকা, শিবপুর লাঙ্গলের দাম ১০৲ টাকা, ইত্যাদি। এ গুলির গঠণ প্রণালী প্রায় একই প্রকার। মেষ্টন্ প্লাউ ঢালা লোহার গঠিত ও নিতান্ত ছোট বলিয়া ইহার দাম এত কম। বালুকাময় হাল্কা মাটিতে মেষ্টন্ প্লাউ দ্বারা কাজ চলিতে পারে, কিন্তু মৃত্তিকা কিছু কঠিন হইলেই ইহা ভাঙ্গিয়া যায়।
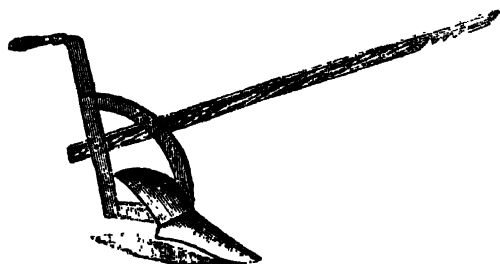
৪৫ চিত্র। শিবপুর লাঙ্গল।

দেশী লাঙ্গলের ন্যায় জমি আঁচড়ান কার্য্য যুগপৎ পাঁচটী ফাল দ্বারা হইয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিবার উপযোগী একটী "গ্রাবার্" যন্ত্রের চিত্র নিম্নে দেওয়া গেল। প্রথম লাঙ্গল ও মৈ-দিবার পরে ৫।৬ ইঞ্চি গভীরভাবে পুনরায় ভূমি কর্ষণ করিবার জন্য বারবার লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া এই গ্রাবার্ যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। ইহার গঠণ প্রণালী নিতান্ত সহজ। এদেশে ১৫৲ বা ২০৲ টাকা খরচ করিয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।
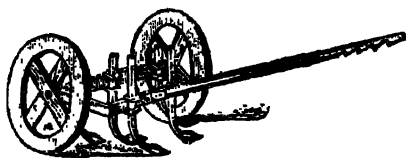
৪৬ চিত্র। গ্রাবার্ যন্ত্র।

লাঙ্গল ও মৈ ব্যবহার দ্বারা সুচারুরূপে জঙ্গল উৎপাটন ও একত্রীকরণ এবং বীজবপনের উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত হয় না। এই সকল কার্য্যের জন্য বিলাতে লোহার আঁচড় ব্যবহার হইয়া থাকে। এ যন্ত্রের ব্যবহার এদেশেও বাঞ্ছনীয়। ইহা প্রস্তুত করাইতে ৪০৲ টাকার কম খরচ হওয়া সম্ভব নহে।

৪৭ চিত্র। হ্যারো বা লোহার আঁচড়।
(যোক্ত সহ)

লাঙ্গল ও মৈ ব্যবহার একবার করিবার পরে যদি জমি গভীর ভাবে কর্ষণ না করিয়া উপর উপর দুই তিন ইঞ্চি মাত্র কর্ষণ করিলে চলে তাহা হইলে গ্রাবারের পরিবর্ত্তে বাখার ব্যবহার করা যাইতে পারে। পুনঃপুনঃ বাখার ব্যবহার করিলে হ্যারো না ব্যবহার করিলেও সমতলভাবে বপনের উপযোগী জমি প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

বীজবপন যন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে অণু ও কীট নাশক সারও লাইন ধরিয়া জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে মার্কিন্ বীজবপন যন্ত্রটী চিত্রে

প্রদর্শিত হইয়াছে উহার ছোট বাক্সটীতে বীজ ও বড় বাক্সটীতে সার থাকে। দুই সামগ্রীই একত্রে জমিতে লাইন ধরিয়া পাতিত করিতে করিতে একজন মানুষ এই কলটী চালাইয়া যাইতে পারে।

বীজ বপন করিবার পরে বীজ আবৃত করিবার ও মৃত্তিকা চাপিয়া দিবার জন্য এদেশে মৈ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিলাতে রোলার বা রুল টানার নিয়ম আছে। এই যন্ত্রের দ্বারা কার্য্য ভাল হয় বটে, কিন্তু ইহা ক্রয় করিতে অনেক ব্যয় হয়।

জমি প্রস্তুত, বীজবপন ও রোলার দেওয়া শেষ হইলে, বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরে মধ্যে মধ্যে জমি উস্কাইয়া দিলে ফসল তেজঃ করিয়া উঠে। জমি উস্কান যন্ত্রের কথা পূর্ব্বে অনেক বার বলা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষে যে দাউড়া ও ডুণ্ডিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু দাউড়া বা ডুণ্ডিয়া চালাইতে গেলে শিক্ষিত বলদের আবশ্যক। মানুষের অধিক বুদ্ধি, সে অনায়াসে সোজা একটা যন্ত্র চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বলদকে অনেক পরিশ্রম করিয়া সোজা লাইন ধরিয়া হাঁটিতে শিখাইতে হয়। এ কারণ হাতে-চালান বিলাতী "হো" বা জমি উস্কান যন্ত্র এদেশে ব্যবহার করাতে বিশেষ উপকার আছে। আমেরিকার প্লানেট্ জুনিয়ার "হো"র ফাল দুইটী খুলিয়া লইয়া, ঐস্থানে ক্ষুদ্র লাঙ্গল বা আঁচড় আঁটিয়া দিলে এই যন্ত্রকে হাতে চালান লাঙ্গল বা হাতে চালান আঁচড়ের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যদি দুই সারি গাছের মধ্যে ৪।৫ ফুট স্থান থাকে তাহা হইলে জমি উস্কাইবার জন্য বলদে যোতী "হাণ্টার হো" ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফ্রান্স দেশের আঙ্গুর ফলের আবাদে বিদে ও খুর্পি উভয় যন্ত্রের কার্য্য

করে এরূপ একটী যন্ত্র গাছের মধ্যবর্ত্তী ভূমির আলোড়ন কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। এ দেশেও ইক্ষু, অড়হর, রেড়ি, কার্পাস প্রভৃতি ক্ষেত্রের গাছের মধ্যবর্ত্তী জমির কর্ষণ কার্য্যে এই যন্ত্র ব্যবহার হইতে পারে। সম্মুখে একটী চাকা থাকিবার কারণ হাণ্টার-হো বা বিদে-থুর্পি ডুগ্গিয়া বা দাউড়ার অপেক্ষা ব্যবহার করা সহজ। এই দুই যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষিত বলদ আবশ্যক করে না।
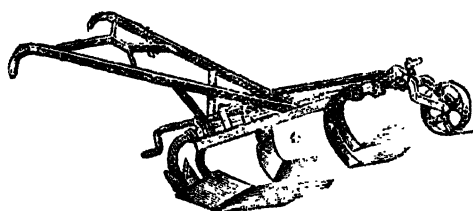
৪৮ চিত্র। হাণ্টার্-হো।

হাণ্টার-হো দ্বারা আলু উঠান কার্য্যও চলিতে পারে। কোদালী দ্বারা আলু কিছু কম কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু হাণ্টার-হো দ্বারা কার্য্য অনেক সত্বর হয়। তিনবার হাণ্টার-হো আলুর জমিতে এদিক্ ওদিক্ করিয়া চালাইয়া লইলে আলু সমস্ত উপরে আসিয়া পড়ে
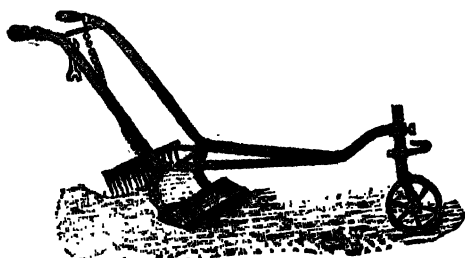
৪৯ চিত্র।

এবং জমি অতি সুন্দর প্রস্তুত হইয়া যায়। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল দ্বারা ইক্ষু, ভুট্টা ও আলুর জমিতে ভিলি বাঁধা ও মাটি-চাপান কার্য্য উত্তম চলিতে পারে। হাণ্টার হোর দাম কলিকাতার সাহেবদের দোকানে ৪০৲।৫০৲ টাকা; দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল বিলাত হইতে আনিতে ৭৫৲ টাকা খরচ হয়।

একবিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। এদেশে সহজে প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ জল-সেচনের উপযোগী যন্ত্র গুলির নাম কর।

২। কীট ও ধসা নিবারণ করিতে যে সকল আরক বা চূর্ণ প্রয়োগ করার রীতি বা অন্য উপায় আছে, ঐ সকল প্রয়োগ করিতে বা ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে যে যে যন্ত্রের ব্যবহার হইতে পারে ঐ সকল বর্ণনা কর।

৩। নবনীত ও মাখন প্রস্তুতের জন্য যে যে যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে ঐ সকলের নাম কর।

৪। ভারতবর্ষের অপর প্রদেশে যে কৃষি-যন্ত্র সমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে, ঐ গুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী বঙ্গদেশে প্রচলিত করিবার উপযুক্ত।

৫। বীজ-বপন-যন্ত্র বর্ণনা কর।

৬। ডুঙিয়া ও দাউড়ার পরিবর্ত্তে কোন্ বিলাতী যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং তাহা ব্যবহার করাতে কি সুবিধা আছে?

৭। বিলাতী কৃষি-যন্ত্র যাহা এদেশে ব্যবহারে আসিতে পারে এমন কয়েকটীর নাম কর।

৮। বলীবৰ্দ্ধ-বল-প্রয়োগ যন্ত্র কাহাকে কহে ?

৯। ধান-ভাঙ্গা ও চাউল-ছাটা কল সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

১০। বিলাতী লাঙ্গলের অনুকরণে যে সকল লাঙ্গল এদেশে প্রস্তুত হইয়াছে ঐ সকল ব্যবহার করাতে লাভ কি ?

১১। লাঙ্গলের পরিবর্ত্তে গভীর ও অগভীর ভাবে ভূমি কর্ষণ করিতে কি কি যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে ?

১২। হ্যারো, হো, ও গ্রাবার কিরূপ যন্ত্র ?

১৩। আলুর চাষে যে সকল বিলাতী যন্ত্র ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পারে ঐ সকলের নাম কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জমির সার।

পুনরুল্লেখ।—নবম অধ্যায় হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত কয়েকটী সারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিংশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, জমির সারের তিনটী প্রধান উপাদান, যবক্ষারজান, ফস্‌ফরাস্ ও পটাস্। চূণ, লৌহ, প্রভৃতি আরও কয়েকটী পদার্থ ফসল জন্মিবার

পক্ষে কিছু না কিছু সহায়তা করে, কিন্তু এই সকল উপাদানের অভাব প্রায়ই দেখা যায় না। চূণের অভাব কলাই জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মাইবার জন্য কখন কখন লক্ষিত হয়, একারণ চূণ-সারের বিষয় এককালীন উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। লবণ-সারেরও বিশেষ বিশেষ উপকারিতা আছে।

সহজলভ্য সার।—গোবর ও ছাই কৃষকগণ যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু গোময় এদেশে সচরাচর জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া কৃষকগণ অধিকাংশ জমি বিনাসারে আবাদ করিয়া থাকে। চীন ও জাপান দেশে কোন ফসলই বিনাসারে জন্মাইবার রীতি নাই। ফসল জন্মাইতে জন্মাইতে জমি যে নিস্তেজ হইয়া আইসে ইহা কৃষকগণ বিলক্ষণ জানে। যে জমিতে বৎসরে বৎসরে নদীর বান আসিয়া পলি পড়িয়া থাকে, ঐ জমিতে বিনাসারে ফসল জন্মাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় উর্ব্বরতা এক বৎসরের পলি দ্বারা লাভ হয় না। পাব্না, ময়মনসিং প্রভৃতি যে সকল জেলার অনেক জমি প্রতিবৎসর জলে ডুবিয়া যায় ঐ সকল যদি তিন বৎসর বিনা আবাদে ফেলিয়া রাখিয়া পরে পুনরায় আবাদ করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় উপর্য্যুপরি তিনবৎসর পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ বিঘা প্রতি প্রায় ৮ মণ করিয়া পাট জন্মে। চতুর্থ বৎসরে পলিপড়া সত্ত্বেও ৮ মণের পরিবর্ত্তে ৫ মণ পাট জন্মে। অতঃপর পলি পড়া সত্ত্বেও একবৎসর ধান ও এক বৎসর পাট এইরূপ পর্য্যায়ে কার্য্য করিলে তবে বিঘাপ্রতি ৫/০ মণ পাট জন্মে, নতুবা বৎসর বৎসর পাটের উৎপন্ন কমিয়া যায়। ধানের উৎপন্নও বিনা-পর্য্যায়ে সম্ভবতঃ কমিয়া যায়, কিন্তু কৃষকেরা ঐ বিষয়ে ঠিক্ লক্ষ্য করে নাই। অনেকেই বলে পূর্ব্বে জমিতে

যেরূপ ধান হইত এক্ষণে তাহা হয় না, কিন্তু ধান্যের উৎপন্ন অতি ধীরে ধীরে হ্রাস হয় বলিয়া এ বিষয়ে সঠিক্ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু পাট সম্বন্ধে সকল কৃষকেরই এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে জমির তেজঃ ফসল জন্মাইবার কারণ অল্প-বিস্তর হ্রাস হয়। ধইঞ্চা, বর্ব্বটী, শণ, নীল, অড়হর, চীনার-বাদাম এইরূপ কয়েকটী ফসল জন্মাইলে জমির তেজঃ হ্রাস না হইয়া অনেক বৃদ্ধি হয়, এ কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কৃষকদিগেরও বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তিন বৎসর জমি ফেলিয়া রাখিয়া উহাতে নদীর জলের পলি পড়িতে দিলে জমি পূর্ণ মাত্রায় উর্ব্বরা হয় এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে জমিতে পলি পড়ে না, সে জমিতে পূর্ণমাত্রায় পাট জন্মাইবার জন্য পাবনা ও ময়মনসিংহের অনেক কৃষক বর্ষাবসানে শণ জন্মাইয়া থাকে। যে জমিতে শণ জন্মান হয়, পর বৎসর সেই জমিতে ৮-৯ মণ পাট হয়; অর্থাৎ, অত্যন্ত উর্ব্বর জমিতে যে পরিমাণ পাট জন্মে সেই পরিমাণ পাট জন্মিয়া থাকে। পুষ্করিণী ও নালার মৃত্তিকা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে উঠাইয়া শুষ্ক করিয়া পরে জমিতে ছিটাইয়া দিলে পলি ও গোবর সারের ন্যায় কার্য্য করে।

পলি পড়া ও কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মান, জমি সারবান হইবার পক্ষে অতি সহজ উপায়; যেখানে এই দুইটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে সেখানে অন্য সার-সংগ্রহের আবশ্যক করে না। অন্যত্রে সার-প্রয়োগের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

শ্রেণী-বিভাগ।—সার সমুদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

১ম, সাধারণ সার, অর্থাৎ যাহাতে যবক্ষারজান, ফস্ফরাস্, পটাশ, চূর্ণ, লৌহ, গন্ধক, ইত্যাদি উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থ সমস্তই কিছু না কিছুপরিমাণে গলনশীল বা গলিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে ; যথা, জন্তুদিগের মল-মূত্র, পলুর নাদি, রেশম-কুঠির আবর্জ্জনা (চোক্‌ড়ি), নানাপ্রকার খোল, রক্ত-মাংস, পচা বা শুষ্ক মৎস্য, ঘাস, পাতা, বিচালি, পুষ্করিণী, সমুদ্র ও আর আর জলাশয়ের পলি মাটি, পুষ্করিণী ও নালার পাঁকমাটি (শুষ্ক অবস্থায়), পানা ও আগাছা, সহরের আবর্জ্জনা, নীল-সিটি, ইত্যাদি।

২য়, ফস্‌ফরাস্ সার, অর্থাৎ যাহাতে ফস্‌ফরাস্ অম্লের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের অধিক বর্ত্তমান আছে ; যথা, আপেটাইট্ প্রস্তর, ত্রিচিনাপল্লি প্রস্তর, জন্তুদিগের অস্থি, ইত্যাদি। খোলে ও ছাইয়ে শতকরা ১ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্‌ফরাস্-সার বিদ্যমান থাকে বলিয়া যেখানে ফস্ফরাস্ প্রয়োগের আবশ্যক, সেখানে যদি আপেটাইটাদি ফস্ফরাসাম্ল প্রধান প্রস্তর চূর্ণ অথবা অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব হয়, তবে খোল ও ছাই প্রয়োগ দ্বারা কতক ফস্‌ফরাস্-সারের কার্য্য সাধিত হয়।

৩য়, যবক্ষারজান ঘটিত-সার, অর্থাৎ যাহাতে যবক্ষারজানের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের অধিক বর্ত্তমান আছে ; যথা, সোডিয়াম্ নাইট্রেট্, এমোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্, সোরা, মৎস্যের সার, রেড়ির খোল, চীনাবাদামের খোল, খোসা ছাড়ান কার্পাস বীজের খোল, পোস্তদানার খোল, কুসুম ফুলের বীজের খোল, শুষ্ক শোণিত, মাংস, ছিন্ন পশমী বস্ত্র, ইত্যাদি। মৎস্য সারে, খোলে, রক্ত-মাংসে ও ছিন্ন পশমী বস্ত্রে বিশিষ্ট পরিমাণ ফস্‌ফরাস্ ও পটাশাদি সারও বর্ত্তমান আছে বলিয়া এ সকল সামগ্রী সাধারণ

সারেরও অন্তর্ভুক্ত। পাকশালার ঝুলে শতকরা ২।৩ ভাগ যবক্ষারজান আছে, এ কারণ ইহাও সার-পদার্থ এবং ইহার কীট-নাশক গুণ থাকাতে ইহার ব্যবহার দ্বারা কপির চারা প্রভৃতিতে পোকা লাগিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪র্থ, পটাশ বা ক্ষার-সার, অর্থাৎ, যাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক পটাশ্ আছে; যথা, ছাই, কাইনিট্, গোলাপী রংএর ফেল্‌স্‌পার্ প্রস্তর, সোরা, ইত্যাদি। সোরাতে যবক্ষারজান ও পটাশ্ উভয় উপাদানই শতকরা ৫ ভাগের উপর আছে বলিয়া যবক্ষারজান ঘটিত সার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও এই সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে পটাশ্-সার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সকল ছাইয়ে সমান পরিমাণে পটাশ্ থাকে না। নব-পল্লব ও পত্র শুষ্ক করিয়া, জ্বালাইয়া, যে ক্ষার পাওয়া যায় উহাতে শতকরা ১৪।১৫ ভাগ পটাশ্ থাকে; বিচালি জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ৪।৫ ভাগ মাত্র পটাশ্ থাকে, কাষ্ঠ জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে আরও কম পরিমাণ পটাশ্ থাকে। সকল রকম ক্ষার মিশ্রিত করিলে গড়ে শতকরা ১০।১১ ভাগ পটাশ্ উহার মধ্যে আছে এরূপ ধরা যাইতে পারে।

৫ম, চূণ-সার, অর্থাৎ, যাহাতে শতকরা ৫ ভাগের অধিক খাঁটি চূণ আছে; যথা, চূণ, শম্বুক, ঝিনুক, ঘুটিং, জিপ্‌সম্, ইত্যাদি।

ফস্ফরাস্, যবক্ষারজান, পটাশ অথবা চূণ-ঘটিত সারকে **বিশেষ-সার** বলা যাইতে পারে। অনেকগুলি বিশেষ সারের দ্বারা সাধারণ সারেরও কার্য্য হইয়া থাকে। হাড়ের গুঁড়া প্রধানতঃ ফস্‌ফরাস্-ঘটিত

সার বটে, কেননা ইহাতে শতকরা ২৩।২৪ ভাগ ফস্‌ফরাসাম্ল বিদ্যমান। কিন্তু হাড়ের গুঁড়াতে ৩।৪ ভাগ যবক্ষারজান,, সামান্য পরিমাণে পটাশ্‌ ও বিশেষ পরিমাণে চূণও বিদ্যামান আছে। কাযেই এই সার প্রয়োগ করাতে ফসলের সকল অভাব দূর হইতে পারে। হাড়ের গুঁড়ার দোষ এই, ইহাতে গলিত বা গলনশীল ভাবে অতি সামান্য পরিমাণ উপাদান বর্ত্তমান থাকে, কাজেই ইহার প্রয়োগ দ্বারা হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না। অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া এই সার জমির কিছু কিছু উপকার করিয়া থাকে। সাল্‌ফিউরিক এসিড্‌ দ্বারা হাড়ের গুঁড়া ও এপে-টাইটাদি প্রস্তরের গুঁড়া গলনশীল অবস্থায় পরিণত করিয়া ব্যবহার করিলে ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।

সারের উপযোগিতা।—কোন্ শ্রেণীর সার কোন্ ফসলে কি পরিমাণে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ইহা কৃষক দিগের জানা বিশেষ আবশ্যক। কলাই বা আমনধান্যে সোরা-সার অথবা আশুধান্যে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিয়া কোন লাভ নাই। কোন্ শ্রেণীর সার হইতে কিরূপ ফল আশা করা যাইতে পারে ইহা জানা বিশেষ আব-শ্যক। যবক্ষারজান-ঘটিত সারের প্রধান গুন, ইহা পত্রোদ্গমনের সহায়তা করে। অনেক স্থলে দেখা যায়, গাছগুলি বেশ বাড়ে, পাতায় ভরিয়া থাকে, কিন্তু ফুল ও ফলের পরিমাণে কম হয় অথবা কোন কোন গাছে আদৌ হয় না। এরূপ স্থলে যবক্ষারজানের পরিমাণ অধিক এবং ফস্‌ফরাস ঘটিত সারের অভাব আছে ইহাই স্থির করিতে হইবে। যবক্ষারজানের আধিক্যের দ্বারা যে ক্ষতি হয় তাহা নিবারণের একটী উপায় জমিতে বিঘাপ্রতি পাঁচ সের লবণ ছিটান; আর একটী উপায় হাড়ের গুঁড়া বা এপেটাইটের গুঁড়া, অথবা নিতান্ত

পক্ষে ছাই প্রয়োগ করা। লেবু, আম, ইত্যাদি ফলগাছে যদি ফল না ধরে তাহা হইলে গাছ গুলির গোড়া হইতে কিছু অন্তরে চারিদিকে খানা খুঁড়িয়া দিয়া, গাছের কতক শিকড় কাটিয়া দিয়া খানার মধ্যে কয়েক খানা হাড় অথবা কতকটা ছাই ছিটাইয়া দিয়া খানা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যে সকল ফসলের কেবল পাতা ব্যবহৃত হয় (যথা, তুঁত, শাক, পান, বাঁধাকপি, ইত্যাদি) ঐ সকলের পক্ষে সোরা, খোল, রক্ত, মাংস, প্রভৃতি যবক্ষারজান-ঘটিত সার বিশেষ উপযোগী। যব-ক্ষারজান-ঘটিত সার সকলের মধ্যে, এদেশে, তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রথম অবস্থায় যদি ভালরূপ বাড়িতেছে না এরূপ বোধহয়, এবং ঐ সময়ে যদি অধিক বৃষ্টি হইয়া সার ধৌত হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সোরা প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ফাল্গুন-চৈত্রমাসে নূতন ইক্ষু-ক্ষেত্রে, চৈত্র-বৈশাখমাসে ভুট্টার ও আশুধান্যের ক্ষেত্রে, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে বাঁধা-কপি গম, যব ও যই-য়ের ক্ষেত্রে, সোরা-সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আউশধান, গম, যব ও যইয়ের জন্য বিঘা প্রতি অৰ্দ্ধমণ সোরা অন্ততঃ দুই গাম্‌লা (২০০ সের আন্দাজ) জলে মিশাইয়া জমিতে ছিটাইয়া দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। এই সার-প্রয়োগের পর সামান্য রূপ বৃষ্টি হইলে সার মাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং উপকার অধিক হয়; কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে জমির আইল ছাপিয়া জল বাহির হইয়া গিয়া সার ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। সোরা মৃত্তিকাকে অধিক গলনশীল অবস্থায় আনিতে সক্ষম বলিয়া সোরা প্রয়োগের পরে অধিক বৃষ্টি হইলে মৃত্তিকার স্বাভাবিক সারও অনেক বাহির হইয়া গিয়া উহা পূর্ব্বোপেক্ষাও নিস্তেজ হইয়া যায়। এ কারণ সোরা-সার প্রয়োগ অনেকদিক লক্ষ্য করিয়া করা উচিত। উপর্য্যুপরি একই

ভূমি-খণ্ডে দুই তিন বৎসর ধরিয়া সোরা-সার প্রয়োগ দ্বারা জমির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসরে একবার এক খণ্ড জমিতে সোরা-সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাড়ের গুঁড়া অথবা কোন সাধারণ সারের সহিত মিলিত করিয়া সোরা ব্যবহার করিলে মৃত্তিকার ক্ষতি হয় না। ইক্ষু, ভুট্টা ও জুয়ারের উপর গাছের প্রথম অবস্থায় বিঘা প্রতি দেড়মণ পর্য্যন্ত সোরা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাঁধা, কপির জন্য বিঘা প্রতি ৩।৫ মণ সোরা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সোরা গাছের গায়ে লাগিলে পাতা জ্বলিয়া যায়; একারণ গাছের সারির মধ্যস্থিত মৃত্তিকার উপরেই সোরা প্রয়োগ আবশ্যক। বাঁধা-কপির জমিতে সোরা-প্রয়োগ করিবার পরেই জল সেচন করা উচিত, কেন না ঐ সময়ে বৃষ্টি পাতের সম্ভাবনা অতি অল্প। ধান্য, গোধুম, যব, যই, ইত্যাদি ফসলে বিঘা প্রতি ৫।৭ সের; ইক্ষু, ভুট্টা, তুঁত, পান শাক, গিনি-ঘাস, জুয়ার, ইত্যাদি ফসলে বিঘা প্রতি ১২ হইতে ২৪ সের, এবং বাঁধা-কপিতে বিঘা প্রতি ৩০ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিলে ফসল গুলির দ্বারা জমির যে পরিমাণ যবক্ষারজান ব্যয় হইতে পারে উহা সমস্তই পূরণ করা হয়। কোন্ সামগ্রীতে যবক্ষারজানের পরিমাণ কত আছে ইহা জানা থাকিলে কত ওজনের ঐ সকল সামগ্রী ব্যবহার দ্বারা ক্রমান্বয়ে ৫.৭ সের ১২।২৪ সের ও ৩০ সের যবক্ষার-জান প্রয়োগ করা হইল, ইহা সহজেই স্থির করিয়া লওয়া যায়। রিফাইন্ করা সোরার মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ আন্দাজ যবক্ষারজান থাকে। বিঘাপ্রতি পাঁচ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে প্রায় একমণ রিফাইন্ করা সোরার ব্যবহার আবশ্যক; ১৬ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে তিন মনেরও অধিক সোরার

ব্যবহার আবশ্যক, এবং ৩০ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে ৫২- মন সোরার ব্যবহার আবশ্যক। কিছু যবক্ষারজান মৃত্তিকার সর্ব্বদাই থাকে; কিছু যবক্ষারজান বায়ু হইতে ও বৃষ্টি সহকারেও মৃত্তিকায় আসিয়া থাকে। একারণ যে পরিমাণ সোরার প্রয়োগ আবশ্যক বলা হইল, উহা অতিরিক্ত। এখন দেখা যাউক কি পরিমাণ পচা গোবর-সার ব্যবহার দ্বারা ক্রমান্বয়ে বিঘাপ্রতি (ক) ৫ সের (খ) ১৬ সের ও (গ) ৩০ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করা হয়। পচা গোবর-সারে শতকরা ০·৬ ভাগ অর্থাৎ ⅗ ভাগ যবক্ষারজান থাকা সম্ভব। একারণ

(ক) ⅗ সের : ৫ সের : : ১০০ সের : ক : ক = $\frac{৫ \times ১০০ \times ৫}{৩}$

= ৮৩৪ সের

প্রায় ২১ মণ;

(খ) ⅗ সের : ১৬ সের : : ১০০ সের : খ

: খ = $\frac{১০০ \times ১৬ \times ৫}{৩}$ = ২৬৬৬ সের

= প্রায় ৬৬/ মণ;

(গ) ⅗ সের : ৩০ সের : : ১০০ সের : গ

: গ = $\frac{১০০ \times ৩০ \times ৫}{৩}$

= ৫০০০ সের = ১২৫/ মণ।

এখন দেখ, কতক এই গোবর-সার সোরার ন্যায় গলিত অবস্থায় না থাকিবার কারণ একই ফসলে ব্যবহার হইয়া না গিয়া দুই তিনটী ফসলের কাযে লাগিয়া যায়। ধান্যে বিঘা প্রতি যদি অর্দ্ধমণ সোরা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ সোরার পাঁচ সের যবক্ষারজান সমস্তই হয় ফসলের মধ্যে চলিয়া গিয়া, অথবা কিছু ধৌত হইয়া

জমি হইতে বাহির হইয়া গিয়া, ব্যবহার ইহয়া যায়। কিন্তু ধান্তে যদি ২১/ মণ গোবর-সার প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ সারের পাঁচ সের যবক্ষারজানের হয়ত তিন সেরেরও কম প্রথম ফসলের ব্যবহারে আসিয়া থাকে। কাযেই অর্দ্ধমণ সোরা প্রযোগ দ্বারা যে ফল চাক্ষুষ হইবে ২১/ মণ গোবর-সার প্রয়োগ দ্বারা সে ফল চাক্ষুষ হইবে না। অর্দ্ধমণ সোরার কার্য্য গোবর-সার হইতে একই ফসলে পাইতে হইলে ২১/মণের পরিবর্ত্তে ৪০/ মণ ব্যবহার করা আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে, গোবর-সার অপেক্ষাকৃত অদ্রব অবস্থায় থাকাতে দ্বিগুণ পরিমাণ ইহার ব্যবহার আবশ্যক, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে ৫ সের, ১৬ সের ও ৩০ সের সোরার কার্য্য গোবর-সার হইতে পাইতে গেলে ৪২/মণ ১৩২/মণ, ও ২৫০/ মণ, অথবা মোটামুটী ক্রমান্বয়ে ৪০ মণ, ১৩০ মণ, ও ২৫০/মণ গোবর-সারের আবশ্যক। ধান্তের বা গোধুমের ক্ষেত্রে বিঘাপ্রতি ৪০/মণ বা ১০০ ঝুড়ি, তুঁতের ক্ষেত্রে বিঘাপ্রতি ১৩০/মণ বা ৩০০ ঝুড়ি এবং ইক্ষু, বা আলু, বা বাঁধা-কপির ক্ষেত্রে ২৫০/মণ বা ৬০০ ঝুড়ি, গোবর-সার ব্যবহার করা আবশ্যক।

হাড়ের গুঁড়ায় শতকরা ৩।৪ ভাগ যবক্ষারজান আছে, কিন্তু এই সার গোবর-সার অপেক্ষাও কঠিন বা অদ্রব অবস্থায় আছে বলিয়া, গোবর সারের অপেক্ষাও অধিকতর অনুপাতে এই সারের প্রয়োগ আবশ্যক। যবক্ষারজান প্রয়োগাভিপ্রায়ে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিতেই নাই। যদি করিতে হয় তাহা হইলে অনেক অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে সোরা বা গোবর-সারের ন্যায় ফল পাওয়া যায় না। গন্ধক-দ্রাবক দ্বারা হাড়ের গুঁড়া দ্রব করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। ফস্ফরাস্ প্রয়োগাভি

প্রায়েই হাড়ের গুঁড়ার ব্যবহার হইতে পারে। হাড়ের গুড়া যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে হাড় দগ্ধ করিয়া লইয়া ভষ্ম জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয়।

যবক্ষারজান-ঘটিত সার।—যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাদের মধ্যে শতকরা হিসাবে যে পরিমাণ সার-ভাগ সকল বিদ্যমান আছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।—

(১) সাল্‌ফেট্-অব্-এমোনিয়াতে—শতকরা হিসাবে ২০ ভাগ যবক্ষারজান থাকে।

(২) সোডিয়াম্ নাইট্রেটে ... ... ১৫।১৬,, ,, ,,

(৩) এদেশীয় ময়লা সোরাতে যবক্ষার জানের ভাগ শতকরা ২ হইতে ১৩ ভাগ পর্য্যন্ত এবং ৭ হইতে ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশের ভাগ থাকিতে পারে। খাঁটি সোরাতে ১৪ ভাগ যবক্ষারজান ও ৩৯ ভাগ পটাশ থাকে।

(৪) মৎস্যে (শুঁট্‌কি মাছে) শতকরা ৬।৭ ভাগ যবক্ষারজান, ৬ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল-সার ও এক ভাগের কিছু কম পটাশ্ থাকে।

(৫) রেড়ির খোলে শতকরা ৬ হইতে ৮ ভাগ যবক্ষারজান, ২ হইতে ৩½ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল এবং ২½ ফাগ পটাশ্ থাকে।

(৬) খোসা ছাড়ান কার্পাসের বীজের খোলে ৬।৭ ভাগ যবক্ষারজান ও ৩।৪ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(৭) সর্ষপখোলে ৫½ ভাগ যবক্ষারজান ও ২।৩ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(৮) মসিনার খোলে ৪½ বা ৫ ভাগ যবক্ষারজান ও ১½ হইতে ৩ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(৯) পোস্তো-দানার খোলে ৭ ভাগ যবক্ষারজান ও ৩ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(১০) চীনাবাদামের খোলে ৭½ ভাগ যবক্ষারজান ১ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল ও ½ ভাগ ভাগ পটাশ্ থাকে।

(১১) কুসুম ফুলের বীজের খোলে ৫।৬ ভাগ যবক্ষারজার ও ২ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(১২) তিলের খোলে প্রায় ৫ ভাগ যবক্ষার জান, ২ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল সার ও ১ ভাগ পটাশ থাকে।

(১৩) রেশম কুঠির চোক্ড়িতে (শুষ্ক অবস্থায়) ৭½ ভাগ যবক্ষারজান, ১ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল ও ১½ ভাগ পটাশ্ থাকে।

ফস্ফরাস্-ঘটিত-সার।—জমিতে ফস্ফরাস্ প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে, উহাদের মধ্যে কি পরিমাণ সারভাগ বর্ত্তমান আছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

(১) অস্থিতে শতকরা হিসাবে ২১ ভাগ ফস্ফারকাম্ল-সার (P_2O_5), ২৮ ভাগ চুণ, ৩½ ভাগ যবক্ষারজান ও অতি সামান্য পটাশ্ থাকে।

(২) অস্থি-সুপার* বা গন্ধকদ্রাবক দ্বারা গলিত অস্থি-চূর্ণে ২৩ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল, ২৮ ভাগ চুণ, ২½ ভাগ যবক্ষারজান ও যৎসামান্য পটাশ্ থাকে।

(৩) মৎস্যে (শুঁট্‌কি মাছ) ৬ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল, ৬।৭ ভাগ যবক্ষারজান ও প্রায় ১ ভাগ পটাশ্ থাকে।

---

* সুপার-সাল্ফেট-অব এমোনিয়া, নাইট্রেট-অব সুপার,-সোডা, কাইনিট্ প্রভৃতি সার কলিকাতার ওয়াল্ডি কোম্পানীর দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

(৪) শুষ্ক পত্র ও পল্লবের ক্ষারে ৪।৫ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল ও ১১।১২ ভাগ পটাশ থাকে।

(৫) কার্পাসের বীজের খোসার ক্ষারে ৫ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্ফরিকাম্ল এবং ১৮ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশ্ থাকে।

(৬) এপোটাইট্ প্রস্তরে ৩০।৪০ ভাগ ফস্ফরিকাম্লসার থাকে।

(৭) লোহা ঢালাইয়ের কারখানার গাদে প্রায় ৩৫ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল সার পাওয়া যায়।

(৮) ত্রিচিনাপল্লিতে প্রাপ্তব্য এক প্রকার পাথরের নুড়িতে ৩০।৩৫ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল-সার পাওয়া যায়।

(৯) এই প্রস্তর অথবা এপেটাইট্ প্রস্তর গুঁড়া করিয়া গন্ধক-দ্রাবক দ্বারা দ্রব করিয়া লইলে প্রস্তর-সুপার প্রস্তুত হয়।

ফস্ফরাস্-ঘটিত সারগুলির প্রধান গুণ, পুষ্প ও ফলোৎপাদনের প্রবৃত্তি এই জাতীয় সারের দ্বারা বাড়িয়া থাকে, এবং ইহা দ্বারা ফলের মিষ্টতা ও বৃদ্ধি হয়, এবং ফল বা ফসল শীঘ্র পাকিয়া যায়।

পটাশ্-ঘটিত সার।—জমিতে পটাশ্ প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) কাইনিটে শতকরা হিসাবে ১৩ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশ্ (K_2O) থাকে।

(২) দগ্ধ কাইনিটে ১৭।১৮ " " " "

(৩) ডাল পালা দগ্ধ করিয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ৫।৭ ভাগ, "

(৪) খড়ের ক্ষারে ৪½ ভাগ " " " "

(৫) পাতা জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ১১।১২ ভাগ "

(৬) তামাকের শুষ্ক ডালে ও শিরে ৫ ভাগ পটাশ, ½ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল ও ৩½ ভাগ যবক্ষারজান থাকে।

(৭) মেষের প্রস্রাবে ২।৩ ভাগ পটাশ্ থাকে।

(৮) খাঁটি সোরায় ৩৯ ভাগ পটাশ্ ও ১৪ ভাগ যবক্ষারজান থাকে।

(৯) ময়লা দেশী সোরায় কেবল ৭ ভাগ মাত্র যবক্ষারজান থাকিতে পারে। রিফাইন্ করা সোরা ব্যবহার করাই ভাল। কলিকাতার বাজারে রিফাইন্ করা সোরা ৬।৭ টাকা দরে মণ বিক্রয় হয়। ময়লা সোরা বিহার অঞ্চল হইতে আনিতে হইলে ৩৲।৪৲ টাকা মণ দাম লাগা সম্ভব এবং এতদ্ব্যতীত আনিবার খরচও আছে। এই ময়লা সোরায় অতি সামান্য মাত্র সার-পদার্থ থাকিতে পারে।

(১০) রেড়ি, কার্পাস বীজ ইত্যাদি বীজের খোসা দগ্ধ করিয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ১৮ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশ্ ও ৫ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্ফরিকাম্ল থাকিতে পারে।

(১১) গোরুর আহারানুসারে ঘুঁটের ছাইয়ে সার পদার্থগুলির পরিমাণের অনেক তারতম্য হইয়া থাকে। যে গোরু কেবল ঘাস খাইয়া থাকে উহার নাদির ঘুঁটের ছাইয়ে ১১।১২ ভাগ পটাশ্ থাকিতে পারে। যে গোরু খড়, ভুসি ও খোল খাইয়া থাকে উহার ঘুঁটের ছাইয়ে কেবল ৫ ভাগ পটাশ্ থাকা সম্ভব।

(১২) গোলাপী রংএর ফেল্স্পার প্রস্তরে ৬।৭ ভাগ পটাশ থাকিতে পারে।

পটাশ্-সারের প্রধান গুণ, ইহা দ্বারা পত্রোদ্গমণের সহায়তা, শ্বেত-সার ও অম্ল-রসের সঞ্চয় ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হয়।

সাধারণ-সার।—জমিতে যবক্ষারজান, ফস্ফরাস্, পটাশ্, চূণ, লৌহ, ম্যাগ্নিশিয়া, ম্যাঙ্গেনিজ্ ইত্যাদি সমস্ত উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থ প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে সাধারণ-সার ব্যবহার করা যাইতে পারে ঐ গুলির মধ্যে কি কি পরিমাণ সার-পদার্থ থাকা সম্ভব তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

		যবক্ষারজান	ফস্ফরিকাম্ল	পটাশ্
(১)	মনুষ্যের মল-মূত্র	০·৭২	০·৬২	০·২১
(২)	ঘোড়ার নাদি	০·৪৫	০·৩২	০·৩৫
(৩)	ঘোড়ার মল-মূত্র ও বিচালি (পচা)	১·৪৫	০·২১	০·৫২
(৪)	গোময় (টাট্‌কা)	০·১৪	০·১৫	০·২৫
(৫)	পচা গোময়-সার	০·৫৮	০·৩০	০·৫০
(৬)	গোরুর চোনা	০·৯	০·০১	১·৩০
(৭)	ঘোড়ার প্রস্রাব	১·৫০	০·০১	১·৬০
(৮)	মেষের নাদি	০·৭০	০·৫০	০·১০
(৯)	মেষের প্রস্রাব	১·৩০	০·০২	২·৫০
(১০)	গৃহপালিত হংসাদি পক্ষীর নাদি	০·৫৫	০·৫৪	০·৯৫
(১১)	পলুর নাদি	১·৪৪	০·২৫	০·১১
(১২)	পলুর চোকৃড়ি (টাট্‌কা)	১·৫০	০·২১	০·৪০
(১৩)	ঐ (শুষ্ক)	৭·৪৭	০·৯৮	০·৪৫

(১৪) খোল (যবক্ষারজানঘটিত সারের তালিকা দেখ)।

(১৫) শুষ্ক মৎস্য (যবক্ষারজান ঘটিত সারের তালিকা দেখ)।

(১৬)	বাঁশের পাতা	...	০·৬৬	০·০১	০.৩৫
(১৭)	ধানের বিচালি	...	০·৬৩	০·১১	০·৮৫
(১৮)	গমের বিচালি	...	০·৪৮	০·২২	০·৬৩
(১৯)	যবের খড়	...	০·৬৪	০·১৯	১·০৭
(২০)	ভুট্টার ডাঁটা (শুষ্ক)	...	০·৪৮	০·৩৮	১·৬৪
(২১)	ঘাস (টাট্‌কা)	...	০·৫৪	০·১৫	০·৪৬
(২২)	নীল সিটি	...	০·৬৩	০·৯২	০·৪৭

(২৩)	ঘুঁটে ...	১·৪৮	০·৫৪	০·৬৫
(২৪)	পুষ্করিণীর দাম (শুষ্ক ও পুরাতন)	১·৬৪	০·৪২	১·৭৭

চুণ-সার।—ঘুটিং, শামুক, খড়িমাটি, মার্ব্বেল পাথর ও অন্যান্য চুণা-পাথর দগ্ধ করিয়া চূণ হয়। জমিতে চুণ ছিটাইলে পোকা ও উদ্ভিদ রোগের বীজ নষ্ট হয়। পাতার গাদায় চুণ ছিটাইয়া দিলে পাতা শীঘ্র পচিয়া পত্র-সারে (leaf mould) পরিণত হয়। ধনিচা, শন, ইত্যাদি গাছ কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া জমির মধ্যে লাঙ্গল দিয়া মিশাইয়া দিয়া বিঘা প্রতি দুই মণ চুণ ছিটাইয়া দিলে গাছগুলি শীঘ্র পচিয়া মাটির সহিত মিলিত হয়। ৭ বৎসর অন্তর বিঘা প্রতি ১৪/ মণ চুণ ছিটাইলে বোদ-মাটি, অম্লরসযুক্ত পাঁক-মাটি, জঙ্গল মহলের মাটি, প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ-পূর্ণ মাটি বিশেষ উর্ব্বর হইয়া থাকে। অনুর্ব্বর মৃত্তিকাতে চুণ-সার কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। লোণা মাটির ভাঁটিতে সদ্যঃ দগ্ধ চুণ ব্যবহার না করিয়া শামুক, ঘুটিং বা চুণা-পাথরের গুঁড়া ব্যবহার করা উচিত। চুণ দ্বারা উদ্ভিদণু নষ্ট হয়। এ জন্য চুণ ব্যবহার দ্বারা ভাঁটিতে যবক্ষারজানোৎপাদনের সুবিধা না হইয়া বরং ব্যাঘাত ঘটে; ধান, গম, প্রভৃতি তৃণজাতীয় ফসল জন্মাইবার কারণ জমি হইতে অতি সামান্য পরিমাণ চুণ (অর্থাৎ, বিঘা প্রতি এক সের মাত্র) খরচ হইয়া থাকে। মটর প্রভৃতি কলাই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইবার কারণ জমি হইতে উহার পাঁচগুণ (অর্থাৎ বিঘা প্রতি পাঁচ সের আন্দাজ) চুণ বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের আহার মাত্র যোগাইবার কারণ কোন জমিতেই চুণ ছিটাইবার আবশ্যক করে না। যে জমিতে শতকরা ০·১ ভাগ মাত্র চুণ-উপাদান বর্ত্তমান, হিসাব করিলে দেখা যাইবে এক ফুট মৃত্তিকার মধ্যে বিঘা প্রতি সে জমিতেও ৫০০ সের চুণ মজুত আছে। পোকা-

মারা, উদ্ভিদ্-রোগ নাশ করা, মৃত্তিকার অম্লত্ব দূর করা, আঁট্ মৃত্তিকাকে হাল্কা করা, উর্ব্বর মৃত্তিকার উর্ব্বরতা আদায় করা, মৃত্তিকার যবক্ষারজান সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, ফসল শীঘ্র পাকাইয়া লওয়া, পত্র-সার প্রস্তুত করা, কাঁচা-সার পচান, কলাই জাতীয় ফসলের উন্নতি-সাধন করা, এই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যে চূণ সাররূপে ব্যবহায় করা যাইতে পারে। নিম্নোক্ত জমিতে চূণ কথনই ব্যবহার করা উচিত নহে।

(১) ঘুটিংএ ৫০ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত চূণ থাকে।

(২) চূণা-পাথরে ও শম্বুকাদিতে ইহা অপেক্ষাও অধিক চূণ থাকে।

(৩) অস্থির মধ্যে ২৮ ভাগ চূণ থাকে।

(৪) টাট্‌কা গোময়ে ০.২৮ ভাগ চূণ থাকে।

(৫) খুঁটের মধ্যে ২ ভাগ চূণ থাকে।

লবণ-সার।—যেমন চূণ-সার দ্বারা কলাই জাতীয় উদ্ভিদের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে সেইরূপ লবণ-সার দ্বারা এই জাতীয় উদ্ভিদের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। এ কারণ সমুদ্র হইতে ৫০ ক্রোশ অন্তরের মধ্যে অড়হর, কলাই, ছোলা, মুগ ইত্যাদি ভাল জন্মে না। কিন্তু যে জমিতে চূণের ভাগ অধিক ঐ জমিতে লবণ সাররূপে ব্যবহার করিলে কোন কোন ফসলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহার প্রধান উদাহরণ কার্পাস। যে জমিতে চূণের ভাগ অধিক ঐ জমিতে কার্পাস জন্মাইতে হইলে বিঘা প্রতি অর্দ্ধ মণ লবণ সাররূপে ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে কার্পাসের ফল অধিককাল স্থায়ী ও অধিক হয়, এবং দৃঢ় আঁইশ ও লম্বা হয়। কার্পাসের

আঁইশের উন্নতি সাধন করিতে গেলে এই বিশেষ উপায়টী অবলম্বন করা উচিত।

উদ্ভিদ্-রোগ, জোঁক, শামুক, ইত্যাদি মারিতে গেলে বিঘা প্রতি এক মণ লবণ ব্যবহার করা উচিত। যে জঙ্গল মহলের মৃত্তিকা সমুদ্র তীর হইতে ৫০ ক্রোশের অধিক দূরে অবস্থিত, অর্থাৎ যাহাতে লবণের ভাগ অধিক থাকা সম্ভব নহে, সে জমিতে চুণ দিয়া যেরূপ উপকার পাওয়া যায় লবণ দিয়াও সেইরূপ উপকার পাওয়া যায়। জমির উর্ব্বরতা আদায় করিয়া লইবার দুইটী প্রধান উপায়, চুণ ও লবণ সাররূপে ব্যবহার করা। ইহা দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি পদার্থের সারভাগ সকল সত্বর গলিত হইয়া ফসলের পোষণোপযোগী অবস্থায় সহজে পরিণত হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা ফসলের উপকার ও জমির অপকার করা হয়। এ কারণ নিস্তেজ জমিতে চুণ বা লবণ কথনই সাররূপে ব্যবহার করা উচিত নহে। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ ফসলে বিঘা প্রতি এক মণ লবণ সাররূপে ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। বাঁধা কপি, ফুল কপি, বীট, ম্যানূগোল্ড, যব, টোমাটো বা গুড়-বেগুন, পেঁয়াজ, শতমূলী, ব্রেড্-ফ্রুটের গাছ, আম গাছ, নারিকেল গাছ, খর্জ্জুর গাছ, হিজ্‌লি বাদামের গাছ। উক্ত কয়েক প্রকার গাছের গোড়ায় গোড়ায় পুতিবার পরবৎসর লবণ-সার দেওয়া উচিত, সমস্ত জমিতে লবণ ছিটাইয়া দিলে তেমন ফল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এক বিঘাতে যদি ১২০টী নারিকেল গাছ লাগান হয় তাহা হইলে সমস্ত জমিতে এক মণ লবণ ছিটাইয়া না দিয়া, গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিক খুঁড়িয়া দিয়া প্রত্যেক গাছের তলে ⅓ সের করিয়া লবণ প্রয়োগ করিলে ফল অধিক পাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে (অর্থাৎ ৫০ ক্রোশের মধ্যে) লবণ-সার ব্যবহার করা কোন আবশ্যক

নাই। বায়ু-সহকারে সমুদ্রের জলকণা ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত অন্তরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।

সার প্রয়োগের পরিমাণ।—সকল ফসল জমি হইতে সমান পরিমাণ সারবান পদার্থ গ্রহণ করে না; এ কারণ কোন ফসল জন্মানতে জমির সামান্য ক্ষতি হয়, কোন ফসল জন্মানতে জমির অধিক ক্ষতি হয়, এবং কোন ফসল জন্মানতে জমির ক্ষতি না হইয়া উপকার হয়। কোন ফসল জন্মানর কারণ জমির ক্ষতিপূরণার্থে অধিক সার প্রয়োগের আবশ্যক, কোন ফসল জন্মার কারণ জমির ক্ষতিপূরণার্থে অতি সামান্য সার প্রয়োগের আবশ্যক, আবার কোন ফসল জন্মানর কারণ সার প্রয়োগ দ্বারা জমির ক্ষতিপুরণ আদৌ আবশ্যক করে না। কোন্ সারে কত যবক্ষারজান, বা কত ফস্ফরিকাম্ল বা কত পটাশ্ আছে এ বিষয়ের বিচার বিশদরূপেই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ ফসল জন্মানর কারণ জমি হইতে কত যবক্ষারজান, ফস্ফরিকাম্ল ও পটাশ্ বাহির হইয়া যায় ইহা না জানা থাকিলে, কোন একটী সার প্রয়োগের মাত্রা স্থির হইতে পারে না। আর এক কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৮/ মণ ধান ও ৮/ মণ খড় জন্মাইবার কারণ জমি হইতে যে পরিমাণ যবক্ষারজান, ফস্ফরিকাম্ল ও পটাশ্ বাহির হইয়া যায়, বিঘা প্রতি ১৬/ মণ ধান ও ১৬/ মণ খড় জন্মিলে উহার দ্বিগুণ সার-পদার্থ সকল বাহির হইয়া যাইবে। কি পরিমাণে কোন্ ফসল জন্মাইলে জমির কি পরিমাণে কত সার পদার্থ বাহির হইয়া যায় উহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। এই তালিকা দৃষ্টে এবং পূর্ব্বদত্ত সার সমুদায়ের তালিকা দৃষ্টে, কোন একটী সার কোন্ শ্রেণীর ফসলের জন্য কি পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে ইহা হিসাব করিয়া লওয়া দুরূহ নহে।

ফসল জন্মান দ্বারা একার প্রতি জমির ক্ষতি।

ফসল।	শস্তের পারমাণ।		খড়, ভুসা ইত্যাদির পরিমাণ।		যবক্ষার জানের ব্যয়।		ফস্‌ফরিকাম্লের ব্যয়।		পটাশের ব্যয়।	
১। ধান্য	৩০/	মণ	৩০/	মণ	১২	সের	৭	সের	১৩	সের
২। গোধুন	২৪/	,,	৩৩/	,,	২৮	,,	১১	,,	১৫	,,
৩। যব	২২/	,,	৩৫/	,,	২২	,,	১০	,,	১৮	,,
৪। যই	২৭/	,,	৩৫/	,,	২৬	,,	১০	,,	২৮	,,
৫। ভুট্টা	৩২/	,,	৫৫/	,,	৩২	,,	১৪	,,	৩৮	,,
৬। কাপর	১৮/	,,	২৪/	,,	১৬	,,	১৪	,,	৪	,,
৭। আলু	১৫০/		২০/	,,	২৪	,,	১১	,,	৪০	,,
৮। বীট্‌	৪০০/	,,	৮০/	,,	৩৫	,,	১৬	,,	৭০	,,

৯। ম্যান্‌গোল্ড	৬০০/ ,,	১৬০/ ,,	৭৫ ,,	২৩ ,,	১৩০ ,,
১০। ঘাস		৯০/ ,, (শুষ্কঘাস)	৪০ ,,	১১ ,,	৪১ ,,
১১। জুয়ার		২৫০/ (কাচা ডাঁটা)	৬০ ,,	১২ ,,	৭৫ ,,
১২। ইক্ষু		৫০০/ মণ (ইক্ষু)	৭০ ,,	৬½ ,,	২০ ,,
১৩। কার্পাস	৯/ মণ (বীজ)	৩/ মণ তুলা)	১৯ ,,	৪½ ,,	৫ ,,
১৪। তামাক	২০/ ,, (পাতা)	১৭/ ,, (ডাঁটা)	৪৫ ,,	১২ ,,	৫২ ,,
১৫। বাঁধা-কপি	৯০০/ ,,		৮০ ,,	৪৫ ,,	১৮০ ,,
১৬। পেঁয়াজ	৪২/ ,,	——	৩৬ ,,	১৮ ,,	৩৬ ,,

উদাহরণ।—যদি নিস্তেজ জমিতে একার প্রতি ৪২/ মণ, অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১৪/ মণ আন্দাজ, পেঁয়াজ পাইতে হয়, তাহা হইলে একার প্রতি ৩৬ সের অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ১২ সের আন্দাজ যবক্ষারজান প্রয়োগ করা আবশ্যক। যদি পচা গোময় সার ব্যবহার দ্বারা এই পরিমাণ যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে বিঘাপ্রতি কি পরিমাণ গোময় ব্যবহার করা আবশ্যক হইবে দেখা যাউক। সাধারণ সারের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে পচা গোবর-সারে শতকরা ০·৫৮ ভাগ যবক্ষারজান থাকা সম্ভব, অর্থাৎ ০·৫৮ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে ১০০ সের পচা গোময় ব্যবহার করা উচিত। অতএব ১২ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে ৫১ মণ সার প্রয়োগ আবশ্যক। (০·৫৮ : ১২ :: ১০০ : কসের =

$$\frac{১০০ \times ১২ \times ১০০}{৫৮}$$

= ২০৬৯ সের

= আন্দাজ ৫১/ মণ)।

কিন্তু গোবর-সার পচা অবস্থাতেও সম্পূর্ণ দ্রব-সার নহে, অর্থাৎ ইহা যে ফসলে প্রয়োগ করা যাইবে ঐ ফসল সারের উপাদান গুলি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে না পারিয়া অর্দ্ধা-অর্দ্ধি রকমে ব্যবহার করিতে পারে। এ কারণ বিঘা প্রতি ১৪/মণ পেঁয়াজ পাইতে হইলে ১০০/মণ আন্দাজ পচা গোবর-সার ব্যবহার করা উচিত। পেঁয়াজে পচা গোবর-সার কি পরিমাণ দেওয়া উচিত ইহা জানিতে হইলে আর দুইটী উপাদানের দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। পচা গোময়ে শতকরা ০·৩০ ভাগ আন্দাজ ফস্ফরিকাম্ল আছে, অর্থাৎ যে পরিমাণ যবক্ষারজান আছে তাহার অর্দ্ধেকের কিছু অধিক। পেঁয়াজ

জন্মাইতে হইলে যে পরিমাণ যবক্ষারজান আবশ্যক ঠিক্ তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ফস্ফরাস্ আবশ্যক; কাযেই ১০০ মণ গোবর-সার ব্যবহার দ্বারা বিঘাপ্রতি যদি ১২ সের যবক্ষারজান দ্রব অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ অন্ততঃ ৬ সের ফস্ফরিকাম্লও প্রয়োগ করা হইবে। কিন্তু পটাশের বিষয় অবধান করিলে দেখা যাইবে যে পেঁয়াজের জন্য যত যবক্ষার-জান প্রয়োগ আবশ্যক তত পটাশের প্রয়োগও আবশ্য। পচা গোবর সারে যে পরিমাণ যবক্ষার-জান আছে তাহার কিছু কম পটাশ আছে। এ কারণ বিঘাপ্রতি ১০০৲মণ গোবর-সার ব্যবহার করিয়া ও ১০।১৫ ঝুড়ি ছাই ছিটাইতে পারিলে পেঁয়াজের বিশেষ উপকার হয়। বস্তুতঃ কার্য্যেও পেঁয়াজ জন্মাইতে কিছু ছাই সাররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। বিনা সারে উর্ব্বর জমিতে যদি বিঘাপ্রতি ১৪৲মণ পেঁয়াজ জন্মান যায় তাহা হইলে জমির ক্ষতি পূরণ করিতে বিঘাপ্রতি ৫০৲মণ পচা গোবর-সার ও ৪।৫ ঝুড়ি ছাই ব্যবহার করিয়া জমি পূর্ব্বাবস্থায় লইয়া আসা যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। ফসলের কোন্ কোন্ উপাদান যোগাইবার জন্য সার-প্রয়োগ আবশ্যক?

২। কতকগুলি সহজ-লভ্য সারের নাম কর।

৩। ফসল জন্মাইতে জন্মাইতে জমি যে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যায় তাহার কোন প্রমাণ দৃষ্টান্ত-সহ দেখাইয়া দাও।

৪। জমি নিস্তেজ হইয়া গেলে উহা কি কি উপায়ে পুনরুদ্ধার করিতে পারা যায়?

৫। সাধারণ-সার কাহাকে কহে? এই সারের কয়েকটী উদাহরণ দাও।

৬। ফস্ফরাস্-সার কাহাকে কহে? এই সারের কয়েকটী উদাহরণ দাও।

৭। যবক্ষারজান-ঘটিত সার কাহাকে কহে? এই সারের কয়েকটী উদাহরণ দাও।

৮। পটাশ্-সার কাহাকে কহে। এই সারের কয়েকটী উদাহরণ দাও।

৯। চুণ ও লবণ-সার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রধান প্রধান নিয়ম গুলি বর্ণনা কর। কিরূপ জমিতে এই দুই সারের ব্যবহার নিষেধ।

১০। কোন্ শ্রেণীর সার কোন্ শ্রেণীর ফসলের জন্য বিশেষ উপযোগী তাহা বর্ণনা কর।

১১। ধান, ইক্ষু ও বাঁধাকপি এই তিনটী ফসলে কি পরিমাণ (ক) সোরা-সার ও (খ) পচা গোবর-সার দেওয়া যাইতে পারে, হিসাব করিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও।

১২। যবক্ষারজান ঘটিত প্রধান প্রধান সারগুলির প্রত্যেকটীতে কত পরিমাণ যবক্ষারজান বর্ত্তমান থাকা সম্ভব তাহার একটী তালিকা দাও।

১৩। ফস্ফরাস্-সার গুলির মধ্যে যে গুলি প্রধান তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে কত পরিমাণ ফস্ফরিকাম্ল থাকা সম্ভব তাহার একটী তালিকা দাও।

১৪। পটাশ্-সার গুলির মধ্যে যে গুলি প্রধান তাহাদের মধ্যে কি পরিমাণ পটাশ্ থাকা সম্ভব তাহার একটী তালিকা দাও।

১৫। প্রধান প্রধান সাধারণ-সার-গুলির মধ্যে কি কি পরিমাণে সারবান পদার্থ থাকা সম্ভব তাহার একটী তালিকা দাও।

১৬। কোন্ জাতীয় ফসল জন্মাইলে জমি হইতে কি পরিমাণ সারবান পদার্থ সকল বাহির হইয়া যাওয়া সম্ভব, তাহার কয়েকটী উদাহরণ দাও।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শস্যোৎপাদন।

পুনরুল্লেখ।—ইতিপূর্ব্বে ধান্য, সর্ষপ, মেস্তা-পাট, ফাপর, শিমুল-আলু, ভুট্টা, দে-ধান বা জুয়ার, চুবড়ি-আলু, ওল, জেরুসালেম্-আর্টিচোক্, চীনার বাদাম, অড়হর, ধইঞ্চা, ও ইক্ষু, এই কয়েকটী ফসল কিরূপে জন্মাইতে হয়, ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে শতাধিক ফসলের নাম করা হইয়াছে। এই সমস্ত ফসলের সু-বিস্তার বর্ণনা করিতে গেলে পৃথক্ একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। এ কারণ এ অধ্যায়ে ফসল সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ উপদেশ দিয়া বিশেষ বিশেষ কয়েকটী বহুমূল্য ফসল-মাত্র বর্ণনা করা যাইবে।

বীজ-নির্ব্বাচন।—ইউরোপে ও আমেরিকায় বীজ-সংগ্রহের জন্য বিশেষ নিয়মে ফসল জন্মান হইয়া থাকে। বীজ-সংগ্রহের জন্য ফসল জন্মাইতে অধিক খরচ হয় বলিয়া যে সে ফসল অপেক্ষা বীজের ফসলের দাম অনেক অধিক। কিন্তু এই অধিক মূল্যে বীজ ক্রয় করিয়াও ঐ সকল দেশের কৃষকগণ উপকার পাইয়া থাকে। একই জমিতে একই সার ব্যবহার করিয়া দেশী আলুর বীজ হইতে বিঘা প্রতি হয়ত ২৫/ মণ ফলন হইবে, নাইনীতাল আলুর বীজ হইতে ৩০/ মণ ফলন, পাটনাই (আম্‌ড়া-গাছি) বীজ হইতে ৪০/ মণ ফলন, ও মান্দ্রাজী বীজ হইতে ৫০/ মণ ফলন হইবে। বীজের গুণে বা বীজের দোষে ফসল বেশী-কম হইয়া থাকে। বীজ-নির্ব্বাচন ও সংগ্রহের জন্য পৃথক্ কারখানা ও চাষ-বাগান থাকা এ দেশেও বিশেষ আবশ্যক। ভদ্রলোকে বীজের কারখানা ও চাষ-বাগান করিয়া লাভবানও হইতে পারেন, কিন্তু প্রথমে সুবীজের উপর কৃষকদিগের বিশ্বাস জন্মান বিশেষ আবশ্যক। কৃষি-শিক্ষার বিস্তারের সহিত এই বিশ্বাস ক্রমশঃ জন্মিতে থাকিবে, এবং কৃষি-শিক্ষার উন্নতির সহিত বীজ-বিক্রয়ের ব্যবসায়েরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকিবে। আপাততঃ কৃষি-বিভাগের সহযোগেই হউক অথবা কোন সভা-সমিতির সহযোগেই হউক বীজের কারখানা কয়েকটী স্থাপিত হইলে দেশের সবিশেষ উপকার হয়।

ফসল জন্মান ও বীজ জন্মান স্বতন্ত্র নিয়মে হইয়া থাকে। ভাল বীজ জন্মাইতে গেলে, (ক) ভাল ভাল শীষ (অর্থাৎ, যে শীষে অধিক সংখ্যক বীজ ধরিয়াছে এরূপ শীষ) বাছিয়া, (খ) অধিক অন্তরে অন্তরে গাছ জন্মাইয়া, (গ) অধিক ও উপযুক্ত সার ব্যবহার করিয়া, (ঘ) বীজ বপনের পূর্ব্বে ও পরে অনেকবার চাষ দিয়া,

(ঙ) বীজ সম্পূর্ণ পাকাইয়া, (চ) পুনঃনির্ব্বাচন করিয়া, (ছ) কীটাদি হইতে উহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া, কার্য্য করা আবশ্যক হয়। এইরূপ প্রথায় কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি কার্য্য করিতে পারিলে ফসলের প্রকৃতিই অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ যত্ন সহকারে কয়েক বৎসর ধরিয়া ফসল জন্মাইলে ফসল বীজ-সংগ্রহের উপযোগী হয়, অর্থাৎ এইরূপ ফসলের বীজ যদি কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ নিয়মেও ব্যবহৃত হয় তাহা হইলেও ইহা হইতে অধিক ফসল ও রোগশূন্য ফসল জন্মে। ক্রমশঃ বীজের মধ্যে একটী প্রবণতা জন্মিয়া যায়। এই প্রবণতা আবার নিকট নিকট গাছ জন্মাইলে এবং সামান্য সার ও চাষ সহকারে জন্মাইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে দূরীভূত হইয়া যায়। এ দেশে কয়েকটী বীজ প্রস্তুতের বাগান স্থাপিত হইলে সাধারণ কৃষকদিগের বিশেষ উপকার হয়। আলু সাধারণতঃ মূল হইতে এবং ইক্ষু ও আম্র কলম হইতে জন্মান হইয়া থাকে। এই সকল ফসল বীজ হইতে জন্মাইলে কখন কখন অভাবনীয় ফল পাওয়া যায়। বীজ হইতে জন্মাইয়া যে গাছটী বিশেষ কোন গুণসম্পন্ন হইল দেখা যায় সেই গাছটীর মূল বা কলম হইতে গাছ জন্মাইয়া ঐ গুণ ভবিষ্য ফসল-পর্য্যায়ে স্থির রাখিতে পারা যায়। কলম ও মূল হইতে গাছ জন্মাইলে ঠিক্ পূর্ব্বেকার ন্যায় গাছ হইয়া থাকে, কিন্তু বীজ হইতে গাছ জন্মাইলে ফল অপেক্ষাকৃত ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। বীজ হইতে গাছ অপেক্ষাকৃত রোগ-শূন্য হয়। ফসলের উন্নতিসাধনের অন্যতম উপায়, জাতি-শঙ্কর স্থাপন করা। বীজ প্রস্তুতের বাগান করিতে গেলে বিশেষ নিয়মে চাষ, নির্ব্বাচন, বীজ হইতে কোন কোন ফসল জন্মান ও জাতি-শঙ্কর স্থাপন করিয়া কার্য্য করা, আবশ্যক।

চাষাবাদের কাল নিরূপণ।—চাষাবাদের কাল বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের উভর নির্ভর করে। পূর্ব্ব-বঙ্গদেশে ফাল্গুন-চৈত্র মাস হইতে কিছু কিছু বৃষ্টি হয় বলিয়া ঐ ভূভাগে আশু ধান্য, পাট, তিল, ভুট্টা, মেস্তা-পাট ফাল্গুন-চৈত্র মাস হইতেই লাগান হয়; অর্থাৎ কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে ও উড়িষ্যা বিভাগে বৈশাখ-জৈষ্ঠে মাঠের যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, পূর্ব্ব-বঙ্গে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে সেই সকল কার্য্য হয়। বিহার ও ছোট-নাগপুর অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ-মাসের পূর্ব্বে সুবৃষ্টি হয় না, একারণ কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে ও উড়িষ্যা বিভাগে যে সকল কার্য্য বৈশাখ-জৈষ্ঠে হইয়া থাকে, বিহার ও ছোট-নাগপুর অঞ্চলে ঐ সকল কার্য্য জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে সমাধা হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য ভূভাগে উচ্চতা অনুসারে কৃষিকার্য্যের সময় নিরূপিত হয়। দারজিলিংএর ন্যায় নিতান্ত শীতল পর্ব্বতময় স্থানে গ্রীষ্মকালে মাড়ুয়া, ভুট্টা, ইত্যাদি গ্রীষ্মের ফসলও লাগান হয় আবার রবি-ফসল সকলও জন্মান হয়,—অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ লাগাইয়া, ফসলানুসারে জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ফসল কর্ত্তন চলে। নিম্নস্থ পাহাড়ে পূর্ব্ববাঙ্গালায় যে সময়ে ফসল লাগায় সেই সময়েই লাগানর সময়। বিহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে রবি-ফসল লাগাইবার সময় আশ্বিন কার্ত্তিক মাস; ২৪-পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে রবি-ফসল লাগাইবার সময় কার্ত্তিক-অগ্রহায়ন মাস, এবং পূর্ব্ব-বঙ্গে এই সকল ফসল লাগাইবার সময় অগ্রহায়ন-পৌষ মাস। নিম্ন-দত্ত মাসিক নিয়মে ফসল লাগাইবার সময় স্থির করিতে উপরি উক্ত প্রভেদ গুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। এই মাসিক নিয়ম গুলি ২৪-পরগণা, হুগলি, বর্দ্ধমান, মেদনীপুর, উড়িষ্যা, ইত্যাদি দক্ষিণ-বঙ্গ ও উড়িষ্যা বিভাগেই প্রযুজ্য।

মাসিক নিয়ম (বৈশাখ মাসের কার্য্য)।—

ইক্ষুক্ষেত্রে জল সেচন; লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, কাঁকুড়, ওল, জেরুসালেম্ আর্টিচোক্, হলুদ, আদা, কোঙ্গা, ইত্যাদির বীজ লাগান বা মুখী প্রোথন; ভুট্টা, আশুধান্য, ধইঞ্চা, অড়হর, পাট, মেস্তাপাট, জুয়ার, রিয়াণা-ঘাস, এই সকল ফসলের বীজ বপন; তুঁত, বাঁশ, কলা ও মাতুর-কাঠির জমিতে পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত শুষ্ক-পাঁক-মাটি ছিটান; ধান্যের জমিতে গোবর, ছাই, আবর্জ্জনা, ইত্যাদি ছিটান: বেগুনের জমি প্রস্তুত করা ও ভাঁটিতে বেগুনের বীজ ছিটান। লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, ইত্যাদি বিক্রয়।

(জ্যৈষ্ঠ মাসের কার্য্য)।—আশুধান্য, ভুট্টা, বরবটী, সীম, জুয়ার, ধইঞ্চা, অড়হর, রিয়ানা-ঘাস ও পাটের বীজ বপন; লাউ, কুমড়া, কাঁকুড়, ইত্যাদি বিক্রয়; ভারি বৃষ্টির পরেই বেগুন ও কার্পাসের চারা ভাঁটি হইতে মাঠে নাড়িয়া লাগান; চৈত্র মাসে লাগান ভুট্টা, জুয়ার, রিয়ানা, চীনাবাদাম, এই সকল গাছের নীচে মাটি চাপান ও জল নির্গমন প্রণালী প্রস্তুত করা; লাউ, কুমড়া ও শশার বীজ বপন; ভাঁটিতে লঙ্কার বীজ বপন; আমন ধান্যের বীজ বপন; আমন ধান্যের জন্য জমি প্রস্তুত; বৃক্ষ রোপন।

(আষাঢ় মাসের কার্য্য)।—বেগুন ও কার্পাসের চারা লাগান; কলা গাছ ও বাঁশের মুড়া লাগান; বৃক্ষরোপণ; আমন ধান্যের জন্য শেষ জমি প্রস্তুত; মেস্তা-পাট, অড়হর, ও আশুধান্যের নিড়ান; আমন ধান্যের বীজ বপন; কাঁচা মক্কা বিক্রয়; জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপিত বেগুন ও কার্পাসের চারায় মাটি চাপান ও জলনির্গমন প্রণালী প্রস্তুত; টক্ মেস্তা ও ঢেঁড়শ বা ভিণ্ডির বীজ বপন, শাকের ও সীমের বীজ বপন; কচু, হরিদ্রা, এরারুট, আদ্রক, সাদা ও রাঙ্গা আলুর লতা,

শাঁক-আলুর বীজ, ঝিঙ্গা, শশা, লাউ ও কুমড়ার বীজ, চুব্‌ড়ি আলু ও বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত লাগান চলে। ভাদুই কলাই, ভৃঙ্গী, কুলথ-কলাই, অড়হরিয়া সীম, মধ্যপ্রদেশের পোপাট্ সীম, এই মাসে বপন করিতে হয়; আমন ধান্য রোপণ; গিনি ঘাসের ও মাছুর কাটির জড়ি লাগান।

(শ্রাবণ মাসের কার্য্য)।—আমন ধান্য রোপণ; পরে লঙ্কার চারা রোপণ; বাঁশ, নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ; কার্পাসের নিড়ান; বেগুন, হলুদ, আদা, ও কচু গাছের নীচে মাটি চাপান; পাট, ও অড়হরের নিড়ান; কাঁচা মক্কা বিক্রয়; ইক্ষুক্ষেত্রে মাটি চাপান, জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা ও প্রথম পাতা বাঁধা; আমন ধান্যের ক্ষেত্রে জল আট্‌কাইয়া রাখা ও অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া; ষাটিধান্য কাটা; আনারস বিক্রয় ও চারা লাগান।

(ভাদ্র মাসের কার্য্য)।—আশুধান্য কাটা; জুয়ার, অড়হরিয়া সীম, ভৃঙ্গী, রিয়ানা-ঘাস, প্রভৃতি গোরুর খাদ্য কাঁচা অবস্থায় কাটা; বেগুন বিক্রয় আরম্ভ; সীম, শাক ও ঝিঙ্গা, লাউ, কুমড়া, প্রভৃতি বিক্রয়; ধইঞ্চা, পাট ও মেস্তা-পাট কাটা ও জাগ্ দেওয়া; লঙ্কা গাছের নীচে মাটি চাপান ও জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা; পাট ও মেস্তা-পাট কাচা। বিলাতী সব্জীর বীজ বারাণ্ডাতে বাক্সের মধ্যে বপন এই মাসে চলিতে পারে। পৌষ মাসে লাগান ওল উঠাইয়া বিক্রয় করা।

(আশ্বিন মাসের কার্য্য)।—বর্ষা শেষ হইয়া গেলে রবি শস্যের জন্য জমি প্রস্তুত; ভুট্টা, আশুধান্য, ভাদুই কলাই ও ঘোড়া-মুগ কর্ত্তন; ইক্ষুর দ্বিতীয় বার পাতা বাঁধাই; সীম, মটর, পালম-শাক,

চুকা-পালম, কন্‌কা-নোটে শাক, মূলা, লাউ, কুমড়া, শশা, পাট্‌নাই-কপি, সর্ষপ, শালগাম, তিল ও সোরগোজার বীজ বপন। কপির বীজ উচ্চ জমিতে আচ্ছাদন সহ বপন করা আবশ্যক। পটোল ও সাদা ও রাঙ্গা আলুর পাকা লতা বা কলম রোপণ; পেঁপে ও কলা গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ, বিলাতী সবজীর জন্য ভাঁটি প্রস্তুত ও রবি শস্যের জন্য পুনঃ পুনঃ চাষ। কার্পাস-চয়ন এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে। আশু ধান্য মাড়াই; পাট ও দেশী শাক-সব্‌জী বিক্রয়।

(কার্ত্তিক মাসের কার্য্য)।—বিলাতী সব্‌জীর বীজ ভাঁটিতে বপন; গুড়বেগুন, মূলা, পেঁয়াজ, বিলাতী মটর, ফরাশ বীন বা সীম, আলু, পটোল, সাদা ও রাঙ্গা আলু, লাগান; গত মাসের লাগানি কপির চারা চালাইয়া দেওয়া ও বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে উহা-দিগকে রক্ষা করা; ইক্ষু, বার্ত্তাকু ও কার্পাস ক্ষেত্র খনন করা; নব-রোপিত [illegible], পেঁপে, বাঁশ, ইত্যাদি বৃক্ষের গোড়ার মাটি [illegible] করিয়া থালি [illegible]ধিয়া দেওয়া; রবিশস্য বপনের জন্য জ[illegible] এই মাসেই [illegible] আরম্ভ করা আবশ্যক হয়; সর্ষপ, কলাই সর্ব্ব-প্রথমে এবং প[illegible] ছোলা[illegible], মসিনা, তিল, খেঁসারি, মুসুরি, ও মুগের বীজ বপন; আমন ধান্যের মধ্যে মধ্যেও দেশী মটর, মসিনা খেঁসারি ও মুসুরির বীজ বপন চলিতে পারে; কার্পাস চয়ন; আশু ধান্য ও বার্ত্তাকু বিক্রয়।

(অগ্রহায়ণ মাসের কার্য্য)।—কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়া খোঁড়া, নব-রোপিত বৃক্ষের নিম্নে থালি বাঁধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ-বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতী সব্‌জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; কপির

চারা চালাইয়া দেওয়া এবং পূর্ব্ব মাসে যে সকল চারা চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে লাগান; তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মুলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শশা, ধন্যা, পেঁয়াজ, ও বর্ব্বটীর বীজ বপন; যে সকল ক্ষেত্রে এই সকল ফসল পূর্ব্ব মাসে বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্র কোদালি দ্বারা আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সব্‌জীর ভাঁটিতে জল-সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯ টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যার সময় আবরণ উঠাইয়া লওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; কচু, সাদা ও রাঙ্গা আলু উঠান ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল-সেচন ও পরে খোঁড়াই।

(পৌষ মাসের কার্য্য)।—আমন-ধান্য কাটা; আগাম বিলাতী সব্‌জী বিক্রয়; আলু ও কপির ক্ষেত্রে জল-সেচন; বৃক্ষাদির গোড়া খুঁড়িয়া আল্গা করিয়া দেওয়া; যব, গম, ইত্যাদি রবি-শস্যের নিড়ান; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; ওল, চুব্‌ড়ি-আলু, হরিদ্রা, আদ্রক, চীনারবাদাম, মূলা, খুঁড়িয়া তোলা; ভাদ্র মাসে যে ওল উঠান হয় ঐ ওলের জন্য মুখী লাগান; ইক্ষু কাটা আরম্ভ; কলাই ও সর্ষপ কাটা এ মাসেও আরম্ভ হইতে পারে; জল-সেচনের সুবিধা থাকিলে চাঁপানোটে শাকের বীজ বপন; পটোল তোলা আরম্ভ; সিমুল-আলু ও এরারুট উঠান।

(মাঘ মাসের কার্য্য)।—ইক্ষু-কাটা ও গুড় প্রস্তুত; দেশী পেঁয়াজ ও কুলি-বেগুনের বীজ বপন; সিমুল-আলুর কলম-লাগান; ওলের মুখী লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; আমন ধান্যের জমি 'যো' পাইলেই চাষ দেওয়া; আলু, কপি ও অন্যান্য বিলাতী সবজীর ক্ষেত্রে জল-সেচন; কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন;

ইক্ষুর কলম বা টিকলি হাপর-জাত করা; মটর, কলাই ও সর্ষপ কাটা; ইক্ষু ও ফুটি, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লাউ, ইত্যাদি ফসল লাগাইবার জন্য জমি প্রস্তুত ও বীজ বপন; দেশী পেঁয়াজের বীজ রোপণ করা বা চালাইয়া দেওয়া; সিমুল আলু ও এরারুট উঠান ও প্রস্তুত কার্য্য; ধানমাড়া, ঝাড়া; ও বিক্রয়; বিলাতী সব্জী বিক্রয়; পগার ও পুষ্করিণীর মাটি উঠাইয়া ক্ষেত্রে পালা দিয়া রাখা।

(ফাল্গুন মাসের কার্য্য)।—মসিনা, মুগ, ও তিল কাটা; ইক্ষু কাটা ও গুড় প্রস্তুত; ইক্ষু লাগান; উচ্ছে, ঝিঙ্গা, তরমুজ, ফুটি, লাউ, ও কুম্‌ড়ার বীজ বপন; কুলি-বেগুনের চারা লাগান; আমনধান্য, আশুধান্য, পাট, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের জন্য "যো" পাইলেই জমি প্রস্তুত; কার্পাস ও পটল চয়ন; বিলাতী সব্জী বিক্রয়; আলু উঠান।

(চৈত্র মাসের কার্য্য)।—যব, গম, যই, ছোলা, মুসুর, খেঁসারি, মুগ, ইত্যাদি রবি-ফসল কাটা, মাড়া ও ঝাড়া; ইক্ষু লাগান, ও উহাতে সার ও জল দেওয়া; কুম্‌ড়া, লাউ, উচ্ছে, ফুটি, ইত্যাদি গাছে সার ও জল দেওয়া, বিশেষ ছাই ছিটান; কার্পাস চয়ন; আলু উঠান ও বিক্রয়; গুড় বিক্রয়; সুবৃষ্টি হইলে ভুট্টা ও কার্পাসের বীজ বপন; ধান, পাট ইত্যাদি ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত; ক্ষেত্রে সার ছিটান।

ফসল জন্মাইবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তালিকা।

ফসলের নাম ও বঙ্গদেশে আন্দাজ যত একার জমি ইহা অধিকার করিয়া আছে।	কোন্ সময়ে কি পরিমাণ বীজ একারপ্রতি লাগান উচিৎ।	কোন্ সময়ে কি পরিমাণ ফসল একার প্রতি আশা করা যাইতে পারে।
১। আমন ধান্য— (৩০,৫৫৪,৬০০)	... ...	(২য় অধ্যায় দেখ।)
২। আশুধান্য— (৭,৭২২,০০০)	... .	(২য় অধ্যায় দেখ।)
৩। বোরো ধান্য— (৪৬০,৭০০)	... .	(২য় অধ্যায় দেখ।)
৪। পাট— (২,৭৫০,০০০)	৪।৫ সের। (চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ)	১৫ হইতে ২৫ মণ (শ্রাবণ আশ্বিন)
৫। সর্ষপ— (২,০৫৭,৪০০)	৩।৪ সের।— (আশ্বিন-কার্ত্তিক)	৬ হইতে ১০ মণ (পৌষ হইতে ফাল্গুন)
৬। ভুট্টা— (২,০৩৬,২০০)	৩।৪ সের।— (চৈত্র হইতে আষাঢ়)	১০ হইতে ৩০ মণ আষাঢ় হইতে আশ্বিন
৭। যব— (১,৫৭৭,৪০০)	৩০।৩৫ সের।— (আশ্বিন। কার্ত্তিক)	১০।১৫ মণ (ফাল্গুন। চৈত্র)
৮। গোধুম— (১,৪০৮,৯০০)	(২০।৩০ সের।— (কার্ত্তিক। অগ্রহায়ণ)	১০ হইতে ৩০ মণ (ফাল্গুন। চৈত্র)
৯। মড়ুয়া— (১,০০৫,৯০০)	৩½ সের হইতে ৫ সের (চৈত্র। বৈশাখ)	৮ হইতে ২০ মণ (শ্রাবণ হইতে আশ্বিন)

১০। ছোলা—	৮ সের হইতে ২৪ সের	৮ হইতে ২২ মণ
(১,১২৬,০০০)	(আশ্বিন। কার্ত্তিক)	(ফাল্গুন। চৈত্র)
১১। মসিনা—	৫।৬ সের।—	৮।১০ মণ।
(৮৪৪,৩০০)	(আশ্বিন। কার্ত্তিক)	(ফাল্গুন। চৈত্র)
১২। ইক্ষু—	৬,০০০ হইতে ১২,০০০ টিকলি ;—	৪০ হইতে ৬০ মণ গুড়
(৬৯০,১০০)	(মাঘ হইতে বৈশাখ। ঢাকা-জেলায় কার্ত্তিক, ও পৌষ মাসেও ইক্ষু লাগান হয়।	(অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র)
১৩। তামাক—	১।৩ তোলা।—	১৮ হইতে ২১ মণ।
(৬৮০,৭০০)	(ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক)	(ফাল্গুন হইতে বৈশাখ)
১৪। শাল—	১০।১৫ সের।—	৫ হইতে ২০ সের।
(৩৭৯,১০০)	(ফাল্গুন, কার্ত্তিক ও চৈত্র-বৈশাখ)	(শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক)
১৫। রবি তিল—	৮।৯ সের —	৫।৭ মণ।
(৩৩৭,৮০০)	(কার্ত্তিক ও ফাল্গুন)	(মাঘ, ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ)
১৬। ভাদুই তিল—	৯।১০ সের।—	৬।৮ মন।
(৯৫,৫০০)	(জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র)	(ভাদ্র হইতে পৌষ)
১৭। জুয়ার বা দেব-ধান্য	৫ সের (বীজের জন্য) ১৫ সের (গোরুর আহারের জন্য) (বৈশাখ হইতে শ্রাবণ)	১০।১২ মণ বীজ বা ৩০০ মন শুষ্ক ঘাস। (ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক)
(১৯১,৮০০)		

১৮। কার্পাস— (১২০,৬০০)	২ হইতে ৫ সের। (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ)	১½ হইতে ৩ মণ তুলা ও ৪ হইতে ৮ মণ বীজ (আশ্বিন হইতে মাঘ ও চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ)
১৯। বাজরা— (৩২,৪০০)	৪ সের — (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)	৮ হইতে ১৫ মণ। (আশ্বিন-কার্ত্তিক)
২০। অড়হর—	৩ হইতে ৫ সের।— (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)	১০।১৫ মণ। (মাঘ বা চৈত্র)
২১। খেঁসারি—	৬।৭ সের।— (কার্ত্তিক)	৩।৪ মণ দানা ও ৫।৬ মণ খড়। (ফাল্গুন-চৈত্র)
২২। মাস-কলাই	৪।৫ সের।— (আষাঢ়-শ্রাবণ ; আশ্বিন-কার্ত্তিক ;	৮।১০ মণ দানা (আশ্বিন-কার্ত্তিক ; পৌষ-মাঘ)
২৩। মসুর—	৫।৬ সের।— (কার্ত্তিক হইতে পৌষ)	৪ হইতে ৮ মণ দানা এবং ঐ পরিমাণ খড়। (ফাল্গুন-চৈত্র)
২৪। মুগ—	৩।৪ সের।— (আশ্বিন ও শ্রাবণ ভাদ্র)	৪।৫ মণ দানা ও ঐ পরিমাণ খড়। (ফাল্গুন ও আশ্বিন-কার্ত্তিক)

২৫। মটর—	৫ সের (দানার জন্য) ১০ সের (গোরুকে কাঁচা খাওয়াইবার জন্য)। (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ)	৩।৪ মণ ৪০।৫০ মণ কাঁচা ফসল (চৈত্র অথবা মাঘ-ফাল্গুন)
২৬। চীনা—	৪.৫ সের।— (মাঘ-ফাল্গুন)	১০।১২ মণ। (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)
২৭। কোদো—	১ সের।— (জ্যৈষ্ঠ)	৭।৮ মণ (কার্ত্তিক)
২৮। রেড়ি—	২ সের (ছোট বীজ)। ৩ সের (বড় বীজ)। (বৈশাখ হইতে আষাঢ় ও আশ্বিন)	৬ হইতে ১২ মণ (অন্য ফসলের সহিত জন্মাইলে ৩ মণ)। (মাঘ-ফাল্গুন ও চৈত্র-বৈশাখ)।
২৯। লঙ্কা—	২ ছটাক। (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ভাঁটিতে বীজ দেওয়া ও আষাঢ় শ্রাবণে চারা লাগান)	৬ হইতে ১২ মণ (পৌষ-মাঘ)
৩০। মৌরী—	১ সের। (আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ)	৩.৪ মণ (চৈত্র)।

৩১।	হরিদ্রা—	২ মণ। (বৈশাখ)	৫০ হইতে ১৫০ মণ (কাঁচা অবস্থায়) (পৌষ-মাঘ)।
৩২।	শণ—	৫।৬ সের। (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ)	১০।১২ মণ (কার্ত্তিক বা ফাল্গুন-চৈত্র।
৩৩।	অহিফেন—	১½ সের। (কার্ত্তিক মাসে নিম্নভূমিতে; ফাল্গুন মাসে পাহাড়ের উপর)	১২ হইতে ২৫ সের (চৈত্রে নিম্নভূমিতে; জ্যৈষ্ঠ পাহাড়ে)।
৩৪।	কুলথ-কলাই—	১০ সের (দানার জন্য) ১২।১৪ সের (গোরুর কাঁচা আহারের জন্য) (আশ্বিন-কার্ত্তিক, অথবা জ্যৈষ্ঠ, অথবা ভাদ্র)	৪ মণ দানা অথবা ১০০।১৫০ মণ কাঁচা আহার (ফাল্গুন, অথবা ভাদ্র, অথবা অগ্রহায়ণ)।

আলু।—যে সকল জাতীয় আলু বঙ্গদেশে জন্মান হইয়াছে, তন্মধ্যে নাইনীতাল, আমড়াগাছী (পাটনাই) ও মান্দ্রাজী আলুর বীজ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া গিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে নাইনীতাল আলু আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এ কারণ এই জাতীয় আলুর বীজ ব্যবহার করিতে হইলে বিঘাপ্রতি ৪।৫ মণ বীজ লাগিয়া যায়। আমড়াগাছী

আলু আকারে ছোট। এই আলুর বীজ বিঘাপ্রতি দুই মণ হইলেই চলিয়া যায়। মান্দ্রাজী আলুর বীজ বিঘাপ্রতি ৩/ মণ লাগে। আলু লাগাইবার সময়, অর্থাৎ, আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে, আলুর দাম প্রায় ৫৲ টাকা মণ হইয়া থাকে। আলুর বীজ রক্ষা করা সহজ নহে, এবং বীজ ক্রয় করিতে বিঘাপ্রতি ১০৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইতে পারে বলিয়া, আলুর চাষ করিয়া উঠা কৃষকদিগের পক্ষে কিছু দুরূহ। উপযুক্ত মৃত্তিকা নির্ব্বাচিত করিয়া, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত নিয়মে, আলুর চাষ করিতে পারিলে অধিক ব্যয় করিয়াও বিলক্ষণ লাভ করিতে পারা যায়। মৃত্তিকা বিশেষে ও স্থান-বিশেষে বিঘাপ্রতি ১০০/ মণেরও অধিক আলু জন্মান যাইতে পারে। এই আলু ১৲ টাকা মণ দরেও বিক্রয় করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। কোন কোন মৃত্তিকাতে অধিক সার দিয়াও বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ মাত্র আলু জন্মে।

কোন কোন স্থান এত শুষ্ক যে উপযুক্ত মৃত্তিকাতে আলু লাগাইয়াও জল-সেচনের জন্য অসম্ভব খরচ না করিতে পারিলে আলু ভাল জন্মে না। আবার কোন কোন স্থান স্বভাবতঃ এত সিক্ত যে ঐ সকল স্থানে বিনা জল-সেচনেও উত্তম আলু জন্মে। কোন কোন স্থানে আলু শীঘ্র পচিয়া যায়, কোন কোন স্থানে আলুর বীজ রক্ষা করা তাদৃশ দুরূহ নহে। এই সকল সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া আলুর চাষ আরম্ভ করা উচিত। অনেক ব্যয় করিয়া দূরদেশ হইতে বীজ ক্রয় করিয়া আনিয়া, অনুপযুক্ত মৃত্তিকায় আলু লাগাইয়া, জল-সেচনে অনেক ব্যয় করিয়া, বিঘাপ্রতি ৫০৲। ৬০৲ টাকা খরচ করিয়া ২০৲।২৫৲ টাকার আলু আদায় করা অপেক্ষা আলুর চাষ না করাই ভাল।

আলুর বীজ রক্ষা করিতে হইলে শীতল অথচ শুষ্ক গৃহে মাচান প্রস্তুত করিয়া, মাচানের উপর বালি বিছাইয়া ঐ বালির উপর এক থাক করিয়া আলু সাজাইয়া রাখিতে হয়। ঘরটী অন্ধকার রাখা আবশ্যক, কিন্তু হাওয়া খেলিবার উপায়ও থাকা চাই। প্রত্যেক মাচানে উপর্য্যুপরি ৭।৮টী থাক্ থাকিলে একই গৃহে অনেক পরিমাণ আলু ধরিতে পারে। সপ্তাহে একবার করিয়া আলুগুলি দেখিয়া যাওয়া আবশ্যক। পচা আলুগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বৃহদাকারের আলু শীঘ্র পচিয়া যায় বলিয়া এরূপ আলু বীজের জন্য রক্ষা করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। যদি আলুর বীজ রক্ষা না করিয়া বাজার হইতে কিনিতে হয়, তাহা হইলে অঙ্কুরিত এবং বহু অঙ্কুরযুক্ত কিছু বৃহদাকারের আলুই বীজের জন্য ক্রয় করা ভাল। এইগুলি গৃহের মধ্যে সিক্ত বালুকার উপর রাখিয়া আরও কিছু বালুকা দ্বারা অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়া অঙ্কুরগুলি বড় হইয়া গেলে, আলু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পরে জমিতে পুতিয়া দিতে হয়; এক এক খণ্ডে এক বা দুইটী করিয়া অঙ্কুর রাখা উচিত। ঘরের ভিতর রাখিয়া বীজগুলির অঙ্কুর বাহির করিয়া লওয়াতে সময়ের অনেক সাশ্রয় হয়;—অর্থাৎ জমি ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া চলে এবং বর্ষাকাল চলিয়া যাইবার পরে কার্ত্তিকের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের প্রথমে বীজ লাগান চলে। যে আলুর অঙ্কুর বাহির হয় নাই এরূপ আলু যদি জমিতে পুতিয়া দেওয়া যায় এবং পুতিবার পরে যদি অধিক বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে জমির মাথা আঁটিয়া গিয়া অনেক আলু পচিয়া যায় এবং যে বীজ ভাল অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে উহা হইতে অঙ্কুর সমস্ত এক বা দেড় মাস কাল ধরিয়া বাহির হইয়া, আলু উঠাইবার সময় অনেক গাছ কাঁচা থাকিয়া যায়।

তিলের ফলের ন্যায় লম্বা লম্বা হইয়া থাকে, অপরটীর ফল গোল গোল হইয়া থাকে। প্রথমটীর নাম কর্‌কোরাস্‌ ওলিটোরিয়াস্‌। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহা সাধারণতঃ জন্মে বলিয়া ইহা "দেশী-পাট নামে" আখ্যাত হইতে পারে। সেরাজগঞ্জ অঞ্চলে ইহাকে "তোষা-পাট" কহে। মায়মনসিংহে এ পাট দেখা যায় না। মেদিনী-পুরের দক্ষিণাঞ্চলে মাদুর প্রস্তুতাদি কার্য্যের জন্য এই পাটই লোকে অধিক পছন্দ করে। ইহা দেখিতে কিছু ময়লা বটে, ওজনেও ইহা কিছু ভারি অধিক, কিন্তু এই পাট অধিক দৃঢ় ও ভারসহ। এই জাতীয় পাট-গাছ উচ্চ জমিতে জন্মে, জমিতে জল দাঁড়াইলে ইহা মরিয়া যায়। ইহার শাক সুমিষ্ট বলিয়া হনুমান ইহার বড় শত্রু। মানুষেও ইহার শাক রাঁধিয়া খায়। দেশী-পাটের প্রকার ভেদও আছে। কোনটীর ডাঁটা এককালীন সাদা (অর্থাৎ হরিতের আভাযুক্ত শুভ্রবর্ণ), কোনটীর ডাঁটা লাল, কোনটীর ডাঁটা স্থানে স্থানে লাল। সাদা ডাঁটার গাছই জন্মান উচিত। লাল ডাঁটার গাছ হইতে যে আঁশ বাহির হয় উহা কিছু লালী হয় বলিয়া উহার দাম মণকরা ॥০ আনা বা ১৲ টাকা কম হয়। এক জাতীয় দেশীপাট শ্রাবণ মাসে কাটিবার উপযুক্ত হয়, আর এক জাতীয় আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে কাটিবার উপযুক্ত হয়। সকল জাতীয় পাটেরই বীজ এক সময়ে, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে, বোনা হয়। যে জাতীয় পাট শ্রাবণমাসেই প্রস্তুত হইয়া যায় উহা অধিক লম্বা হয় না, উহার ফলন কম হয়। যে জাতীয় পাট আশ্বিন-কার্ত্তিকমাসে প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা ১২।১৪ ফুট উচ্চ হয়, এবং উহার ফলন অধিক হয়।

দ্বিতীয় জাতীয় পাট "সেরাজগঞ্জ-পাট" নামে অভিহিত হইতে

পারে। এই পাট পূর্ব্বে ও উত্তর বঙ্গেই অধিক জন্মে। ইহার পাতা খাইতে তিক্ত, একারণ ইহা হনুমানে নষ্ট করে না। ইহারও প্রকার-ভেদ আছে। সাদা ও লাল ডাঁটা-যুক্ত গাছ এ জাতীয় পাটেও লক্ষিত হয়। ইহারও আগাম নাম্‌লা, খর্ব্বাকার ও দীর্ঘাকার এই সকল প্রকার-ভেদ আছে। মায়মানসিংহে যাহাকে "আউশা-পাট" বলে, ও সেরাজগঞ্জে যাহাকে "দেশোয়াল-পাট" বলে, উহা আষাঢ়-শ্রাবণেই, প্রস্তুত হইয়া যায়। উহা খর্ব্বাকার, অর্থাৎ ৭ ফুট মাত্র উচ্চ হয়। উহার অনেক ডাল-পালা বাহির হয় এবং উহার আঁশ শুভ্রবর্ণ ও মসৃণ হইয়া থাকে। ময়মনসিংহে যাহাকে বাওয়া-পাট কহে ও সেরাজগঞ্জে যাহাকে বোম্বাই-পাট কহে উহা ভাদ্রমাসে প্রস্তুত হয়; উহাতে ডাল-পালা বাহির হয় না, উহাতে ফল দেশোয়াল পাটের গাছে যত হয় তদপেক্ষা অনেক কম হয়। এই পাটের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে গাছ মরে না বটে কিন্তু গোড়ায় পাট জল দাঁড়াইবার কারণ বিশ্রী হইয়া যায়। ইহার ফলন দেশোয়াল পাটের ফলন অপেক্ষা অধিক। পূর্ব্ব-বঙ্গে তরলা বা বড়-পাট নামে যে পাট জন্মে, উহার গোড়ায় ৪।৫ ফুট জল দাঁড়াইলেও পাট নষ্ট হয় না। এই জাতীয় পাট আশ্বিন-কার্ত্তিকমাসে প্রস্তুত হয় ও ১২।১৪ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ফলন আরও অধিক। প্রথম অবস্থায় কি "দেশী-পাট" কি "সেরাজগঞ্জ-পাট" কোন পাটেই জল দাঁড়াইতে দেওয়া উচিত নহে। গাছগুলি ৩।৪ হাত উচ্চ হইয়া গেলে তখন বান আসিয়া যদি গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ায় তাহা হইলে সেরাজগঞ্জ জাতীয় পাটের বিশেষ ক্ষতি হয় না, দেশী-পাঠের ক্ষতি হইয়া থাকে। যে জমিতে বালুকার ভাগ অধিক এরূপ জমিতে দেশী-পাট জন্মানই ভাল। এঁঠেল জমিতে সেরাজ-গঞ্জ পাট ভাল হয়।

পাট নিতান্ত ঘন করিয়া লাগাইলে গাছগুলি উচ্চ প্রায় সমানই হইয়া থাকে, ও ক্ষেত দেখিতে অতি সুন্দর হয়, কিন্তু ঘন করিয়া জন্মাইলে ডাঁটাগুলি সরু হয়, আঁশের পরিমাণ কম হয়, এবং গাছগুলি নিস্তেজ হয়। এরূপ গাছের বীজ হইতে পুনরায় গাছ জন্মাইলে গাছ আরও নিস্তেজ হয়। পাটের ফলন এ ন পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইতেছে, গাছ অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইতেছে, আঁশ পূর্ব্বেকার ন্যায় শক্ত, পরিষ্কার ও মসৃণ হইতেছে না, ইহার অন্যতম কারণ ঘন করিয়া গাছ জন্মান। বিঘাপ্রতি দেড়সের বীজ ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। গাছ বাহির হইবার পরে নিড়াইবার সময় অনেক গাছ উঠাইয়া ফেলিয়া গাছগুলি যাহাতে ৮।৯ ইঞ্চি অন্তর জন্মে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। নিড়াইবার সময় লাল ডাঁটার গাছ-গুলিও উঠাইয়া ফেলা উচিত। অনেক স্থানে ঘন করিয়া বীজ বপন করিবার পরে গাছ বাহির হইলে বিদে চালাইয়া দিয়া অর্দ্ধেকের উপর গাছ উৎপাটিত করিয়া ফেলার নিয়ম আছে। ইহা দ্বারাও গাছ পাত্‌লা হইয়া যায় বটে এবং জমিও উস্কান হয়, কিন্তু প্রথমাবধিই গাছগুলি লাইন করিয়া পাত্‌লা হইয়া যদি বাহির হয় এবং পরে যদি মধ্যে মধ্যে হো চালান হয় তাহা হইলে গাছগুলি আরও সতেজে বাড়িয়া যায়। বস্তুতঃ বীজ-বপন-যন্ত্রের ও হো-এর ব্যবহার এ দেশে প্রচলিত হইলে শুদ্ধ পাটের কেন সকল ফসলেরই উপকার হয়। বীজের সাশ্রয়, জমি উস্কাইবার সুবিধা, গাছ ফাঁক-ফাঁক করিয়া জন্মান, এই তিন সুবিধা ঘটাইতে পারিলে কৃষি-কার্য্যের বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

সংগ্রহের জন্য খর্ব্বাকার নিস্তেজ গাছগুলি রাখিয়া দেওয়া ভুল। এই বীজ হইতে পর বৎসর গাছ জন্মাইলে যে গাছগুলি

পূর্ব্ব বৎসরের গাছের ন্যায় নিস্তেজ ও খর্ব্বাকার হইবে এরূপ নহে; কিন্তু বৃহদাকার সতেজ গাছ হইতে উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ধরিয়া বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ হইতে যেরূপ সতেজ ও দীর্ঘাকার গছে জন্মিবে উক্ত বীজ হইতে সেরূপ কখনই জন্মিবে না। খর্ব্বাকার নিস্তেজ গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিলে অবনতি অলক্ষিত ভাবে ধীরে ধীরেই হইয়া থাকে, কিন্তু অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

কৃষকদিগের আর একটী দোষ, একই গাছ হইতে কখন কখন বীজ সংগ্রহ ও আঁশ সংগ্রহের প্রয়াস পাওয়া। উহারা জানে গাছ নিতান্ত পাকিয়া গেলে, বীজ পাকিতে আরম্ভ করিলে, আঁশ নিতান্ত মোটা ও কদর্য্য হয়, তথাপি এই পাটেরও কিছু দাম আছে। ভাল করিয়া গাছ গুলিকে পাকিয়া লইলে রীতিমত পাকা বীজ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। কিন্তু নিতান্ত পাকা গাছের আঁশ ভাল করিয়া বাহিরও হয় না এবং এই আঁশ পাট বলিয়া বিক্রয়ও হয় না। অনেক কৃষক দুই দিক্ বজায় রাখিবার জন্য অর্দ্ধ পক্ব ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এরূপ বীজ হইতে সতেজ ও নীরোগ ফসল না জন্মিয়া কদর্য্য ফসল জন্মিলে কৃষকদিগের নিজেদেরই বুদ্ধির দোষ দেওয়া উচিত। কিন্তু এই কার্য্যেরও পরিণাম ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে ঘটিয়া থাকে। কৃষকেরা এইরূপ বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতেছে এরূপ জানিতে না পারিয়া উক্ত গর্হিত কার্য্য হইতে বিরত হইবার কোন কারণ দেখিতে পায় না। সম্পূর্ণরূপে ফল গুলি না পাকিলে উহাদের বীজ সংগ্রহের জন্য পাড়া উচিত নহে। এরূপ অবস্থায় গাছ গুলি আঁশ বাহির করিবার জন্যও ব্যবহার হইতে পারে না।

আঁশ বাহির করিবার জন্য গাছ গুলিতে যখন ফল ধরিতে

আরম্ভ হইয়াছে, অথচ কতক ফুলও ধরিয়া আছে এই অবস্থায় উহাদের কাটা উচিত। ফুল ধরিবার পূর্ব্বে, অথবা ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে এরূপ অবস্থায় গাছ কাটিলে, উহার আঁশ অপেক্ষাকৃত অধিক চিকণ, মসৃণ ও সুভ্র হয় বটে, কিন্তু এই আঁশের জোর কিছু কম, এবং ইহা ফলনেও কম হয়। ফল গুলি নিতান্ত বড় হইয়া গেলে আঁশ মোটা ও খস্‌-খোসে হয়, কিন্তু ফলনে কিছু অধিক হয়। এই পাটের দাম কম হওয়াতে এরূপ অবস্থায় পাঠ গাছ কাটায় কৃষকের কিছুই লাভ নাই। ফল পাকিতে আরম্ভ করিলে যদি গাছ কাটা যায় তাহা হইলে ফলনেও কম হয়, আঁশও নিতান্ত কদর্য্য হয়, এবং কৃষকও অপক্ক ফলের বীজ সংগ্রহ করিয়া রাথিবার লোভ সামলাইতে পারে না।

অন্যান্য ফসলের ন্যায় পাটও ভাল করিয়া অনেক দিবস ধরিয়া জমিতে চাষ না দিয়া লাগান উচিত নহে। মাটিকে ওলট্‌ পালট্‌ করিয়া ৩।৪ মাস ধরিয়া হাওয়া থাওইতে পারিলে উহা অতি সুন্দর উর্ব্বর হইয়া থাকে। তাড়া-তাড়ি করিয়া চাষ দিয়া বীজ বপন করিলে ফসলও কম হয়, ফসলে পোকাও অধিক লাগে।

পাঠ কাটিবার সময় উহার মাথাগুলি ঝুড়িয়া জমিতে ফেলিয়া রাখা উচিত। পরে মাথাকাটা গাছ গুলি বাণ্ডিল বাঁধিয়া দুই তিন দিবস জমিতেই পালা দিয়া রাথা কর্ত্তব্য। যদি ঐ সময়ে জমিতে জল থাকে তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী উচ্চ কোন স্থানে দাঁড় করাইয়া পাটের বাণ্ডিল গুলি পালা দিয়া রাথার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতে জমির মধ্যে অথবা জমির পার্শ্বে পাতা ঝরিয়া পড়িয়া জমিরউর্ব্বরতা কতক পরিমাণে রক্ষিত হয়। পরে বাণ্ডিল গুলি ঝাড়িয়া যেখানে স্রোত নাই অথচ পরিষ্কার গভীর জল-রাশি আছে, এরূপ স্থানে লইয়া গিয়া সাজাইয়া জাগ দিতে হয়। যদি জমির মধ্যে বা জমির পার্শ্বে

গাছগুলি পালা দিবার জন্য শুষ্ক স্থান না থাকে, তাহা হইলে গাছ কাটিয়া, মাথা ঝুড়িয়া, বাণ্ডিল বাঁধিয়া একেবারে জলের মধ্যে ফেলিয়া জাগ দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। বাণ্ডিল-গুলি নিতান্ত মোটা হওয়া উচিত নহে। এক একটী বাণ্ডিল লইয়া হাঁটুর সাহায্যে যাহাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় এইরূপ ভাবে বণ্ডিল বাঁধা উচিত। মোটা মোটা ডাঁটা হইলে ১০।১২ টী ডাঁটাতেই একটী বাণ্ডিল হইতে পারে। নিতান্ত সরু ডাঁটা ৩০।৪০ টী এক বাণ্ডিলে থাকিতে পারে।

বাণ্ডিলগুলি জলের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে যেন ডুবিয়া থাকে, কিছু জলের উপর ভাসিয়া না থাকে, তজ্জন্য, জলের মধ্যে এদিক ওদিক করিয়া বাণ্ডিল গুলি সাজাইয়া সর্ব্বোপরি মাটি ও জঙ্গল কাটিয়া চাপাইয়া দিয়া উহার উপর বাঁশ দিয়া উভয় পার্শ্বে গাড়া খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হয়। লোণা জলে বা স্রোতের জলে পাট জাগ দিলে, অথবা শীত পড়িয়া গেলে পাট জাগ দিলে, পাট প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হয়, নতুবা এক সপ্তাহ হইতে দশ দিবসের মধ্যে ডাঁটা লির উপরিভাগের ছাল পচিয়া গিয়া সহজে পাট বাহির

জাগ্ দেওয়া শেষ হইলে, এক একটি করিয়া বাণ্ডিল বাহির করিয়া তালের তেউড়ের পিটুনী প্রস্তুত করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা আঘাত করিয়া বাণ্ডিলের মোটা প্রান্ত কতকটা ভাঙ্গিয়া লইয়া, অথবা হাঁটুর সাহায্যে উহা ভাঙ্গিয়া লইয়া, জলের মধ্যে নাড়িতে নাড়িতে মোটা প্রান্তের পাট কাঠি হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া হাতে জড়াইয়া, অবশিষ্ট পাট জলের মধ্যে বাণ্ডিল নাড়িতে নাড়িতে হাতের মধ্যে সমস্ত টানিয়া লওয়া হয়। পরে হাতের মধ্যে সংগৃহীত পাট জলে আছড়াইয়া আছড়াইয়া ধৌত করিয়া পচা ছাল ও

আঠা বিচ্যুত করিয়া লইয়া, নিংড়াইয়া, উপরে পরিষ্কার ঘাসের উপর ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। সমস্ত দিবস পাটের বাণ্ডিল গুলি ভিজা অবস্থায় রাখিয়া পরে সন্ধার সময় বিছাইয়া দিয়া পর দিবস শুকাইয়া লইলে পাট অধিক পরিষ্কার ও উজ্জল হয়। পাট কাচিবার পরেই রোদ্রে দিলে উহা তাদৃশ পরিষ্কার ও উজ্জল হয় না। পাট সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া আছড়াইয়া ঝাড়িয়া তবে গাঁইট্ বাঁধিতে হয়। ভিজা অবস্থায় গাঁইট্ বাঁধিলে গাঁইটের ভিতর ভাপিয়া গিয়া পাট বিবর্ণ হইয়া ক্ষীণ হইয়া যায়। এরূপ পাটের দাম নিতান্ত কম।

মেস্তা পাট।—মেস্তা-পাটের ন্যায় লাভজনক ফসল অতি অল্পই আছে। এই ফসল ৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। বিহারে ইহার নাম পাটুয়া এবং উড়িষ্যায় কাঁউরিয়া। ইহা অনাবৃষ্টি-সহ ফসল বলিয়া, বৈশাখ মাসে বৃষ্টির পর ইহার বীজ বপনে অধিক উপকার দর্শে। যদি বৈশাখ মাসে বৃষ্টি না হয় তবে জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি হইলেই বীজ বপন আবশ্যক। উচ্চ ও প্রস্তরময় তথচ উর্ব্বর ভূমি এই ফসলের জন্য শ্রেষ্ঠ। চীনাবাদাম, বঙ্কটী প্রভৃতি মূল-গণ্ড-বিশিষ্ট শস্য উঠাইবার পরে, জমিতে দুইমাস ধরিয়া, অর্থাৎ ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে, চাষ দিয়া, মেস্তা-পাটের বীজ বপন করা উচিত। বর্ষা পড়িয়া গেলে বীজ বপন করিলে ফসল ভাল হয় না। বর্ষা পড়িয়া গেলে গাছগুলি যদি অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া যায় তাহা হইলে বর্ষার জলে গাছ সুন্দর বাড়িয়া যায়। মেস্তা-পাটের জমিতে জল দাঁড়াইতে দেওয়া উচিত নহে। বীজ বিঘা প্রতি চারি পাঁচ-সের ব্যবহার করা উচিত। মেস্তা-পাট ফুল ধরিলেই কাটিতে হয়। ফল ধরিয়া গেলে গাছ কাটিলে আঁশ মোটা ও খস্ খোসে হয়। গাছগুলি গোড়া ঘেঁষিয়া

কাটা উচিত কেননা গোড়ার আঁশই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। গাছগুলি কাটিয়া, পাট গাছ যেমন জমিতে ২।৩ দিবস পালা দিয়া রাখিতে হয়, সেরূপ না রাখিয়া একেবারে জলে লইয়া গিয়া ডুবাইয়া জাগ্‌ দিতে হয়। মেস্তা-পাট ঠিক্‌ পাটের ন্যায় বাহির করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ ফলন হওয়া সম্ভব। ছোট-নাগপুর, সাঁওতালপরগণা, উড়িশ্যা, বিহার, এই সকল অঞ্চলে সাধারণ পাট ভাল জন্মে না, কিন্তু মেস্তা-পাট উত্তম জন্মে।

পাটের পরিবর্ত্তে আরও নানাপ্রকার গাছের আঁশ বাহির করিয়া বিস্তৃতভাবে বিলাতে চালান দিবার উদ্যোগ কুঠিয়াল সাহেবেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আরও ৩।৪ বৎসর না গেলে এসকল ফসলের উপকারিতা সম্বন্ধে সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। রিহা, আগাভে, ফুরক্রয়া ও সান্সিভিয়েরা, এই চারিটী গাছের আঁশ অতি চমৎকার। এই সকলের আবাদ হইতে কিরূপ লাভ দাঁড়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা জানা যাইবে। এখন হইতেই এই সকল গাছের কলম, চারা বা পুষ্প-বীজ সংগ্রহ করিয়া নর্ম্ম্যাল-বিদ্যালয় ও কৃষি-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে সযত্নে লাগাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের ব্যবহারিক উপকারিতা স্থির হইলে বিদ্যালয়ের সাহায্যে কৃষকদিগের মধ্যে এই সকল গাছ বিতরিত হইতে পারিবে।

কার্পাস।—এদেশের কার্পাসের চাষের উন্নতি-কল্পে গর্বনমেণ্ট্‌ ও কুঠিয়াল সাহেবেরা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে যথেষ্ট কার্পাস যাইতেছে না, এবং কার্পাসের মূল্য বাড়িতেছে। এই সময়ে কৃষকগণ যদি ভাল ভাল জাতীয় কার্পাস, সুনিয়মে চাষ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে দেশের সমূহ উন্নতি হইতে পারে। এদেশে একার প্রতি কার্পাসের গড় উৎপন্ন

দেড় মণ মাত্র; কিন্তু কোন কোন জাতীয় কার্পাস হইতে একার প্রতি গড় চারি মণ আঁশও উৎপন্ন হয়। নিকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস না জন্মাইয়া কেবল ঐ সকল শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস জন্মাইলে গড় উৎপন্ন বাড়িয়া যাইবে। বিদেশীয় যে সকল জাতীয় কার্পাস বঙ্গদেশে জন্মান হইয়াছে তন্মধ্যে সি-আইল্যাণ্ড কার্পাস ও পেরু-ভিয়ার কিড্‌নি-কার্পাস হইতে ফল ভাল পাওয়া গিয়াছে। মিসর দেশীয় কার্পাস বিনা জল সেচনে ভাল জন্মে না। ইহার আঁশ শুভ্র, শক্ত, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বটে, কিন্তু ফলন কম। এ দেশীয় কয়েকটী শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস সাধারণতঃ জন্মাইতে পারিলে উন্নতি অধিক হইবার সম্ভাবনা। গারো-হিল্ কার্পাস দেখিতে সুন্দর বটে, ইহার ফলনও অধিক, কিন্তু ইহার আঁশ নিতান্ত ছোট ও মোটা। এ জাতীয় কার্পাসের বিস্তৃত চাষ দ্বারা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মানভূমের বুড়ি-কার্পাস ইহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহার আঁশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম এবং ফলনও অধিক। ইহার দোষ, বীজ হইতে আঁশ সহজে ছাড়ে না। বীজগুলিও মসৃণ নহে, মক্মলের ন্যায় সবুজ রংএর সূত্র-পূর্ণ। দেব-কার্পাসের আঁশ বুড়ি-কার্পাসের আঁশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঢাকাই-কার্পাস প্রভৃতি কয়েক জাতীয় দেব-কার্পাসের বীজ মসৃণ এবং আঁশ বীজ হইতে সহজে ছাড়িয়া আইসে। দেব-কার্পাসের গাছ ১২।১৪ ফুট উচ্চ হয় এবং একবার লাগাইলে ইহা দশ-পনের বৎসর জমি অধিকার করিয়া থাকিতে পারে। চৈত্র অথবা বৈশাখ মাসে ঢাকাই কার্পাসের বীজ উত্তমরূপে প্রস্তুত ভাঁটিতে লাগাইয়া দিয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে (অর্থাৎ, বর্ষারম্ভের সময়) ৪ হাত অন্তর মাঠে চারা উঠাইয়া লাগাইলে স্থায়ীভাবে এই কার্পাসের আবাদ করিয়া

লইতে পারা যায়। যে মাঠে চারা লাগাইতে হইবে উহা চারি মাস ধরিয়া মধ্যে মধ্যে গভীর ভাবে চাষ দিয়া জমি অতি সুন্দররূপে পূর্ব্বে হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। জমিতে সার দিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। ছাই কার্পাসের পক্ষে উত্তম সার। জিপ্‌সম্, চূণ, অস্থি-চূর্ণ, অস্থি-ভস্ম, এ সমস্তও কার্পাসের জন্য উত্তম সার। যে স্থানের মাটিতে চূণের ভাগ অধিক, ঐ স্থানে লবণ সাররূপে ব্যবহার করিলে কার্পাসের বিশেষ উপকার হয়,—ফলের পরিমাণ অধিক হয় এবং আঁশ দৃঢ় ও লম্বা হয়। সারের দ্বারা যত না উপকার হয়, ৪।৫ মাস ধরিয়া অনবরত জমি চাষ দেওয়াতে তদপেক্ষা অধিক উপকার হয়। ছোট কার্পাস গাছ লাগাইতে হইলে চারা জন্মাইবার ভাঁটি পৃথক্‌ভাবে প্রস্তুত না করিয়া, ক্ষেত্রের প্রস্তুত জমিতে একেবারে লাইন্ ধরিয়া দুই ফুট অন্তর দুইটী করিয়া বীজ তিন ইঞ্চি গম্ভীর করিয়া লাগাইয়া দিয়া যাইতে হয়। লাইন্‌গুলি ২৷৷০ ফুট অন্তর হওয়া উচিত। নিতান্ত ক্ষুদ্র জাতীয় কার্পাস জন্মাইতে হইলে একার প্রতি ৫ সের বীজ ছিটাইয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু নিকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস জন্মানতে খরচ পোষায় না। বীজ ছিঠানর, বা লাইন ধরিয়া লাগানর, প্রকৃত সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, অর্থাৎ রীতিমত বর্ষারম্ভের কিছু দিবস পূর্ব্বে।

নানাজাতীয় শ্রেষ্ঠ কার্পাস জন্মাইয়া যেটীর ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে, যেটীর তুলার পরিমাণ বীজের ওজনের অনুপাতে অধিক হইবে, যেটীর আঁশ সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা, দৃঢ় ও শুভ্র, হইবে, যেটীর বীজ মসৃণ অর্থাৎ যাহার আঁশ বীজ হইতে সহজে ছাড়িয়া যাইবে, যেটীতে সহজে পোকা লাগিবে না, সেইটী নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া

বিস্তৃতভাবে জন্মান উচিত। এইরূপ পরীক্ষা ভারতবর্ষের নানা স্থানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদ্বারা কার্পাসের চাষের সমূহ উন্নতি হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত গুণ-সম্পন্ন কার্পাস নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া শুদ্ধ সময় ও পরীক্ষা সাপেক্ষ এরূপ নহে, ইহা সংস্থাপিত করিতে হইলে যত্ন সহকারে জাতি-সঙ্কর সৃজন করা-আবশ্যক। জাতি-সঙ্কর সৃজন করিতে হইলে ভাল ভাল জাতীয় কার্পাসের গাছ টবে করিয়া জন্মাইয়া যে গাছের যে গুনটী আছে সেই গুণটী অন্য গাছে প্রবেশ করিয়া দিবার জন্য, একটী গাছের পুষ্পগুলির পুংকেশর প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়া অপর গাছের পুষ্পের পুংকেশর প্রস্ফুটিত হইলে উহার পরাগ একটু মধুর সাহায্যে উঠাইয়া লইয়া ঐ পরাগ-সহ মধু পূর্ব্বকথিত গাছের পুংকেশর বিচ্যুত পুষ্পগুলির গর্ভ-কেশরের উপর পাতিত করিয়া দিতে হয়। অপর গুনসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস গাছের পরাগ গর্ভ-কেশরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে বীজ প্রস্তুত করিবে উহা হইতে গাছ জন্মাইলে এই গাছের কয়েকটীতে উভয় গাছের গুণই লক্ষিত হইবে। উভয় গাছের গুণসম্পন্ন ফলের বীজ হইতে ৪৫ বৎসর ক্রমাগত গাছ জন্মাইতে জন্মাইতে ও নির্ব্বাচন প্রতি বৎসর করিতে করিতে উভয় গুণসম্পন্ন একটী জাতি দাঁড়াইয়া যাইবে। এইরূপে জাতি-সঙ্কর সংস্থাপিত করিতে হয়। এইরূপে নানা জাতির গুণ একই জাতির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারা যায়। বীজ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এই একটী বিশেষ কার্য্য বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। মিসর, সি-আইল্যাণ্ড, ইত্যাদি কার্পাসের আঁশ ঢাকাই কার্পাসের, দেব-কার্পাসের, রাম-কার্পাসের, ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ জাতীয় দেশীয় কার্পাসের আঁশ অপেক্ষা দীর্ঘ।

কিন্তু এই সকল জাতীয় দেশীয় কার্পাসের গাছ ১০।১২ হাত উচ্চ হয়, ইহাতে বড় একটা পোকা লাগে না, ইহার আঁশ শুভ্র ও সূক্ষ্ম হয় এবং ফল অধিক ধরে। এমনস্থলে জাতি-সঙ্কর সংস্থাপন করিয়া দেব-কার্পাসাদি শ্রেষ্ঠজাতীয় দেশী-কার্পাসে সি-আইল্যাণ্ডাদি কার্পাসের বিশেষ গুণটী প্রবেশ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

বড় জাতের কার্পাস লাগাইলে দুইশ্রেণীর গাছের মধ্যে প্রায় ছয় ফুট করিয়া ছায়াস্থান থাকিয়া যাইবে। এইরূপ ছায়া স্থানে চীনার-বাদাম জন্মান যাইতে পারে। চীনার-বাদাম উঠান দ্বারা জমির ওলট্ পালট্ হইবে এবং ইহাতে কার্পাস গাছের উন্নতি হইবে। চীনার বাদামের শিকড়ে মূল-গণ্ড পচুর পরিমাণে থাকিবার কারণ জমির উর্ব্বরতাও বৃদ্ধি হইবে। এরূপ করাতে দ্বিতীয় বৎসরেও কার্পাসের ক্ষেত্রে কোন সার দিবার আবশ্যক হইবে না। তৃতীয় বৎসর হইতে জমি খোঁড়া ও পচা গোবর-সার অথবা খোল দেওয়া আবশ্যক হইবে। মাঘ-ফাল্গুন মাস হইতে পাকা ফল উঠাইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখমাস পর্য্যন্ত ফল উঠান চলিবে। পরে গাছ গুলির ডাল ছাটিয়া জ্বালাইয়া দিয়া, জমিতে চাষ ও সার দিয়া যাইতে হয়। দ্বিতীয় বৎসর হইতে আশ্বিনমাস হইতে ফল পাড়া ও তুলা সংগ্রহ চলিবে। চর্কিদ্বারা বীজ হইতে তুলা বিচ্যুত করিয়া লইতে অনেক পরিশ্রম ও খরচ পড়ে। চর্কিদ্বারা সমস্ত দিবসে অর্দ্ধসের মাত্র তুলা সংগ্রহ হইয়া থাকে। ম্যাকার্থির কটন্-জিনের দ্বারা প্রত্যহ এক মণেরও অধিক তুলা বীজ-বিচ্যুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এদেশে তুলার বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার কারখানা

নাই, হইলে ভাল হয়। এই তৈল সাবান প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়, এবং তুলার বীজের খোল ও গোরুর পক্ষে অতি শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

ছোট জাতীয় কার্পাসের গাছে প্রথম বৎসর হইতেই আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে ফল পাড়া আরম্ভ হইতে পারে। ইহারও কয়েক জাতীয় গাছ ক্ষেত্রে এক বৎসরের অধিক রাখিতে পারা যায়। বিলাতী কার্পাসের বীজ আশ্বিন মাসে বপন করিলে কিছু ভাল ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ গাছে তত পোকা লাগে না। আশ্বিন মাসে বীজ লাগাইলে ফাগুন মাসে ফল পাড়া আরম্ভ হয়। পক্ক ও অর্দ্ধ-পক্ক ফল এক-কালে পাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া খোলা ছাড়াইয়া পরে তুলা বীজ-বিচ্যুত করিতে হয়। দশ দিন অন্তর এক বার করিয়া ফল পাড়িলেই চলে; কেবল সম্পূর্ণ পক্ক ফল পাড়িতে হইলে সপ্তাহে দুইবার করিয়া ফল সংগ্রহ আবশ্যক করে। প্রথম ৩।৪ সপ্তাহে সংগৃহীত ফলগুলি বীজের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। বর্ষা থাকিতে থাকিতে যদি প্রথম ফল পাকিয়া যায় তাহা হইলে ঐ গুলি বীজের জন্য রাখা উচিত নহে। ফল পাড়া আরম্ভ করিবার সময় কার্পাস ক্ষেত্র একবার খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত।

কার্পাস জন্মাইতে বিঘা প্রতি ১০৲ টাকার অধিক ব্যয় হওয়া উচিত নহে। আয় কার্পাসের ফলনের উপর নির্ভর করে। বিঘা প্রতি এক মণ তুলা ও দুই তিন মণ বীজ জন্মিলে কার্পাস জন্মাইয়া লাভ আছে। বুড়ি-কার্পাস, ঢাকাই-কার্পাস, দেব-কার্পাস ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস যত্নপূর্ব্বক জন্মাইলে এই পরিমাণে তুলা ও বীজ হওয়া সম্ভব। এক মণ তুলার দাম ১৬৲ হইতে ২০৲ টাকা ও তিন মণ তুলার বীজের দাম (যদি এই বীজ গরুকে খাইতে দেওয়া হয়) তিন টাকা ধরা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে বিঘা প্রতি আপাততঃ

গড়ে অর্দ্ধমণ বা পঁচিশ সের মাত্র তুলা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় তুলা জন্মানতে লাভ নাই। কার্পাসের চাষের উন্নতি করিতে পারিলেই লাভ হইতে পারে।

পান।—পান-চাষ লাভের চাষ। পান-চাষ বারুইরা এক-চেটিয়া করিয়া রখিয়াছে বলিয়া সাধারণ কৃষক এই লাভের অংশী নহে। পান-চাষ সম্বন্ধে সাধারণ কৃষকের কোনই অভিজ্ঞতা নাই। পানের পাকা লতা কলম করিবার জন্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য। মেদিনীপুর জেলায় যে সকল শ্রেষ্ঠ জাতীয় মিঠাপান জন্মে উহাদের পাকা লতা সংগ্রহ করা আরও দুরূহ।

মৃত্তিকা।— কাল রংএর দো-আঁশ মাটি প্রায় জৈবিক পদার্থ পূর্ণ এবং পান জন্মাইবার উপযুক্ত। কিন্তু পানের জমি উচ্চ হওয়া আবশ্যক, ইহাতে জল দাঁড়াইলে চলে না। কিছুলাল রংএর বালু-দো-আঁশ জমিতে মেদিনীপুরে শ্রেষ্ঠ জাতীয় পান সকল জন্মিয়া থাকে। পানের জমি সর্ব্বদাই সরস থাকা উচিত, বরজের ছায়াস্থিত মৃত্তিকাকে সরস রাখাও বিশেষ দুষ্কর নহে। পিপুল গাছের ন্যায় পান গাছও আম কাঁঠালের ছায়াতে জন্মান যাইতে পারে, তবে বরোজের পান যত নরম হয়, স্বাভাবিক রূপে গাছে লতাইয়া যে পান জন্মে উহা সেরূপ নরম হয় না, উহাতে কিছু ছিবড়া অধিক হয়।

চাষ।—কথায় বলে "বিনা চাষে পান"। ইহার এমন অর্থ নহে, পান জন্মাইতে কোনই পাইটের আবশ্যক করে না। বস্তুতঃ জমির পাইট করিলে পান আরও ভাল হয়, তবে বরোজের মধ্যে লাঙ্গল দেওয়া চলে না। বরোজ প্রস্তুত করিয়া পান গাছ এক বার জন্মাইয়া লইতে পারিলে দশ হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল

মেরামত করিয়া করিয়া বরোজ রাখা যাইতে পারে, কিন্তু বরাবর সার দেওয়া, খোঁড়া স্থান ও অবস্থা বিশেষে জল দেওয়া আবশ্যক।

বরোজ।—বরোজ প্রস্তুত করিবার জন্য উচ্চ ও উর্ব্বর জমি নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া, উহার উপরিস্থিত গাছ, জঙ্গল প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া অথবা জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দিয়া চতুর্দ্দিকে পগার কাটিতে হয়। এই পগার কাটা মাটি সমভাবে মধ্যস্থিত জমির উপর বিস্তৃত করিয়া দিতে হয়। পগার বড় করিয়া কাটিতে পারিলে তিন ইঞ্চি মাটি জমির উপর পড়িতে পারে। বরোজ প্রস্তুত হইয়া গেলে এই আলগা মাটির উপরই পান লতা পোতা হয়। মেদিনীপুরের পান-চাষ করিতে জমি রীতিমত কোদালী দ্বারা এক হাত গভীর করিয়া কোপান হয় এবং ঢেলা সমস্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া জমি সমতল করিয়া দেওয়া হয়; তৎপরে বরোজ বাঁধিয়া পান-লতা পোতা হয়। বরোজ বাঁধিবার জন্য অনেকগুলি পচান বাঁশের খুঁটি আবশ্যক। এইগুলি ৭ হাত অন্তর সারি বাঁধিয়া দুই হাত করিয়া মাটির ভিতর পোতা হয়, পাঁচ হাত আন্দাজ মাটির উপর জাগিয়া থাকে। এই খুঁটির উপর ধইঞ্চার আচ্ছাদন সাজাইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। চারি পার্শ্বেও ধইঞ্চার কাঠি সাজাইয়া খুঁটির সহিত বাঁধিয়া দিতে হয়। ধইঞ্চার ছাউনীর উপর উলুখড়ের ছাউনী দেওয়ারও নিয়ম আছে। দুই সারি খুঁটির মধ্যে এক সারি পানের লতা ৬ ইঞ্চি অন্তর পুতিয়া যাইতে হয়। এক একটী লতাখণ্ড এক ফুট হইতে এক হাত পর্য্যন্ত লম্বা করিয়া কাটা হয়। প্রত্যেক লতা-খণ্ডে ৫।৬টী গাঁট থাকে, এবং ইহার দুইটী মাটির বাহিরে রাখিয়া লতাগুলি পুতিয়া দেওয়া হয়। পুতিবার পরে উহাদের উপর

পাতা তোলা আরম্ভ করিতে হয়। শ্রাবণে কলম লাগানই ভাল, ইহাতে জল-সেচন কম আবশ্যক হয়। পাতা তোলা আরম্ভ করিবার পরে রীতিমত মাসে দুইবার করিয়া পাতা পাড়া চলিতে থাকে। বর্ষাকালে প্রত্যেক গাছ হইতে প্রত্যেকবারে ৪ হইতে ৬টী পত্র ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়, অন্য সময়ে ২।৪টী। এতদ্ব্যতীত এক একটী আলম্বিত লতাকে পুতিয়া দিবার পরে যখন দেখা যাইবে উহাতে শিকড় বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন পুরাতন গাছটীর সমস্ত পাতা এককালীন ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়। এক এক বিঘা বরোজ হইতে বৎসরে ন্যূনাধিক ২৫ লক্ষ পান পাতা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। লতা গুলির পার্শ্বে বা নিম্নে ডাল বাহির হইলে উহাদের খুঁটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। কিছু বড় হইয়া গেলে এই সকল ডালের পাতাও ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়, এবং ইহাদের অন্য বরোজ প্রস্তুত করিবার জন্য কলম স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারা যায়। পান ভাঙ্গিয়া আনিয়া উহাদিগের আকারানুসারে পৃথক্ পৃথক্ গুছি বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়।

আয়-ব্যয়।—বরোজ প্রস্তুত ও মেরামত করাতে দশ বৎসর বিঘা প্রতি ১৫০০৲ টাকা খরচ হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ গড়ে বৎসরে ১৫০৲ টাকা। প্রথম বৎসরে, তৃতীয় বৎসরে, ৫ম বৎসরে ও অষ্টম বৎসরে বরোজ কিছু বদলান আবশ্যক হয়। তৃতীয় ও অষ্টম বৎসরে কেবল ছাউনী ও বেড়া নূতণ করিয়া দিলে চলে। টাকায় যদি ৩০০০ পান বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে বৎসরে এক বিঘা বরোজ হইতে ৮০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। দশ বৎসরে ১৫০০৲ টাকা খরচ করিয়া ৮,০০০৲ টাকা আয়, অন্য কোন ফসল হইতে হয় না।

তামাক।—তামাক জন্মাইতে অত্যুর্ব্বর দো-আঁশ মাটি আবশ্যক

মাটিতে জল দাঁড়াইলে বা জল বসিলে তামাক জন্মাইবার জন্য ঐ মাটি অনুপযুক্ত মনে করা উচিত। গৃহের নিকটবর্ত্তী জমিতে তামাক জন্মাইলে ফল ভাল হয়। কর্দ্দমময় জমিতে গাছ উত্তম জন্মে বটে, কিন্তু তামাক পাতা নিতান্ত বড় ও মোটা হওয়া উচিত নহে। এরূপ জমিতে ফলন অধিক হয় কিন্তু জিনিষ খারাপ হয়। চুরুট প্রস্তুতের উপযুক্ত তামাক প্রস্তুত করিতে হইলে বালুকা-প্রধান উর্ব্বর জমি (অর্থাৎ জৈবিক পদার্থ প্রধান বালুকাময় জমি) নির্ব্বাচিত করা উচিত। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে চুরুট্ প্রস্তুতের উপযুক্ত তামাক জন্মাইতে পারা যায় না। পান যেমন আচ্ছাদনের নিম্নে জন্মান হয়, তামাকও সেইরূপ আচ্ছাদনের নিম্নে লাগাইলে চুরুট্ প্রস্তুতের উপযোগী পাতা জন্মে। তামাক প্রস্তুতের জন্য আচ্ছাদন কেবল উপর দিকেই থাকা উচিত। তামাকের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার ছাই, সোরা, জিপ্সাম্ ও চুণ। উর্ব্বর জমি নির্ব্বাচিত করিয়া লইলে প্রথম বৎসর, বিনা-সারে তামাক জন্মাইয়া ছাই ও সোরা সার দ্বিতীয় বৎসর হইতে ব্যবহার করিলে চলে। তামাক একই জমিতে ৩।৪ বৎসর ধরিয়া উপর্য্যুপরি জন্মাইলে ক্ষতি হয় না, তবে দ্বিতীয় বৎসর হইতে সার দেওয়া আবশ্যক করে। ভুট্টা অথবা পাট বা আউশ ধান লাগাইবার পরে তামাক লাগাইলে বৎসরে দুইটি ফসল লওয়া চলে; কিন্তু ভুট্টা ও পাট বা আউশ্ ধান জন্মাইলে জমির উর্ব্বরতা অল্প-বিস্তর লাঘব হয়। বর্ব্বটী জন্মাইলে জমি আরও উর্ব্বর হয় এবং এই ফসলটী তামাকের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে জন্মাইতে পারিলেই ভাল হয়।

একবিঘা জমির জন্য অর্দ্ধ তোলা তামাকের বীজ হইলেই চলে। তামাকের বীজ ঠিক কপির বীজের ন্যায় ভাঁটিতে আচ্ছাদনের

নিম্নে লাগাইতে হয়। কপির বীজ লাগাইবার এক মাস পূর্ব্বেও তামাকের বীজ লাগাইলে চলে, কেন না জল জমি হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপায় থাকিলে বৃষ্টি-পাত দ্বারা তামাকের তাদৃশ ক্ষতি হয় না। বস্তুতঃ তামাক বার মাস লাগাইতে পারা যায়। তবে ভাদ্র-আশ্বিনই তামাক লাগাইবার প্রশস্ত সময়। বীজ ভাঁটিতে লাগাইয়া ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এক মাস ধরিয়া উপর্য্যুপরি ৮।১০ বার লাঙ্গল দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। জমি যদি নিতান্ত উর্ব্বর না হয় তাহা হইলে পচা গোবর-সার ও ছাই ব্যবহার করা উচিত। জিপ্-সামের পরিবর্ত্তে, সোডা-ওয়াটার লেমনেডের কলের পরিত্যক্ত চুণের ন্যায় সামগ্রী ব্যবহার করা চলে। জিপ্সাম্ বা কলের পরি-ত্যক্ত চুণ বিঘা প্রতি দুই মণ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ছাইও এই পরিমাণে ব্যবহার করিলে চলে। গোবর-সার পূর্ব্ব হইতে জমিতে ছিটাইয়া দিয়া লাঙ্গল-মৈ দিতে হয়। ইহার পরিমাণ বিঘা প্রতি জমির অবস্থানুসারে ২০০/ মণ পর্য্যন্ত ব্যবহার করা চলে। ভাঁটির চারা-গুলিতে ৩।৪ টী করিয়া পাতা জন্মাইলে উহাদের শিকড়-শুদ্ধ সাবধানে উৎখাত করিয়া লইয়া সন্ধ্যার সময় ক্ষেত্রে পুতিয়া দিতে হয়। গাছের জাতি অনুসারে ২ বা ৩ ফুট অন্তর সারি বাঁধিয়া চারা লাগান উচিত। চারা পুতিয়া আবশ্যক-মত জল সেচন করা চাই। ইহার পরেও ১০, ২০ বা ৩০ দিবস অন্তর এক বার করিয়া নালা বাহিয়া জমিতে জল দেওয়া উচিত। প্রত্যেক বার জল দিবার পরে কাদা মরিলেই এক বার করিয়া জমি হো করা আবশ্যক।

গাছ-গুলির পুষ্পদণ্ড বাহির হইবার পূর্ব্বেই মস্তকের অঙ্কুরটী ও নিম্নস্থ অপরিষ্কার পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া বাদ দিয়া যাইতে হয়। ইহাতে প্রত্যেক গাছে ৮।১০ টী করিয়া সতেজ পত্র থাকিয়া যাইবে। যে গাছ

গুলি বীজের জন্য রাখিতে হইবে সে গুলির মস্তকের অঙ্কুর ভাঙ্গিতে নাই। পরে যদি গাছ গুলির পার্শ্ব হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে থাকে সে গুলিও বিলম্ব না করিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইতে হয়। মস্তকের ও পার্শ্বের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়াই ক্ষত স্থানে শুষ্ক মৃত্তিকা মাখাইয়া রস পড়া থামাইয়া দিতে হয়।

পত্র-গুলি পুরু ও পাকামত বোধ হইলে উহা দিগকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করা উচিত। পাতা অধিক পাকিয়া গেলে ভাল তামাক প্রস্তুত হয় না। দুই একটী পাতায় রং ধরিয়াছে এইরূপ অবস্থায় গাছ গুলি কাটিয়া লইতে হয়। বেলা ৮।৯ টার সময় গাছ কাটা উচিত। গাছ কাটিয়া দুই ঘণ্টা রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিয়া পরে ঘরের ভিতরে লইয়া যাওয়া উচিত। পাতা গুলি এক একটী করিয়া না ভাঙ্গিয়া একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া গাছগুলি কাটাতে উহাদের শুকাইবার জন্য ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবার সুবিধা হয়। দুর্গন্ধ-ময় গৃহ তামাক শুকাইবার জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে। পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালিত গৃহে রজ্জুর উপর দুই মাস কাল তামাক গাছ-গুলি ঝুলিয়া রাখিলে উহারা উত্তম রূপে শুকাইয়া যাইবে। শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ু বহিলে গৃহের দ্বার-জানালা বন্ধ রাখা উচিত, কেননা পত্র-গুলি অধিক শুকাইয়া গেলে উহারা নামাইবার সময় গুঁড়াইয়া যায়। ফাল্গুণ-চৈত্র মাস পড়িয়া গেলে গৃহের মধ্যে জল ছিটানও আবশ্যক হইতে পারে। বর্ষা পড়িলে গাছ গুলিকে রজ্জু হইতে নামাইতে হয়। ডাল, ডাঁটা শির, সমস্ত সযত্নে কাটিয়া ও চিরিয়া ফেলিয়া দিয়া, এক এক রকমের পাতা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সাজাইয়া, ১৬ হইতে ২০ টি এক এক বাণ্ডিলে বাঁধিয়া, বাণ্ডিল গুলি ৩।৪ ফুট চৌকা ও ৫।৬ ফুট উচ্চ করিয়া, সাজাইয়া এক একটা গাদা প্রস্তুত করিতে হয়। গাদা-গুলি হাত দিয়া

উত্তমরূপে চাপিয়া দিয়া, সপ্তাহে একবার করিয়া ওলট্ পালট্ করিয়া দিতে হয়; অর্থাৎ উপরের ও পার্শ্বের বাণ্ডিল-গুলি মাঝে, মাঝের গুলি বাহিরে, নীচের গুলি উপরে এইরূপ করিয়া গাদা-গুলি সপ্তাহে একবার করিয়া পুনর্গঠন করিয়া দিতে হয়। ওলট্ পালট্ করিবার সময় তাপমান যন্ত্র দ্বারা প্রত্যেকবার দেখা উচিত যেন গাদার মধ্যে ৯০. ফারেন্‌হিট্ এর অধিক তাপ না থাকে। বর্ষার সময় বঙ্গদেশের কোন কোন জেলায় গাদার মধ্যে এইরূপ তাপ রক্ষা করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রে নহে। বর্ষা শেষ হইলেই তামাক প্রস্তুত শেষ হইয়া যায়। পরে গাদা ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট বস্তা বাঁধিয়া তামাক চটের মধ্যে জড়াইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিতে হয়।

চুরুট প্রস্তুতের উপযুক্ত তামাক জন্মানর পরীক্ষা বঙ্গদেশের কয়েক স্থানে চলিতেছে। এ সম্বন্ধে আয়, ব্যয় ও উৎপন্নের হিসাব দেওয়া এখনও সম্ভবপর হয় নাই। দেশী নিয়মে তামাক জন্মানতে বিঘা প্রতি ৩০।৪০ টাকা খরচ হয় ও ৬।৭ মণ তামাক জন্মাইতে পাবা যায়। দেশী তামাকের দাম ৪৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা মণ।

মাদুর-কাঠি।— ইহা মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটী জেলাতে অত্যন্ত লাভবান ফসল বলিয়া গন্য। উচ্চ আঁঠিয়াল-মাটি যুক্ত ক্ষেত্র এই ফসলের উপযোগী। মেদিনীপুর জেলায় অনেক কৃষক তুঁতগাছের আবাদ ছাড়িয়া দিয়া তুঁতের জমিতে মাদুর-কাঠি লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তুঁতের আবাদে খরচ অধিক, এবং পোকা উত্তম জন্মিলেই এক বিঘা তুঁতের জমিতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ দাঁড়া-ইতে পারে, পোকা ব্যারামে নষ্ট হইলে তুঁতের আবাদে লাভ নাই। মাদুর-কাঠি আবাদ করিতে প্রথম বৎসরের পরে প্রতি বৎসর বিঘা প্রতি ১৫৲ টাকা মাত্র খরচ হয়, কিন্তু আয় বৎসরে বিঘাপ্রতি প্রায়

১০০৲ টাকা হইয়া থাকে। মাদুর কাঠির জড়ি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে লাগাইতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসে জমি কোপাইয়া, মুথা ও ঘাস মারিয়া, পৌষ ও মাঘ মাসে লাঙ্গল-মৈ দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিয়া, যেমন বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ভালরূপ বৃষ্টি হইয়া জমি ভিজিয়া যাইবে অমনই জড়ি বা মূল যোগাড় করিয়া, জমিতে ভিলি প্রস্তুত করিয়া উহা সারি সারি ভিলির মধ্যে সাজাইয়া দিয়া, ভিলির উপর মাটি চাপাইয়া দিতে হয়। ভিলি এক ফুট অন্তর করিবার নিয়ম আছে। পরে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের মধ্যে দুইবার নিড়ানের আবশ্যক। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে মাদুর-কাঠি অর্থাৎ গাছের পুষ্প দণ্ড-গুলি চারি হাত পরিমাণ উচ্চ হইয়া গেলেই উহাদের মাদুর ও মসলন্দ প্রস্তুতকারী কারিগরদের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। কাঠি বিক্রয় হইয়া গেলে জমিতে পাঁক দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাঁক জমিতে পালা দিয়া রাখিয়া বৈশাখ মাসে জমির উপরিভাগ কোদাল দ্বারা চাঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া পাঁক ছিটাইয়া দিতে হয়। কাঠিগুলি কাটিয়া দুই তিন দিবস জমিতে ফেলিয়া রাখিয়া পরে মাথার ফুল ভাঙ্গিয়া দিয়া এক একটী কাঠি ছুরিদ্বারা দুই হইতে চারি ভাগে লম্বা-লম্বী চিরিয়া ফেলার নিয়ম আছে। যে কাঠি-গুলি মোটা হয় উহাদের মধ্যকার শাঁসটী বাদ দিবারও নিয়ম আছে। মসলন্দ প্রস্তুত করিতে চেরা কাঠিকে আরও সূক্ষ্ম করিয়া চিরিতে হয়। দ্বিতীয় বার চিরিতে গেলে কাঠি গুলিকে জলে ভিজাইয়া চিরিতে হয়। মাদুর-কাঠি জন্মাইয়া মাদুর ও মসলন্দ প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করা অন্যান্য জেলাতেও হইতে পারে। মাদুর-কাঠি একবার লাগাইলে ও প্রতি বৎসরে জমি চাঁচা ও পাঁক দেওয়া ঠিক্ রাখিতে পারিলে ১০।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত উহা জমিতে থাকিয়া যায়।

বাঁশ।—ভাল্কী-বাঁশ, বেড়-বাঁশ, কাঁটা-বাঁশ ও তল্তা-বাঁশ, এই চারি জাতীয় বাঁশ বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ভাল্কী বাঁশই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। ইহা অন্যান্য বাঁশ অপেক্ষা মোটা, লম্বা ও দৃঢ় হইয়া থাকে। তল্তা বাঁশ চেটাই, চেঙ্গারী প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাঁটা-বাঁশও বিলক্ষণ সক্ত, কিন্তু ইহার গাত্রে কাঁটা কাঁটা খোঁচা থাকিবার কারণ, ইহা কাটিবার ও ঝুড়িবার পক্ষে কিছু অসুবিধা হয়। বাঁশের আবাদ করিতে হইলে ভাল্কী ও তল্তা বাঁশ লাগানই ভাল। উচ্চ দোয়াঁশ মাটি ও আঁঠিয়াল মাটি বাঁশ জন্মাইবার উপযুক্ত। লাগাইবার ৪০।৫০ বৎসর পরে বাঁশের ফুল ও বীজ হইয়া গেলে বাঁশ গাছ মরিয়া যায়। বাঁশের বীজ পার্শ্বস্থ জমিতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়া পুনরায় বাঁশের গাছ বাহির হয়। বাঁশের মুড়া বা জড় সুদ্ধ কাঁচা বাঁশের খণ্ড বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে পুতিলেও বাঁশ গাছ জন্মিয়া থাকে। যে বাঁশ কোন গতিকে মচ্কাইয়া বা বাঁকিয়া ভূতল-শায়ী হইয়া যায় উহা হইতে গাঁঠে গাঁঠে শিকড় বাহির হয়। এইরূপ বাঁশের মুড়া পুতিলে সহজে গাছ হয়। ঝাড়ের মধ্য হইতে একটা কাঁচা বাঁশ টানিয়া নমিত করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে শায়িত ভাবে রাখিয়া দিলেও, গাঁইট্ গুলি হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাঁশের চারা বাহির হয়। চারা গুলি পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শিকড় শুদ্ধ উঠাইয়া লইয়া মাঠে লাগান চলে। পাঁচ ছয় বৎসর যত্ন করিলে অর্থাৎ পাঁক ও ছাই দিয়া কোপাইতে পারিলে, বাঁশের উত্তম ঝাড় বাঁধে। তখন প্রত্যেক ঝাড় হইতে ৮।১০ খানা বাঁশ কাটিয়া বাহির করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। ১৫ হাত অন্তর ঝাড় লাগাইলে একার প্রতি প্রায় ৯০ ঝাড় বাঁশ জন্মিতে পারে। ভাল্কী বাঁশ পল্লিগ্রামেও টাকায় ৮ খানার অধিক পাওয়া যায় না। একারণ এক একার বাঁশ

হইতে পাঁচ বৎসর পরে প্রায় ৮০০ বাঁশ ১০০৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। বাঁশ কাটিবার উপযুক্ত সময় অগ্রহায়ণ হইতে ফাগুন পর্য্যন্ত। ঝাড় গুলি ৫ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত আরও বাড়িতে থাকে, তখন ক্রমশঃ বৎসরে ১২, ১৫ বা ২০ খানি বাঁশ এক এক ঝাড় হইতে কাটিয়া বাহির করা যাইতে পারে। ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁশ ঝাড় পাঁক বা পলিমাটির জোরে সমভাবে রাখিতে পারা যায়, এবং একার প্রতি ক্রমশঃ ১০০৲ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় দাঁড়াইতে পারে। বঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থানে ভালকী বাঁশ অপেক্ষাও নিরেট্‌ ও সরু বাঁশ পাওয়া যায়। বাঁশের পরিবর্ত্তে জঙ্গলী ফলসা-গাছ জন্মানতে অধিক উপকার দেখিতে পারে। জঙ্গলী ফলসা-গাছকে উত্তর-উড়িষ্যায় কলিতা ও দক্ষিণ-উড়িষ্যায় বরঙ্গা গাছ কহে। ইহার কাষ্ঠ দৃঢ় অথচ বাঁকাইলে ভাঙ্গিয়া যায় না। ইহা হইতে যেরূপ ভার, ধনু, গাড়ির বোম, বেণ্ট্‌-উড্‌-চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে, বাঁশ হইতে তেমন হয় না। তবে বাঁশের দীর্ঘতার কারণ ভারা বাঁধিবার জন্য ইহার উপযোগিতা অধিক।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। শ্রেষ্ঠ বীজ জন্মাইতে হইলে কি কি বিশেষ প্রকরণে কার্য্য করা আবশ্যক?

২। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূভাগের কৃষিকার্য্যের কাল সম্বন্ধে কিরূপ তারতম্য লক্ষিত হয়?

৩। বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ মাসে ক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্য করিয়া বার মাস কৃষি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা যায় ইহা দেখাইয়া দাও। কোন্ কোন্ মাসে ক্ষেত্রের কার্য্য কিছু অধিক হইয়া থাকে? ইহার কারণ কি?

৪। বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান ফসল গুলির নাম কর। কোন্টী কোন্ মাসে লাগাইতে হয় ও কাটিতে হয়? কোন্ ফসলটি জন্মাইতে কত বীজ লাগে এবং কোন্ ফসল কি পরিমাণে হইতে পারে তাহার একটী তালিকা দাও।

৫। বঙ্গদেশে যে সকল জাতীয় আলু জন্মান হইয়া থাকে তন্মধ্যে কোন্ গুলি শ্রেষ্ঠ?

৬। আলুর বীজ কিরূপে রক্ষা করিতে হয়?

৭। কোন্ জাতীয় আলুর কি পরিমাণে বীজ লাগে? কোন্ নিয়মে আলু লাগাইলে বীজ অধিক লাগে? এ নিয়মে আলু লাগাইয়া ফল কি?

৮। আলু পুতিবার সময় কি কি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য?

৯। কিরূপ জমিতে বা কিরূপ অবস্থায় আলু অধিক জন্মে?

১০। আলুর জল-সেচন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ। প্রণালী বাহিয়া জল সেচন করা ও জমি ডুবাইয়া জল সেচন করা এই দুইটীর মধ্যে কোন্টী আলু চাষ সম্বন্ধে অবলম্বনীয়।

১১। আলুর চাষে দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল ও হাণ্টার-হো কিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে?

১২। আলু জন্মাইতে গেলে কিরূপ সার ব্যবহার করা উচিত? কোন্ কোন্ ফসলের পর আলু জন্মাইলে বিনা সারেও আলু ভালরূপ জন্মে?

১৩। আলুর চাষ আনুপূর্ব্বিক সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৪। আলুর চাষে একার প্রতি কি পরিমাণে ব্যয় ও আয় হইতে পারে?

১৫। আলু ও কপিতে যে সকল কীট লাগে তাহাদের নিবারণের উপায় কি?

১৬। ফুল-কপি, বাঁধা-কপি ও ওল্-কপির চাষ সংক্ষেপে বর্ণনা কর?

১৭। পটোলের চাষ বর্ণনা কর।

১৮। পাট চাষের উন্নতি সম্বন্ধে একটী পবন্ধ লিখ।

১৯। এদেশে কার্পাস চাষের উন্নতি কি কি উপায়ে হওয়া সম্ভব তাহা বর্ণনা কর।

২০। পান-চাষ বর্ণনা কর।

২১। তামাক-চাষ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর।

২২। মাদুর-কাঠি কিরূপে প্রস্তুত হয়?

২৩। বাঁশ জন্মাইতে হইলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত?

২৪। ভার, ধনু, গাড়ির বোম, ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হইলে বাঁশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন্ কাষ্ঠ ব্যবহার হইতে পারে?

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রেশম-কীট পালন।

গরদ, তসর, এণ্ডি, বাফ্‌তা, প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বস্ত্র রেশম হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গরদ কাপড় যে সূত্র হইতে প্রস্তুত হয়, উহা পলু-পোকা দ্বারা নির্ম্মিত কোয়া হইতে উৎপন্ন। এই পোকা তুঁত পাতা খাইয়া জীবিত থাকে। পলু-পোকা নানা জাতীয়। বঙ্গদেশে বড়-পলু, ছোট-পলু, নিস্তারী-পলু ও চীনা-পলু, এই চারি জাতীয় পলু-পোকা পালিত হইয়া থাকে। ফ্রান্স, ইটালী, চীন ও জাপান দেশে যে জাতীয় পলু-পোকা পালিত হয়, কাশ্মীর রাজ্যেও ঐ জাতীয় পলু পালিত হইয়া থাকে। এই কয়েক জাতীয় পলু পোকা বা তুঁত-পোকার মধ্যে বিলাতী-পলুই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ রেশমযুক্ত বড় বড় কোয়া প্রস্তুত করে। বঙ্গদেশের বড়-পলুও নিতান্ত মন্দ কোয়া প্রস্তুত করে না। বড়-পলুর কোয়া প্রায় সুভ্র বর্ণের হইয়া থাকে। সুভ্র বর্ণের বড়-পলুর কোয়া হইতে যেরূপ সুন্দর রেশম প্রস্তুত হয়, ছোট-পলু, নিস্তারী বা চীনা-পলু হইতে সেরূপ রেশম কখনই প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশের পলু ব্যবসায়ীগণ ও রেশম কুঠির সাহেবগণ এই জাতীয় রেশম যাহাতে অধিক জন্মে তদ্বিষয়ে কোনই যত্ন করেন না। বড়-পলুর পালন সম্বন্ধে একটী বাধা আছে। দশমাস ধরিয়া ইহার ডিম অস্ফুট অবস্থায় থাকে। বিলাতী পলুর ডিমও এইরূপে দশমাস অস্ফুটাবস্থায় অবস্থিতি করে। দশমাস কাল হাঁড়ির মধ্যে বড়-পলুর ডিম রক্ষা করিয়া, পরে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিনে হাঁড়ির ঢাকনা খুলিয়া দিলে, কয়েক দিবসের মধ্যে ডিম মুখাইয়া যায়। উষ্ণ বা আলোকময় স্থানে হাঁড়ি খুলিয়া রাখিলে ডিম ভাল করিয়া মুখায় না। শীতল অন্ধকারময় গৃহে ডিমের হাঁড়ি শিকায় করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে ডিম ভাল করিয়া

মুখায়। বিলাতী পলুর ডিম নিতান্ত শীতল স্থানে না রাখিলে এক কালীন মুখায় না। এদেশে এরূপ শীতল স্থান শীতকালে পার্ব্বত্য প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ শীতে জল বরফ হইয়া যায় এরূপ শীতে বিলাতী পলুর ডিম কয়েক সপ্তাহ রাখিতে পারিলে পরে উষ্ণ স্থানে আনয়ন করিয়া দিবারাত্র উষ্ণতার মধ্যে রাখিয়া ডিম মুখাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। বিলাতী পলু পুষিবার জন্য ৭৪°-৭৫° ফারেনহিট্ উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। ডিম মুখানর জন্যও এই পরিমাণ উত্তাপ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই উত্তাপে আনিবার পূর্ব্বে কয়েক সপ্তাহ ৩২°-৩৪° ফারেন উত্তাপ আবশ্যক। এইরূপ শীতোত্তাপের ব্যবস্থা ঠিক্ করিয়া বিলাতী পলু পুষিতে পারিলে ফ্রান্স, ইটালী ও কাশ্মীরের ন্যায় কোয়া ফাল্গুন মাসে বঙ্গদেশেতেও জন্মাইতে পারা যায়। কুঠিয়াল সাহেবেরা উদ্যোগী হইলে এ কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

ছোট-পলু, চীনা-পলু ও নিস্তারী-পলুর ডিম গ্রীষ্মকালে ৮ দিবসে, বর্ষাকালে ১০ দিবসে এবং শীতকালে ১৫-২০ দিবসে মুখাইয়া থাকে। ডিম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের কৃমিবৎ কীটগুলি বাহির হইয়া তুঁত পাতা খাইতে আরম্ভ করে। ডিম ডালার বা কাগজের উপরে পাড়াইয়া, উহা হইতে কৃমি নির্গত হইলেই উহার উপরে কচি কচি তুঁত পাতা সরু সরু করিয়া কুচাইয়া ছিটাইয়া দিতে হয়। পরে পাতার কুচির উপর পোকা গুলি উঠিয়া গেলে পোকা শুদ্ধ পাতা গুলি আর একখানি ডালায় রাখিয়া উহার উপর তাজা পাতা কুচাইয়া পুনরায় ছিটাইয়া দিতে হয়। এইরূপ ৫-৬ বার প্রত্যহ পাতা কুচাইয়া দিলে ৪-৫ দিবস পরে পোকা গুলি নিশ্চল-নিস্পন্দ-বৎ হইয়া পড়িবে। এই সময়ে উহারা প্রথমবার খোলষ ছাড়ে। এই সময়ে উহারা কিছু খায় না। এক দিবস কাল এই সময়ে উহাদের উপর পাতা দেওয়া বন্ধ রাখা আবশ্যক। পরে যখন পোকাগুলি পুনরায় নড়িতে থাকিবে এবং এরূপ বোধ হইবে উহারা ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতেছে তখন পুনরায় পাতা কুচাইয়া উহাদের উপর দিতে হইবে। এইরূপে খাইতে খাইতে চারিবার উহারা খোলষ ছাড়ে

এবং প্রত্যেকবার খোলষ ছাড়িবার সময় ন্যূনাধিক একদিবস কাল আহার দেওয়া বন্ধ রাখিতে হয়। তৃতীয়বার খোলষ ছাড়িবার পরে আর পাতা কুচাইয়া দিবার আবশ্যক করে না। চতুর্থবার খোলষ ছাড়িবার পরে পোকা গুলি শন্ শন্ শব্দে পাতা খাইতে থাকে এবং পাতা দিবার অল্পক্ষণ পরেই খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে। পাতা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই যে ঘন ঘন পাতা দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই; বরং চতুর্থবার খোলষ ছাড়িবার পরে পাতা দুই একবার কম দেওয়াই ভাল। যদি প্রথম ৪।৫ দিবস ছয়বার করিয়া পাতা দেওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় পাঁচবার করিয়া, চতুর্থ অবস্থায় চারিবার করিয়া এবং পঞ্চম অবস্থায় (অর্থাৎ চারিবার খোলষ ছাড়িবার পরে ৬ হইতে ১০ দিবস) তিনবার করিয়া পাতা দেওয়া উচিত। অত্যধিক পাতা দিলে শেষ অবস্থায় পোকা গুলি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পোকা গুলি গ্রীষ্মকালে ৩।৪ দিবস অন্তর একবার করিয়া খোলষ ছাড়ে; শীতকালে ৫।৬ দিবস অন্তর খোলষ ছাড়ে। চতুর্থবার খোলষ ছাড়িবার পরে পোকাগুলি গ্রীষ্মকালে ৬।৭ দিবস ও শীতকালে ১০।১২ দিবস আহার করিয়া পরে কোয়া প্রস্তুত করে। কোয়া প্রস্তুত করিবার জন্য যখন পোকা গুলি আহার পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে এদিক্ ওদিক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ও মুখ হইতে একটু একটু করিয়া রেশম বাহির করে, তখন উহাদের বাছিয়া লইয়া শুষ্ক গাছের ডাল পালার মধ্যে অথবা চন্দ্রকী নামক বাঁশের চেটাই দ্বারা প্রস্তুত বিশেষ আধারের উপর রাখিয়া দিলে উহারা সহজে দুই দিবসের মধ্যে কোয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলে।

ভুক্তাবশিষ্ট পাতা ও নাদি সাফ্ করিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য পলুর উপর পুঁঠিমাছ ধরা জাল একখণ্ড বিছাইয়া উহার উপর তাজা পাতা ছিটাইয়া দিতে হয়। আরও দুই তিনবার পাতা দিবার পরে আর একখানি জাল বিছাইয়া উহার উপর পাতা ছিটাইতে হয়। এক দিবস হইয়া গেলে উপরকার জাল খানি কিছু ভুক্তাবশিষ্ট পত্র ও পোকাগুলি সমেত উঠাইয়া লইয়া আর একখানি

ডালায় রাখিয়া নিম্নের জাল ভুক্তাবশিষ্ট পাতা ও ডালা বাহিরে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া ঝাড়িয়া, জালখানি পূর্ব্বোক্ত জালের উপর বিছাইয়া দিয়া তাজা পাতা উহার উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। নিম্নের জালের উপরস্থিত পোকাগুলি উপরের জাল ভেদ করিয়া তাজা পাতার উপর আসিয়া পাতা খাইতে থাকে। এইরূপ ভাবে প্রত্যহ একবার করিয়া ডালা গুলি সাফ্ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ব্যাধির বড় ভয় থাকে না।

প্রথমাবধিই পলুগুলি যেন নিতান্ত ঘন না হইয়া থাকে তাহার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। জাল ব্যবহার দ্বারা ঘন পলু অনায়াসে পাত্‌লা করিয়া ফেলা যায়। ডালার উপর পলু ঘন হইয়া আছে মনে হইলেই উহার উপর একখানি জাল বিছাইয়া টাট্‌কা পাতা ছিটাইয়া দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া জালখানি উঠাইয়া অন্য এক ডালায় রাখিলে দেখা যাইবে পূর্ব্বোক্ত ডালার পলু আর তত ঘন নাই, অনেক পলু উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক অবস্থায়, অর্থাৎ পলু গুলি এক একবার খোলষ ছাড়িবার পূর্ব্বে, এক ডালার পলু তিন ডালা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। চতুর্থবার খোলষ ছাড়িবার পরে প্রত্যেক ডালার পলু দুই ডালা করিয়া দেওয়া উচিত। প্রথমাবধি পলু যদি ডালায় পাতলা করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে শেষাবস্থায় পলু কিছু ঘন থাকিলেও তত ক্ষতি হয় না। শেষাবস্থাতেই অধিক পলু ব্যারামে মরে, কিন্তু প্রথমাবধি অযত্ন করিলে অথবা বীজের দোষ হেতু পলু শেষাবস্থায় মরিয়া থাকে। বীজ ভাল হইলে, এবং সযত্নে পলু পালন করিলে ব্যারামে কখনই পলুর হানি হইতে পারে না।

কেবল পলু পাত্‌লা করিয়া দেওয়া ও প্রত্যহ ডালা পরিষ্কার করা ব্যতীত আরও কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। পলুর ঘরে প্রবেশ করিলেই যদি ঘর নিতান্ত গরম অথবা নিতান্ত ঠাণ্ডা এরূপ বোধ হয় তাহা হইলে তদ্বিষয়ের প্রতিকার আবশ্যক। পলুরউ পর

বড় জাতীয় একপ্রকার মাছি (চিত্র দেখ) বসিয়া ডিম্ পাড়িয়া যায়। এই ডিম্ হইতে কৃমি নির্গত হইয়া পলুব শরীরের মধ্যে

৫০ চিত্র। পলু-পোকা।

প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ পলুকে মারিয়া ফেলে। এই মাছি নিবারণ করিবার জন্য পলু ব্যবসায়ীরা ঘরের দ্বার-জানালা সর্ব্বদাই রুদ্ধ রাখে। বড় বড় জানালা যদি তারের জাল দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মাছিও আসিতে পারে না অথচ হাওয়াও ঘরের মধ্যে আসিতে পারে। এইরূপ তারের জাল দ্বারা আবৃত জানালার বহির্ভাগে যদি সরা বা গাম্লায় করিয়া কেরোসিন্ তৈল মিশ্রিত জল কিছু উচ্চ স্থানে রাখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মাছি গুলি পলুর ঘরে প্রবেশ করিবার আশায় জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিয়া যায়। উহারা জানালার মধ্যে দিয়া পলুর গন্ধ পাইয়া মত্তপ্রায় হইয়া জানালার বহির্ভাগস্থ জলাধার-গুলিকে পলুর ঘরে প্রবেশ করিবার রন্ধ্র মনে করিয়া বেগে যেমন প্রবেশ করিতে যায় অমনই জলে ডুবিয়া যায় এবং কেরোসিনের কণা মাত্র গাত্রে লাগিলেই উহারা মরিয়া যায়। পাছে দ্বার-পথে মাছি প্রবেশ করে এজন্য দ্বারের বহির্ভাগেও কিছু ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। এখানে আর একটা বাসের ঘর থাকিলে এই ঘরে প্রথমে প্রবেশ করিয়া পরে পলুর ঘরে যাওয়া চলে। বাসের ঘর ও পলুর ঘর উভয় ঘরের দ্বারের সম্মুখেই চিক্ বা সড়্কি ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রবেশ-পথে যাহাতে পলুর গন্ধ না পাওয়া যায়, তজ্জন্য ঘুঁটের আগুনের ধূম অথবা ধুনার ধূম একটা মাল্শা হইতে যেন দ্বারের বহির্ভাগে সমস্ত দিবস উঠিতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পলুর মাছি দ্বার-দেশে মাছির গন্ধের পরিবর্ত্তে ধুনার অথবা ঘুঁটের আগুনের ধূমের গন্ধ পাইয়া জানালা গুলির বহির্ভাগেই উড়িতে থাকে এবং এখানে পলুর ঘরে প্রবেশ করিবার অন্য পথ না পাইয়া জলাধার গুলি প্রবেশ-পথ মনে করিয়া ডুবিয়া মরে।

পলুর ঘরে হাওয়া প্রবেশ করিবার উপায় করিয়া দেখিতে হইবে যেন পলুর গায়ের উপর দিয়া টানা বাতাস না বহিয়া যায়। টানা-বাতাসে পলুর ব্যারাম হয়। দেওয়ালের সমক্ষে পলুর ডালা রাখিবার মাচান বাঁধিতে হয় এবং জানালা এই মাচানের পার্শ্বে যাহাতে পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। শীতকালে, অথবা বেগে বায়ু বহিতে থাকিলে জানালার কবাট বন্ধ করিয়া রাখা উচিত। কিন্তু এককালীন ঘরের দূষিত বায়ু বহির্গমনের পথ না থাকিলে পলুর ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। মাচানের উপরে দেয়ালের মধ্যে তারের জাল দ্বারা আবৃত দুই চারিটী ছোট ছোট গবাক্ষ থাকা কর্ত্তব্য। এই গবাক্ষ পথে পলুর ঘরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়। রাত্রি-কালে এবং শীতকালেও দুই একটী ঊর্দ্ধ দিকের গবাক্ষ খুলিয়া রাখা আবশ্যক। তবে শীতকালে উত্তর দিকের গবাক্ষ খুলিয়া না রাখিয়া দক্ষিণ দিকের গবাক্ষ খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। চৈত্র-বৈশাখ মাসে দিবাভাগে কোন কোন দিন এমন গুমট্ পড়ে যে ঐ কয়েক দিন ৩।৪ ঘণ্টা পলুর ঘরে পাখা করিয়া ঘর ঠাণ্ডা রাখিতে হয় নতুবা পলু সল্‌ফা বা হাঁসা নামক রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়। মানুষের আরামের জন্য ঘরের যেরূপ অবস্থা আবশ্যক পলু পালনের জন্যও ঘরের সেইরূপ অবস্থা আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিশুদ্ধ বীজ, অর্থাৎ, রোগশূন্য ডিম ব্যবহার করিলে এবং সযত্নে পলু পুষিলে, পলু রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যাইতে পারে না। বিশুদ্ধ বীজ সংগ্রহ করিবার উপায় প্রসিদ্ধ ফরাশিস্ বৈজ্ঞানিক মোসিউ পাষ্টার্ আবিষ্কার করিয়াছেন; প্রজা-পতি গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে (যথা, পৃথক্ পৃথক্ খুরির নীচে কাগজের উপরে) ডিম্ পাড়াইয়া, পাঁচ ছয় দিবস পরে এক একটী

প্রজাপতি লইয়া উহার শরীরাভ্যন্তরের কিছু রস অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পরীক্ষা করিয়া সুগের দানার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে, ঐ প্রজাপতি যে ডিমগুলি পাড়িয়াছে ঐ গুলি কাগজশুদ্ধ ছিঁড়িয়া লইয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। যে প্রজাপতির রস পরীক্ষা করিলে রোগের উক্ত লক্ষণটী দৃষ্টিগোচর না হইবে উহার ডিম সযত্নে পালন করিলে উত্তম ফল পাওয়া যাইবে।

বিশুদ্ধ ডিম উক্ত উপায়ে সংগ্রহ করিয়া লইয়া, ডিম, ডালা, ঘর প্রভৃতি সমস্ত তুঁতিয়ার জলে ধৌত করিয়া বা নিকাইয়া লইয়া পলু পালন করিলে পলুর ব্যাধি হয় না। ঘরের ও মাচানের সকল স্থান তুঁতিয়ার জলে নিকাইতে পারা যায় না বলিয়া নিকানর পরে গন্ধকের ধূম দ্বারা, ঘর, ডালা, ইত্যাদি বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। এক ছটাক তুঁতিয়া গুঁড়া করিয়া ছয় সের গরম জলে মিশাইয়া ঘর, ডালা ও মাচান নিকান উচিত। এক পোয়া গন্ধক গুঁড়া করিয়া একটা হাতায় রাখিয়া হাতা অগ্নির উপর রাখিলে গন্ধক আপনি জ্বলিয়া যাইবে। এই জ্বলন্ত গন্ধক নিকান ঘরের মধ্যে রাখিয়া পলুর সমস্ত সরঞ্জাম ধৌত করিয়া ঐ ঘরের মধ্যে রাখিয়া, ঘর উত্তম করিয়া সমস্ত দিবস রুদ্ধাবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। ডিমগুলি কাগজ-শুদ্ধ তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া লইয়া শীতল স্থানে ঝুলাইয়া দিয়া শুকাইয়া লইয়া পরে পলুর ঘরে লইয়া যাইতে হয়।

পলুর ভুক্তাবশিষ্ট পত্র, নাদি ইত্যাদি পলুর ঘর হইতে অন্তরে গাদা করিয়া গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। গরু ও মহিষে এই "কাশার" ও নাদি খাইয়া থাকে। কাশার ও নাদি জমির পক্ষে অতি উত্তম সার। গাদার মধ্যে ৬।৭ মাস থাকিয়া যখন ঐ সকল পচিয়া যায়

তখন এই সার ধানের বা পাটের জমিতে দেওয়া উচিত। তুঁতের জমিতে পলুর নাদির সার দেওয়া উচিত নহে।

তুঁত-গাছ।—বঙ্গদেশে পলু-পোকা পালন করিবার জন্য যে তুঁত গাছের আবাদ করা হয় উহা নিকট নিকট জন্মাইবার কারণ এবং বৎসরে তিন চারিবার গোড়া ঘেঁষিয়া কাটা যায় বলিয়া খর্ব্বাকারই থাকিয়া যায়। এই তুঁত-গাছ যদি মধ্যে মধ্যে না কাটিয়া উহাকে রক্ষিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে উহা পেয়ারা গাছের মত বড় হয়। হিমালয় পর্ব্বতে এই তুঁত গাছ জঙ্গলী অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে আর এক জাতীয় তুঁত গাছ জন্মে। উহার পত্র বৃহদাকারের কিন্তু নিতান্ত খস্‌খসে। এই গাছ ৮০।৯০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার পাতা খাইয়া ছোট-পলু ভালরূপে পালন করা যায় না। অন্য কয়েক জাতীয় পলু-পোকাও এই পাতা খাইয়া কিছু ছোট কোয়া প্রস্তুত করে। একপ্রকার জঙ্গলী পলু-পোকা এই গাছের পাতা খাইয়া সুন্দর কোয়া প্রস্তুত করে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হিমালয় পর্ব্বতের তুঁত গাছ হইতে এই জঙ্গলী কোয়া অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এই দুই জাতীয় তুঁত গাছ অপেক্ষা বিলাতী তুঁত-গাছ অনেক ভাল। বিলাতী তুঁত-গাছ নানাজাতীয় হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে গুলি সত্বর বর্দ্ধিত হইয়া অতি বৃহদাকারের গাছে পরিণত হয়, যে গুলির পত্র বৃহদাকারের, স্থূল, কোমল, মসৃণ ও শাখার পার্শ্বে অতি নিকট নিকট সন্নিবেশিত, যে গুলির ফল আদৌ অথবা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইগুলি পলু-পোকা পুষিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী।

বীজ ও কলম উভয় সামগ্রী হইতেই তুঁত-গাছ উৎপাদন

করিতে পারা যায়। বীজ হইতে যে গাছ জন্মে উহার পাতা কিছু পাত্‌লা হয়। পলুর প্রথম দুই তিন অবস্থায় বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের পাতা দেওয়া যাইতে পারে। শেষ দুই অবস্থায় পলু কলমের গাছের পাতা খাইয়া যেমন কোয়া প্রস্তুত করে বীজের গাছের পাতা খাইয়া তেমন কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে না। এ কারণ কলম হইতেই তুঁতগাছ জন্মান কর্ত্তব্য।

যেমন আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে গোলাপ ও অন্যান্য গাছের ডাল কাটিয়া প্রস্তুত জমিতে পুতিয়া দিলে গাছ বাহির হয়, তুঁতগাছের ডালও ঐরূপ অর্দ্ধ হস্ত আন্দাজ লম্বা করিয়া কাটিয়া প্রস্তুত জমির মধ্যে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে পুতিয়া দিলে উহা হইতে গাছ বাহির হয়। পগার ও বেড়া দিয়া অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক একখানি কলম পুতিয়া, গাছ বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া ও জল দিয়া রাখিতে পারিলে জ্যৈষ্ঠমাসে গাছগুলি ৭।৮ বা ১০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠে। এই সময়ে শিকড় শুদ্ধ গাছগুলি উঠাইয়া, পাতা সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কেবল উপরের পত্রাঙ্কুরটী রাখিয়া দিয়া মাঠে ১৫।১৬ হাত অন্তর গাছ বসাইয়া দিতে হয়। যে স্থানে জল দাঁড়ায় বা বন্যার জল উঠে সে স্থানে কলমের বাগান করা বা গাছ লাগান চলিবে না। যেমন কলমের বাগান পগার ও বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হয় সেইরূপ মাঠের তুঁতগাছ গুলিও খড় কাঁটা জড়াইয়া অথবা গোবর লেপ দ্বারা গরু ছাগলের মুখ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক। দুই বৎসর রক্ষা করিবার পরে গাছগুলি বিনা যত্নেই বাড়িয়া যায়। চারি বৎসর গাছের পাতা খরচ করিতে নাই। গাছের পাতা খরচ করিলে গাছ বাড়ে না। পঞ্চম বৎসর হইতে রেশম-কীট পালনের জন্য গাছের পাতা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এক বৎসর অন্তর গাছের পাতা ব্যবহার করিবার সময় ছোট ছোট ডালগুলি ছাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে গাছের ছোট ডালগুলি বরাবরই কোমল থাকিয়া যায় এবং সহজে উহাদের নমিত করিয়া মাটিতে দাঁড়াইয়া একটী ছোট আঁকুশির সাহায্যে পত্রচয়ণ করিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা তুঁত।—পাঁচ বৎসর ধরিয়া গাছ প্রস্তুত করিয়া পরে রেশম-কীট পালন আরম্ভ করা অনেক সহিষ্ণুতার কার্য্য। বাঙ্গালা দেশে যে নিয়মে তুঁতের চাষ করা হয় তাহাতে কলম লাগাইবার তিন চারী মাসের মধ্যেই রেশম-কীট পালন আরম্ভ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের নিয়মে তুঁতের চাষ করিতে গেলে চিরকাল বৎসরে বিঘাপ্রতি প্রায় ২৫৲ টাকা খরচ পড়ে। তুঁতগাছ একবার বড় হইয়া গেলে আর কোনই খরচ নাই। এজন্য রেশম-কীট পালন আরম্ভ করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশের নিয়মে তুঁতের চাষ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য বড় বড় গাছ প্রস্তুতেস বন্দোবস্ত করা ভাল। বাঙ্গালা দেশের নিয়মে তুঁতের চাষ করিতে হইলে জমি কোদাল দ্বারা গভীর করিয়া কোপাইয়া ভাল করিয়া লাঙ্গল-মৈ দিয়া, পগার ও বেড়া দিয়া, আশ্বিন বা কার্ত্তিকমাসে এক এক স্থানে ৬।৭ খানি করিয়া কলম লাগাইয়া দুই হাত অন্তর কলমের সারি লাগাইয়া যাইতে হয়। ইহাতে দুই হাত অন্তর ঝাড় বাঁধিয়া গাছ বাহির হয়। গাছগুলি নিড়াইয়া দিলে মাঘ মাসের মধ্যেই প্রায় দুই হাত উচ্চ হইয়া থাকে। এই সময়ে গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে অথবা গোরু বাছুরকে খাইতে দিতে হয়। এই পাতা শেষাবস্থা পর্য্যন্ত রেশম-কীট পালনের পক্ষে অনুপযুক্ত। ইহাকে "নৈচা পাতা" বা নূতন গাছের পাতা কহে। এই পাতা খাইয়া পোকারা

ভাল কোয়া করে না, এবং ইহা খাইলে পোকাদের কিছু ব্যারামও হয়। নৈচা-পাতা কাটিয়া ফেলিয়া দিবার পরে চৈত্র-বৈশাখ মাসে পুনর্বায় একবার গাছগুলি কাটিবার মত হয়। এইরূপ বৎসরে গাছগুলিকে ৩।৪ বার করিয়া কাটিয়া রেশম-কীট পালনের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং প্রত্যেক বারে চাষাবাদ করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে সার ও মাটি দিয়া জমি ঠিক রাখিতে পারিলে ২০।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে বৎসরে ৪।৫ বার গাছগুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটা চলে ও রেশম-কীট পালনও চলে।

তসর-কীট পালন।—তসর-কীট শাল, আসন, অর্জ্জুন মহুয়া, সিধা, ঘুটের, বাদাম, ইত্যাদি নানা গাছের পাতা খাইয়া গাছেই কোয়া কুল, প্রস্তুত করে। রেশম-কীট যেরূপ আনুপূর্ব্বিক গৃহাভ্যন্তরে পালন করা চলে, তসর-কীট সেরূপ পালন করা চলে না। ইহাদের প্রজাপতির ডিম পাড়ান ঘরের মধ্যে চলে। ডিমগুলি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই উহা-দিগের কয়েকটী ছোট ছোট ঠোঙ্গার মধ্যে রাখিয়া গাছের স্থানে স্থানে ঝুলাইয়া দিতে হয়। কীটগুলি ঠোঙ্গার মধ্য হইতে বাহির হইয়া গাছের পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়া পাতা খাইতে থাকে। ডিমের ঠোঙ্গাগুলি গাছের উপর ঝুলাইয়া দিবার সময় হইতেই গাছের রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। পিপীলিকা উঠিতে না পারে এজন্য গাছের গুঁড়িতে ভেলার তেলের একটী বেড় দেওয়া হয়। বাদুড়ে, পাখিতে বা বোলতায় পোকা বা প্রজাপতি না খাইয়া যায় এজন্য গাছের নীচে একজন লোককে চৌকী দেওয়া আবশ্যক। ডিম অবস্থায় ৮ দিবস থাকিয়া পরে কীট জন্মে। কীটগুলি ঋতুভেদে একমাস হইতে আড়াইমাস পর্য্যন্ত গাছের পাতা খাইয়া পরে কোয়া করে। একটী গাছের পাতা খাইয়া ফেলিলে পোকা শুদ্ধ গাছের ডালগুলি কাটিয়া কাটিয়া অন্য কয়েকটী গাছে সংলগ্ন করিয়া দিতে

হয়। এ গাছগুলিরও পাতা যদি পোকা খাইয়া শেষ করে তাহা হইলে উঁহাদেরও ডাল কাটিয়া অন্য কয়েকটী গাছে লাগাইয়া দিতে হয়। আসন গাছের ডাল কাটিলে গাছ হইতে পুনরায় সহজে নূতন ডাল বাহির হয়। এজন্য আসন গাছ তসর-কীট পালনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। কোয়া প্রস্তুত শেষ হইয়া গেলে গাছ হইতে ঐ গুলি সংগ্রহ করিয়া পরে উহাদের ভাপ্ দিয়া মারিয়া উহাদের ক্ষারের জলে সিদ্ধ করিয়া সূত্র বাহির করিতে হয়। রেশমের কোয়া ভাপাইয়া পরে জলে সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে যেরূপ সহজে সূত্র বাহির হয়, তসরের কোয়া হইতে সূত্র বাহির করা ততদূর সহজে ঘটে না। সোডা, পটাশ, সাজি-মাটি, কলা গাছের পাতা ও বাসনা জ্বালাইয়া যে ছাই পাওয়া যায় ঐ ছাই, ইত্যাদি একটী সামগ্রীর সহিত তসর কোয়া জলে সিদ্ধ করিলে তবে উহা হইতে সূত্র বাহির হয়। পেঁপিয়ার রস জলে ফেলিয়া সেই জলে তসরের কোয়া এক দিবস ফেলিয়া রাখিলেও উহা হইতে সূত্র বাহির করিতে পারা যায়। কোয়ার মধ্যে যে পুত্তলি থাকে উহা বাটিয়া বা গুঁড়া করিয়া উহাও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জলে তসর কোয়া সিদ্ধ করিলেও উহা হইতে সূত্র বাহির করা যায়। ছাই ব্যবহার করিতে পাঁচশত কোয়া প্রতি অর্দ্ধসের আন্দাজ ছাই ব্যবহার করিতে হয়। সাজি-মাটি অর্দ্ধ ছটাক ব্যবহার করিলেই চলে। ক্ষার-জলে কোয়াগুলি একঘণ্টা সিদ্ধ করিবার পরে উহাদের উত্তমরূপে ভাল জলের দ্বারা ধৌত করিয়া লইয়া কাপড়ের ভিতরে রাখিয়া ছায়া স্থানে কাপড়ের উপরে ও নিম্নে শুষ্ক ছাই রাখিয়া কোয়াগুলি কিছু শুকাইয়া লইতে হয়। সিক্ত থাকিতে থাকিতেই কোয়াগুলির সূত্র লাটাইয়ে বাহির করিয়া লওয়া আবশ্যক, অভ্যাস থাকিলে একব্যক্তি একদিনে ১০০

কোয়ার সূত্র বাহির করিয়া লইতে পারে। ৩ হইতে ৮টী পর্য্যন্ত কোয়ার সূত্র এক সঙ্গে জড়াইয়া লইতে হয়। কোয়াগুলি কাটিয়া লইবার সময় যদি উহারা শুকাইয়া যায় তাহা হইলে জল ছিটাইয়া পুনরায় কিছু সিক্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বীজাহরণ।—বৃহৎ বৃহৎ ও দৃঢ় তসর কোয়া যদি না তাপাইয়া উহা হইতে প্রজাপতি বাহির হইবার জন্য একটা বাঁশের উপর খড়ের আচ্ছাদনের নিম্নে বাড়ির বাহিরে অথবা অন্য কোন উপায়ে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রজাপতি সমস্ত একই সময়ে বাহির না হইয়া ছয় মাস ধরিয়া ক্রমশঃ বাহির হইতে ও ডিম পাড়িতে থাকে। ছোট ছোট নরম কোয়া হইতে প্রজাপতি ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বাহির হয়, কিন্তু এরূপ কোয়া বীজের জন্য ব্যবহার করা নিতান্ত অন্যায়। জঙ্গলী কোয়া অথবা গৃহ-পালিত বড় বড় সক্ত কোয়া বাছিয়া লইয়া বীজের জন্য ব্যবহার করা উচিত। এ গুলির পুত্তলি বাহির করিয়া লইয়া পুত্তলিগুলি যদি ঈষৎ সিক্ত ধানের তুষ অথবা করাতের গুঁড়ার মধ্যে রাখা যায় তাহা হইলে ছোট ও নরম কোয়া হইতে যেরূপে এক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত প্রজাপতি বাহির হইয়া ডিম পাড়ে, বড় কোয়া হইতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। এই উপায় অবলম্বন করিলে তসর-কীট পালনের জন্য ছোট ও নরম কোয়া বীজের জন্য ব্যবহার করা আবশ্যক হইবে না। প্রজাপতি গুলি রাত্রিকালে বাঁশের উপর রাখিতে হয়। প্রাতঃকালে জোড়া জোড়া প্রজাপতিগুলি বাঁশ শুদ্ধ গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া বেলা ৪টার সময় স্ত্রী-গুলিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া হাঁড়ির মধ্যে ডিম পাড়িবার জন্য আটকাইয়া রাখিতে হয়। তিন দিবস পর্য্যন্ত উহারা ডিম পাড়িয়া ক্রমশঃ মরিয়া যায়।

তসর-কীটের বীজাহরণ সম্বন্ধে আরও অধিক অসুবিধা আছে। উপরিউক্ত নিয়মে পালিত তসর কোয়া হইতে যে বীজ পাওয়া যায় উহা হইতে দুইবারমাত্র কীট পালন চলে। পরে পুনরায় জঙ্গলী কোয়া অনুসন্ধান করিয়া উহার ডিম হইতে কীট পালন আবশ্যক হয়। তসর কীট যদিও সম্পূর্ণ গৃহ পালিত জীব নহে তথাপি মনুষ্য এই কীটকে যে পরিমাণ গৃহ-পালন বা অস্বাভাবিক পালনের বশীভূত করিয়া থাকে উহা দ্বারাই কীটের যথেষ্ট স্বাস্থ্যহানি হয়। মধ্যে মধ্যে জঙ্গলী কোয়া অনুসন্ধান করিয়া উহার ডিম ব্যবহার না করিলে কীটগুলি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যায়। বর্ষাকালই তসর-কীট পালনের প্রশস্ত সময়। গ্রীষ্ম ও শীত কালে যদি হঠাৎ কোন দিবস অধিক বৃষ্টি হয় তাহা হইলে অনেক পোকা 'রসা' হইয়া মরিয়া যায়। ছোট ছোট গাছ বৃষ্টির পরে মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পাতাকে অপরিমিত রূপে রস-যুক্ত করে। এইরূপ গাছে ক্ষরার পর অধিক বৃষ্টি হইলে অনেক তসর-কীট মরিয়া যায়।

এণ্ডি-কীট পালন।—এণ্ডি-কীট পালন করা নিতান্ত সহজ। নিতান্ত শুষ্ক স্থানে এই কীট পালন করিতে হইলে পালন গৃহ সর্ব্বদা সিক্ত রাখিয়া কীট পালন আবশ্যক। আসাম প্রদেশে বৃষ্টিপাত এত অধিক হইয়া থাকে যে তথায় এণ্ডি-কীট সকল ঋতুতেই পালন করা চলে। গৃহ সিক্ত রাখিতে পারিলে বঙ্গদেশের যে সে স্থানে যে সে ঋতুতে এণ্ডি-কীট পালন করা চলিতে পারে। ডিম হইতে আট দশ দিবসের মধ্যে কীট বাহির হয়। কীটগুলির উপর কচি কচি ভেরাণ্ডা পাতা বসাইয়া দিলে ডিম হইতে পৃথক হইয়া পাতার উপর কীটগুলি চড়িয়া যায়। পরে পাতাগুলি অন্য ডালায় রাখিয়া টাট্‌কা ভেরেণ্ডা পাতা কুচাইয়া উহাদের উপর

দিতে হয়। এইরূপ প্রত্যহ ৫।৬ বার পাতা দিয়া, কীটগুলি যখন খোলষ ছাড়ে তখন পাতা দেওয়া বন্ধ রাখিয়া, জাল ব্যবহার দ্বারা ডালা পরিষ্কার ও পোকা পাত্‌লা রাখিয়া, ঠিক্ যেরূপে রেশম-কীট পালন করিতে হয় সেইরূপে এ কীটও পালন করার নিয়ম।

এণ্ডি-কীটের কোয়া হইতে একথাই সূত্র বাহির হয় না। যেমন কার্পাস হইতে সূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে টাকুর বা চর্কা ব্যবহার করিয়া পিঁজিয়া সূতা বাহির করিতে হয় এণ্ডি-কোয়া হইতে প্রজাপতিগুলি কাটিয়া বাহির হইয়া গেলে সেইরূপে ইহা হইতেও পিঁজিয়া সূতা বাহির করিতে হয়। কোয়াগুলি এক ঘণ্টাকাল ক্ষারের জলে সিদ্ধ করিয়া ভাল করিয়া নিংড়াইয়া ধৌত করিয়া, শুকাইয়া পরে কার্পাস হইতে যেমন সূত্র বাহির করে সেইরূপে সূত্র বাহির করিতে হয়। এণ্ডির সূত্রের কাপড় অত্যন্ত মজ্‌বুত হয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। রেশম-সূত্র কি পদার্থ?

২। পলু-পোকা কাহাকে কহে? পলু-পোকা কয় জাতীয় আছে? ইহাদের মধ্যে কিরূপ তারতম্য আছে?

৩। বিলাতী পলু পুষিতে হইলে কিরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত আবশ্যক?

৪। বঙ্গদেশে যে নিয়মে পলু পোষা হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা কর।

৫। পলু পুষিতে হইলে জাল ব্যবহার দ্বারা কি কি উপকার দর্শে ?

৬। পলুর মাছি কাহাকে কহে ?

৭। পলু পুষিতে হইলে ঘরের বন্দোবস্ত কিরূপে হওয়া আবশ্যক ?

৮। পলু পুষিতে হইলে বিশুদ্ধ বীজ সংগ্রহের উপায় কিরূপে করা যাইতে পারে ?

৯। পলু পুষিবার জন্য ঘর ও সরঞ্জাম বিশুদ্ধ বা রোগ-বীজ-শূন্য করিয়া লইবার উপায় কি ?

১০। পলুর নাদির কোন বিশেষত্ব আছে কি না ?

১১। বঙ্গদেশে প্রচলিত নিয়মে তুঁতগাছ কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা বর্ণনা কর।

১২। বিলাতী নিয়মে তুঁতগাছ কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় ? এই নিয়মে তুঁতগাছ প্রস্তুত করিলে কি কি উপকার দর্শে ?

১৩। তসর-কীট পালন নিয়ম বর্ণনা কর।

১৪। তসর ও রেশম কাটাইয়ে কিরূপ প্রভেদ আছে ?

১৫। এণ্ডি-কীট পালন ও এণ্ডির কোয়া কাটাই বর্ণনা কর।

পঞ্চ বিংশ অধ্যায়।

লাক্ষার চাষ।

লাক্ষার চাষ বিশেষ লাভ-জনক। লাক্ষা কয়েক প্রকার বৃক্ষের পল্লবের উপর জন্মিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র কীটের বাসা। মৌমাছি, বোল্‌তা, ভিম্‌রুল, যেমন চাক্ প্রস্তুত করে, লাক্ষা কীট সেইরূপ লাক্ষা প্রস্তুত করে। পলাশ, কুসুম্, কুল, ঘুটের, বট, অশ্বথ, গুলার, কল্‌শা, বাবুল, অড়হর, ক্রোটন্, ইত্যাদি কয়েক জাতীয় গাছের ডালে কখন কখন স্বভাবতঃ লাক্ষা জন্মিয়া আছে দেখা যায়। আম্র-বৃক্ষের নব-পল্লবে ও সময়ে সময়ে লাক্ষা জন্মিতে দেখা যায়। ঠিক একই জাতীয় কীট যে এই সকল গাছের ডালে বাসা প্রস্তুত করিয়-লাক্ষা জন্মাইয়া থাকে এরূপ নহে। কীটগুলি দেখিতে প্রায় একই রকম বটে কিন্তু কিছু প্রভেদ থাকাতে লাক্ষা কীটের মধ্যে যে জাতি ভেদ আছে ইহা নির্ণয় হইয়াছে। কোন জাতীয় কীট মোটা ও পুরু বাসা প্রস্তুত করে, কোন জাতীয় কীট সূক্ষ্ম ও পাত্‌লা বাসা করে, কাযেই সকল জাতীয় কীট সমান পরিমাণ লাক্ষা প্রস্তুত করে না। বড় কীট, অর্থাৎ মোটা ও পুরু বাসা, বীজের জন্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই বাসা টিপিলে যদি রক্ত বর্ণের রস বাহির হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার মধ্যে জীবন্ত ডিম আছে এবং উহা বীজরূপে ব্যবহার হইতে পারে। স্বভাব-জাত কীটের বাসা পল্লব সমেত কাটিয়া লইয়া কুসুম্, কুল, পলাশ, কল্‌শা, ইত্যাদি কোন এক প্রকার গাছের নব পল্লবে বাঁধিয়া দিতে হয়। লাক্ষার আবাদ হইতেও বীজ সংগ্রহ করা

চলে, কিন্তু ৫।৭ বৎসর অন্তর একবার করিয়া জঙ্গলী অর্থাৎ স্বভাব-জাত কীটের বীজ ব্যবহার করাতে ফল ভাল হয়।

বীজ লাগাইবার সময় দুইটী,—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ অথবা কাৰ্ত্তিক-অগ্রহায়ণ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে গাছে বীজ লাগাইলে কাৰ্ত্তিকে ফসল হয়; এবং কার্ত্তিক মাসে বীজ লাগাইলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ফসল হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বীজ লাগাইলে বৃষ্টিদ্বারা কীট ধৌত হইয়া পড়িয়া যাওয়ার সম্ভব থাকে, একারণ প্রথম আবাদে বীজ লাগাইতে হইলে কাৰ্ত্তিক মাসে বীজ লাগানই ভাল। তবে যে স্থানে বৃষ্টি অধিক হয় না, কিন্তু শীতের বা গ্রীষ্মের প্রকোপ অধিক, সে স্থানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বীজ লাগানই ভাল। যে স্থানে বৃষ্টিও অধিক হয়, এবং শীতের বা গ্রীষ্মের প্রকোপও অধিক্ সে স্থানে লাক্ষার চাষের প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবে এরূপ স্থানে জঙ্গলে যদি স্বভাবতঃ কোন গাছে লাক্ষা জন্মিয়া আছে দেখা যায়, তাহা হইলে স্থির করা উচিত যে জাতীয় কীট ঐ লাক্ষা প্রস্তুত করিয়াছে ঐ জাতীয় কীট উক্তস্থানে জন্মিতে পারে। এক জাতীয় কীট চৈত্র-বৈশাখের গ্রীষ্মে মরিয়া গিয়া উহার বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, অপর কোন জাতীয় কীট এ পরিমাণে গ্রীষ্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হইতে পারে। মাঘ মাসের শীত সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সময়ে সময়ে আবাদে চৈত্র মাসের গ্রীষ্মে বীজ পর্য্যন্ত নষ্ঠ হইয়া যাওয়াতে আবাদের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। পরে অন্য কোন স্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পুনরায় আবাদের কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়।

মৃত্তিকা কর্ষণ।—লাক্ষার আবাদের মৃত্তিকা যতদূর সম্ভব কর্ষিত অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা পিপীলিকার বাসা মৃত্তিকার মধ্যে জন্মিয়া গিয়া লাক্ষা-কীট জন্মাইবার পক্ষে একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক

ঘটিয়া থাকে। অবশ্য, মৃত্তিকা কর্ষণ করিবার ব্যয় কোন ফসল জন্মাইয়া উঠাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বৃক্ষ-ছায়ায় যে যে ফসল জন্মিতে পারে তাহারই কোন একটা লাক্ষার আবাদে লাগান উচিত। আনারস, বাবুইঘাস; সান্‌সিভিয়েরা এবং বেরেলা জাতীয় সূত্রপ্রদ ফসল, গাজর, চীনাবাদাম, পিপুল, হরিদ্রা, আদ্রক, ও এরারুট, বৃক্ষ-ছায়ায় জন্মান যাইতে পারে। কর্ষিত মৃত্তিকার উপরে যে পলাশ, কুল, ইত্যাদি গাছ জন্মে উহাদের তেজঃ অধিক থাকে, এবং এরূপ গাছে লাক্ষা-কীট অধিক রস শোষণ করিতে পাইয়া অধিক পরিমাণ লাক্ষা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়।

ডাল ছাটা।—ফাল্গুন মাসের প্রথমেই ডাল কতক-গুলি গাছের ছাটিয়া দিলে চৈত্র বৈশাখে দীর্ঘ দীর্ঘ নব পল্লব দ্বারা বৃক্ষ পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে পল্লবের সহিত বীজের কাঠি বাঁধিয়া দিতে হয়। এই বীজ হইতে কার্ত্তিকে ফসল জন্মে। যে গাছ গুলি "জ্যৈষ্ঠ-ফসলের জন্য রক্ষিত হয়, ঐ গুলির ডাল জ্যৈষ্ঠ মাসে ছাটিয়া দিতে হয়। ঐ সময়ে গাছ ছাটিলে কার্ত্তিক মাসে নব-পল্লব দ্বারা গাছ পূর্ণ হইয়া যায়, এবং ঐ সকল পল্লবে বীজের কাঠি বাঁধিয়া দিতে হয়। এক এক টুক্‌রা এক ফুট লম্বা বীজের কাঠি দশ ফুট আন্দাজ নবপল্লবের জন্য যথেষ্ট। এক এক বাণ্ডিল বীজের কাঠির, অর্থাৎ ৫০ টী বীজের কাঠির মূল্য ১৲ টাকা ১॥০ টাকা, বীজের অসদ্ভাব হইলে এক বাণ্ডিল বীজের কাঠি ৫৲ টাকা দাম দিয়াও ক্রয় করিতে হইতে পারে। এক পক্ষ বীজের কাঠি পল্লবে বাঁধা থাকিবার পরে উহা খুলিয়া লইতে হয়। যদি দেখা যায় তখনও উহা হইতে কীট নির্গত হইতেছে তখন নূতন আর একটী গাছে উহা বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নব-পল্লব গুলিতে সমভাবে কীট গুলি ছড়িয়া আছে এরূপ

লক্ষিত হইলে বৃক্ষটীতে ষোল আনা ফসল হইবে মনে করিতে হইবে; আর কোন ডালে কীট ঘন হইয়া আছে কোন ডালে বা আদৌ নাই এরূপ লক্ষিত হইলে, ফসল ষোল আনা হইবে না এরূপ স্থির করিতে হইবে। কীট-গুলি দেখিতে রক্তের ছিটার ন্যায়। বীজ-কাঠি হইতে বাহির হইয়া নব-পল্লবে ছড়াইয়া গিয়া স্থিরভাবে বসিয়া কীটগুলি গাছের রস শোষন করিতে থাকে। এই অবস্থাতেই ক্রমশঃ উহারা আপনাদিগের চতুর্দ্দিকে লাক্ষার আবরণ করিয়া লুকায়িত হইয়া যায়। এই আবরণ ক্রমশঃ মোটা ও বড় হয় এবং কীট গুলিও বড় হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া কোনটী বা স্ত্রী কেনটী বা পুং কীট হয়। পুং-কীটের আবরণ কিছু লম্বা ভাবের হইয়া থাকে; স্ত্রী কীটের আবরণ বর্ত্তুলা-কার। পুং-কীটের সংখ্যা কম। ন্যূনাধিক ৫০০০ স্ত্রী কীটের মধ্যে একটী মাত্র পুং-কীট থাকে। পুং-কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বাসার মধ্য হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। স্ত্রী-কীট বাসার মধ্যেই আরও পুরু করিয়া লাক্ষা নিঃসৃত করিয়া ক্রমশঃ এক কালীন বাসার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় ইহারা ডিম পাড়ে। ডিম পাড়া শেষ হইলে, মাতৃ-কীট ডিম গুলির রক্ষার জন্য প্রত্যেকটীর উপর একটী পৃথক লাক্ষার আবরণ প্রস্তুত করিয়া দেয়। ক্রমশঃ মাতৃ-কীটের শরীরের মধ্যে এক প্রকার রক্তবর্ণ তরল পদার্থ জন্মিতে থাকে। এই পদার্থ ডিমগুলি কীটে পরিণত হইয়া পরে আহার করে। এই পদার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া গেলেই বীজের জন্য পল্লব বা কাঠি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। লাক্ষা সংগ্রহও ঐ একই সময়ে হইয়া থাকে। ডিম হইতে কীট বাহির হইয়া মাতৃ-কীটকে মারিয়া উক্ত রক্ত বর্ণের পদার্থ আহার করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া বাসা হইতে নির্গত হইতে থাকে, এবং এই অবস্থাতে বীজের কাঠি নব-পল্লবে বাঁধিয়া দিতে হয়।

বীজের কাঠি সংগ্রহ করিয়া শীতল ও অন্ধকারময় কোন গৃহে রাখিয়া দিতে হয়; এবং কীট বাহির হইতে আরম্ভ হইলে এক দিবস আলোকে ও রৌদ্রে রাখিয়া পরে কাঠি গুলি নব-পল্লবে তৃণ-গুচ্ছের আবরণ বা অণ্ডরায় সহ বাঁধিয়া দিতে হয়।

কুসুম্ গাছের উপর অতি সুন্দর সোনার রংএর লাক্ষা জন্মে। অন্যান্য বৃক্ষের লাক্ষা কিছু ঘোর লাল ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হয়।

লাক্ষা কাঠি হইতে চাঁচিয়া লইয়া, যাঁতায় পিষিয়া, চালনী দ্বারা কুলার বাতাস সহকারে চালিয়া লইয়া, পরিষ্কার জল দ্বারা বারবার, ধৌত করিয়া অলক্তক-বিচ্যুত করিয়া, পৃথক করিয়া লইতে হয়। অলক্তক বা আল্‌তা লাক্ষার পূর্ব্বোক্ত সেই রক্তবর্ণ পদার্থ। গুঁড়া ধামায় রাখিয়া ধৌত করিবার সময় ধামার গায়ে উহা ক্রমাগত জল দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়। ঐ জলে আল্‌তা মিশিয়া থাকে। একারণ উহা চৌবাচ্চায় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। জল ক্রমশঃ শুকাইয়া গেলে জলের রং ঘোর রক্তবর্ণ হয় এবং এই অবস্থায় তুলায় করিয়া এই রং উঠাইয়া লইয়া তুলা শুকাইয়া "আল্‌তা" প্রস্তুত হয়। রক্তবর্ণ পদার্থ বাহির হইয়া গেলে লাক্ষার গুঁড়া শুকাইয়া বিক্রয় করা চলে। ধৌত অবস্থায় লাক্ষার গুঁড়ার রং সোনার রং এর মত হওয়া আবশ্যক। এই গুঁড়ার সহিত কিছু রজন মিশ্রিত করিয়া পাত-গালা প্রস্তুত করিতে হয়। গুঁড়ার ওজনের শতকরা ১৫ ভাগ রজনের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া লম্বা মার্কিণ কাপড়ের থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া থলিয়ার এক অন্তভাগ বাঁধিয়া দিয়া উহা অগ্নির উপর ধরিয়া, অপর অন্তভাগটী একটী যষ্টির সাহায্যে পাক দিতে থাকিলে গলিত অবস্থায় গালা বাহির হইতে থাকে। থলিয়ার পরিধি হয় ইঞ্চ মাত্র কিন্তু লম্বে গুঁড়ার পরিমাণানুসারে ১০, ২০ বা ২০০ হাত হইতে পারে।

এই গালা থাবা দ্বারা থলিয়ার গাত্র হইতে চাঁচিয়া চাঁচিয়া লইলে পাত-গালা প্রস্তুত হয়। পাত-গালার রংও সোনার মত হওয়া উচিত, লাল বা কাল নহে। পাত-গালা গলাইয়া একটী যষ্টির অন্তভাগে জড়াইয়া জড়াইয়া গালাইবার পাত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া, অর্দ্ধ গলিত অবস্থায় পিটিয়া ও পিষিয়া মুচির আকারে পরিণত করিয়া, উহার মধ্যে কিছু সিন্দুর দিয়া, পুনরায় কিছু গলাইয়া লইয়া, সিন্দুর গালার মধ্যবর্ত্তী করিয়া, পিটিয়া, পিষিয়া, কাষ্ঠের পিটনীর ন্যায় যন্ত্র দ্বারা ভাল করিয়া গালাতে ও রংএতে মিশাইয়া লইয়া, চর্ব্বি মাখান পিঁড়ার উপর ফেলিয়া মসৃন প্রস্তরের বেলনী দ্বারা বেলিয়া লইলে শিল-মোহরের গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিল-মোহরের গালা প্রস্তুত করা যখন এত সহজ তখন এদেশ হইতে গুঁড়া বা পাত অবস্থায় গালা বিলাতে চলিয়া গিয়া বিলাত হইতে শিল-মোহরের গালা প্রস্তুত হইয়া আইসে, ইহা বড় লজ্জার কথা। এক সের গালার সহিত দুই এক পাত মাত্র চীমা সিন্দুর মিশাইলে গালার উত্তম রং হয়। কলিকাতার লেস্‌লী কোম্পা-নীর দোকানে এই সিন্দুরের দাম ৪॥ টাকায় সের। শিল-মোহরের গালা নানা রংএর হইয়া থাকে। গালার মুচির মধ্যে সিন্দুর ভিন্ন অন্য কোন রূপ রং দিলে গালার রং অন্যরূপ হয়। হরিতাল, অস্থির ভুষা, প্রাসিয়ান্ ব্লু, ইত্যাদি অন্য রংএর সামগ্রী মিশাইলে গালার রং হরিদ্রা, বা কৃষ্ণ, বা নীল বর্ণ হইয়া থাকে।

এক একটী গাছ হইতে গাছের আয়তনানুসারে দশ সের হইতে এক মণ কাঁচা লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। এই কাঁচা লাক্ষার গুঁড়া ২০৲ হইতে ৪০৲ টাকা মন দরে বিক্রয় হয়। এবৎসর গুড়া ৭৫৲ টাকা মণ দরেও বিক্রয় হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন।

১। লাক্ষা কিরূপ পদার্থ ?

২। কোন্ কোন্ বৃক্ষে লাক্ষা জন্মান যাইতে পারে ?

৩। লাক্ষার মধ্যে যে জাতি-ভেদ আছে ইহার কয়েকটী হেতু দেখাও।

৪। লাক্ষার বীজ লাগান সুবিস্তার বর্ণনা কর।

৫। কিরূপ স্থানে লাক্ষার চাষ আরম্ভ করিলে কার্য্য সফল হওয়া সম্ভব ?

৬। লাক্ষার আবাদ করিতে হইলে জমি ও বৃক্ষের জন্ত কোন পাইট আবশ্যক করে কি না ?

৭। লাক্ষা-কীটের জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর।

৮। কাঁচা লাক্ষার গুঁড়া, পাত-গালা ও শিল-মোহরের গালা প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর।

৯। এক একটী বৃক্ষ হইতে কি পরিমাণ কাঁচা লাক্ষার গুঁড়া পাওয়া যাইতে পারে ? এই সামগ্রী কি দরে বিক্রয় হয় ?

১০। আলতা কাহাকে কহে ?

সমাপ্ত।

পা
ইহ
পা
বই
ভা
অ
শি
এ
বং
ল:
যে
প
ক
ভ
ব

১
ব

পত্র-নির্ঘণ্ট।

অশুদ্ধ-শোধন।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১১	গিয়াহে	গিযাছে
৩	২৪	পোর্ত্তগীজ	পোর্ত্ত্‌গীজ
১১	৯-১০	সকল ও	সকলও
১২	৪	বাধি	বাঁধি
১৪	১৫	জাতীর	জাতীয়
২১	৭ইঃ	জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ট
২৪	৪	শিকড়	উহাদের শিকড়
২৪	২২	বিধা	বিঘা